বিচিত্র উপল

বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

গ্রাম-কুলগাছিয়া ; পোঃ-মহিষরেখা ;

জেলা-হাওড়া

১৩৫৮

উৎসর্গ

শ্রীরাজশেখর বসু

করকমলে—

নিবেদন

এই গ্রন্থে সঞ্চিত প্রবন্ধকগুলি বিভিন্ন সময়ে লিখিত। প্রথমদিকের গুলি ১৯৪৬-৪৭ সালে; এবং তারপরের কতকগুলি ১৯৪৫ সালে লিখিত। তারপরে অনেকগুলি ১৯৩৫-৪৫ সালে লিখিত। একেবারে শেষের কয়েকটি ১৯২৪-২৫ সালে লিখিত।

অনেকগুলি প্রবন্ধে সাময়িক প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাতে রস গ্রহণের বাধা হইবে মনে হয় না।

বিচিত্র উপল নামটি প্রকাশকের দেওয়া। সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।

গ্রন্থকার

সূচী

আমার পাঠক

আমার পাঠক কে জানি না। তাহারা সংখ্যায় কয়জন তাহাও জানি না, আদৌ কেহ আছে কিনা তাহাও অনিশ্চিত। তবে যখন লেখাই ব্যবসা তখন পাঠক আছে ধরিয়া লইয়া সান্ত্বনা পাইতে আপত্তি কি! আর সে সান্ত্বনাটুকু না থাকিলে লিখি কোন্ ভরসায়! মিথ্যা সান্ত্বনাই বা মন্দ কি।

লেখকদের ওই এক মস্ত বিপদ যে তাহারা পাঠককে চেনে না। দোকানদার খদ্দেরকে জানে, খেলোয়াড় দর্শককে চেনে, শিক্ষক ছাত্রকে দেখে, অভিনেতা শ্রোতাকে দেখে, এমন কি তস্করেও সুপ্ত গৃহস্থের নাসিকা গর্জন শুনিয়া তবে অগ্রসর হয়। কিন্তু লেখকে তাহার পাঠককে চেনে না—অন্ততঃ আমি তো চিনি না। নিন্দুকে বলিবে থাকিলে তবে তো চিনিবে। কিন্তু যে বাঙলা দেশে উন্মাদের সংখ্যা অজস্র—সেখানে আমার একজনও পাঠক নাই—ইহা কি বিশ্বাস করিতে মন সরে? নিন্দুক তুমি বাঙলা দেশেরই নিন্দুক, আমার নও।

কিন্তু পাঠক চিনিতে বাধা কি? একদিন দোকানে গিয়া কিছু সময় বসিয়া থাকিলে অবশ্যই আমার পুস্তকের এক আধজন ক্রেতা আসিবে। কিন্তু সে না হয় ক্রেতাকে চিনিলাম—পাঠক কোথায়? আর একথা সুবিদিত, যে বই কেনে সে কদাচিৎ পড়িয়া থাকে। শিখণ্ডীর পশ্চাতে যেমন অর্জুন, ক্রেতার পিছনে তেমনি পাঠক। কোথায় আমার সেই আত্মগোপনকারী পাঠক যে অপরের অর্থে ক্রীত পুস্তক একান্ত মনে বসিয়া পড়িতেছে। তাহার অস্তিত্ব একেবারেই অমূলক—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি? আছে, আছে বাঙলা দেশের আটাশটি জেলায় আমার আটাশ জন পাঠক নিশ্চয় আছে।

কিন্তু আমি তো দুইজন—প্র-না-বি আর প্রমথনাথ বিশী; কাহার পাঠক বেশি? অধিকাংশ পাঠক এই প্রশ্নে চমকিয়া উঠিবে—(মাত্র একজন পাঠক থাকিলে তাহার better half) প্রমথনাথ বিশী আবার লেখক নাকি? প্র-না-বি লেখে বটে তবে না লিখিলেই বোধ করি ছিল ভালো। আজকাল রাজসভায় বিদূষকের পদটা লোপ পাওয়াতে প্র-না-বি গণরাজের সভায় প্রবেশ করিয়াছে আর মাথার foolscap

পাট করিয়া লইয়া তাহাতে সাহিত্য রচনা করিতেছে। লোককে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে প্রমথনাথ বিশীর সংক্ষিপ্ত রূপ প্র-না-বি। পাঠকদের মধ্যে যাহারা আবার কোলরীজ্ ও ম্যাথু আর্নল্ড পড়িয়াছে, তাহারা প্রমাণ প্রয়োগ দিয়া শপথ করিয়া বলে যে দুইয়ের সত্তা কখনো এক হইতেই পারে না। এখন কোনো প্রমদানাথ বিশ্বাস আসিয়া যদি প্র-না-বি'র বইয়ের কপিরাইটের দাবী করে তবে প্রমথনাথ বিশীকে কি বিপদেই না পড়িতে হইবে। মুখের চেয়ে মুখোস প্রবল হইয়া উঠিলে এমনি হয়—আর মুখ কদাচিৎ মুখোসের চেয়ে অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। প্র-না-বি'র আড়ালে প্রমথনাথ বিশী অন্তর্হিত।

কিন্তু এ যেন বিজ্ঞাপনের মতো এবং মিথ্যা বিজ্ঞাপনের মতো শোনাইতেছে। কাজেই দুচারটা সত্য ঘটনা বলি যাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে আমার পাঠকের অভাব নাই। অনেক সময় ট্রামে যাইতে যাইতে আমার পাঠককে দেখিয়াছি। লোকটা অদূরে বসিয়া 'দেশ' পত্রিকা পড়িতেছে। 'দেশ' যখন—প্র-না-বি'র পাতা ছাড়া আব কি পড়িবে। লোকটার আগাগোড়া একবার নিরীক্ষণ করিয়া লইলাম। সাধারণের ধারণা পাঠকের মনেই কেবল লেখককে দেখিবার আগ্রহ আছে—কিন্তু তাহারা তো জানে না, পাঠক দেখিবার আগ্রহ লেখকদের কত প্রবল। লোকটাকে আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইলাম। কিন্তু ওই আপাদমস্তক কথাটায় বোধকরি একটু অত্যুক্তি ঘটিল। লোকটার একটি পায়ের স্থলে একটি কাঠের দণ্ড সংযুক্ত। তবে তাহার মস্তক-সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই—নতুবা সে প্র-না-বি'র পাতা পড়িতে যাইত না।

আচ্ছা লোকটা প্র-না-বি'র পাতার কোন্ অংশটা পড়িতেছে? যে অংশ লিখিবার সময়ে আমায় নিঃসঙ্গ হাসি শুনিয়া অনেক দিনের পুরাতন ভৃত্য চাকুরি ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিল—সেই অংশটা কি? নিশ্চয়ই। লোকটাও যে হাসিতেছে। জিরাফ-গ্রীব হইয়া লোকটার দিকে উঁকি মারিতে চেষ্টা করিলাম। 'আবার ছটফট করেন কেন'—পাশের যাত্রী বিরক্ত হইয়া বলিল। নামিবার সময়ে লোকটির কাছ ঘেঁষিয়া আসিলাম—ইস কি তন্ময় ভাব, কি মৃদুমন্দ হাসি!—কিন্তু প্র-না-বি'র পাতা কোথায়? এযে 'নবযৌবন সালসার' বিজ্ঞাপন।

এক সময়ে লেখক তাহার পাঠককে জানিত। লেখকের সহিত পাঠক একই আসরে বসিত—এই 'সহিতই' সাহিত্যের প্রাণ। এখন লেখকের সহিত পাঠকের

পরিচয় না থাকায় সাহিত্যের প্রাণ যেন অন্তর্হিত হইয়াছে—অন্ততঃ তাহার যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখনকার লেখক অনির্দিষ্ট অদৃশ্য পাঠকমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করে—সে বাণ কোথায় গিয়া পড়িল, কাহার গায়ে আঘাত করিল, লক্ষ্যের ধারে কাছেও গেল কি না তাহা জানিবার উপায় নাই। এমন হয় বুঝিয়াই লেখকগণ পাঠকের ভরসা ছাড়িয়া নিজের উপরে ভরসা করিয়া লিখিতে বাধ্য হয়। ফলে সাহিত্য ক্রমেই আত্মমুখী ও ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে। যে কালে লেখকের সহিত পাঠকের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল, তখনকার সাহিত্য ছিল উভয়মুখী ও সমগ্র গোষ্ঠীর সম্পত্তি। একান্ত আত্মমুখিতা সাহিত্যের একপ্রকাব রোগ আব যাহা বিশেষভাবে ব্যক্তিগত বস্তু তাহা সমগ্রেব কাজে লাগিতেই পারে না। এখনকার সাহিত্যিকগণ দান করে—দানের মূল্য যতই হোক তাহা গ্রহীতার পক্ষে পবস্বমাত্র। তখনকার দিনে পাঠকও ছিল সাহিত্যের পরোক্ষ স্রষ্টা—তাহারি নিকষে লেখকের সুবর্ণের পরীক্ষা চলিত, নূতন নূতন রক্তরেখা অঙ্কিত করিয়া দিত। এখনকার লেখক শূন্যে সুবর্ণের পরীক্ষা করে—কোথাও দাগ পড়ে না।

হোমার তাঁহার শ্রোতাদের চিনিতেন, সফোক্লিস এথেন্সের দর্শকদের চিনিতেন, কালিদাস তাঁহার রাজকীয় শ্রোতাদের চিনিতেন; শেক্সপীয়র লণ্ডনের 'বীফ ও বীয়ার'ভোগী জনতাকেও জানিতেন। রবীন্দ্রনাথ সেভাবে তাঁহার পাঠককে কি জানিতে পারিয়াছেন?

বস্তুতঃ 'পাঠক' শব্দটাই সাহিত্য-সম্বন্ধে আধুনিক যুগের সৃষ্টি। তখনকার দিনে ছিল শ্রোতা ও দর্শক—তাহারা শুনিত ও দেখিত, লেখকের সহিত একই আসরে বসিয়া শুনিত ও দেখিত। এখনকার পাঠক পড়ে, দোকান হইতে বই কিনিয়া লইয়া ঘরে গিয়া একাকী বসিয়া পড়ে, সে লেখক নিরপেক্ষ, যাহা সে পড়িতেছে তাহাতে তাহার সমর্থন থাকিতে পারে—কিন্তু তাহার সহযোগিতা নাই। এখনকার সাহিত্য লেখকের এক পায়ে ভর করিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছে, তাহার চাল দ্বিপদের স্বাভাবিক চলার ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়।

এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্র-না-বি তাহার পাঠককে চেনে না পাঠক, তুমি কেমন আমি জানি না। তুমি কালো কি গৌর, তুমি স্থূল না রুগ্ন, তুমি আমার রচনা পড়িতে পড়িতে আমার প্রতি রুষ্ট হইলে, কি শিষ্ট বচন প্রয়োগ করিলে তাহা জানি না। জানিবার উপায়ও নাই। তুমি আমার লেখা

বসিয়া পড়ো, না পড়িতে পড়িতে বসিয়া যাও, আমার রচনার আঘাতে কখনো শয্যাশ্রয় করিতে বাধ্য হও কিনা—এসব জানিবার কৌতূহল তোমার থাকিলেও জানিবার উপায় কোথায়? আর আমার যদি কোন পাঠিকা থাকে তবে তাহাকেও বলি—পাঠিকা তুমি তন্বী না গৌরী, তোমার দৃষ্টির স্বর্ণমৃগী আমার রচনার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া উদ্‌ভ্রান্ত হয় না ব্যাধের আশঙ্কা করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে, কিছুই জানি না। কেবল এইমাত্র জানি যে সপ্তাহে সপ্তাহে প্র-না-বি'র পাতার বাণ নিক্ষেপ করিতেছি, তাহা কোথায় কি অনর্থ ঘটাইল বা সার্থকতা লাভ করিল কিছুই জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহার একটা সার্থকতাও আছে। পাঠক, তুমিও আমাকে জানো না ইহাই কালো মেঘের রজতরেখা। জানিলে ভাগ্যক্রমে যে দুচার জন পাঠক আছে তাহাও নিশ্চয়ই থাকিত না। অতএব বৃথা আক্ষেপ না করিয়া যুগধর্ম মানিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। সে কালের রাজপুত রাজাদের যেমন তলোয়ারের মাধ্যমে বধূর সহিত বিবাহ হইত—একালের সাহিত্যিকদের সেই দশা। পুস্তকের মাধ্যমে, পত্রিকার মাধ্যমে পাঠকের সহিত তাহাদের পরিচয়। স্থতরাং অজ্ঞাত পাঠকের উদ্দেশ্যে আমি লিখিয়া যাইতেছি—আর তুমি অদৃশ্য লেখকের উদ্দেশ্যে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছ। ভাগ্যিস সে-সব কানে আসে না। আসিলে এতদিনে হয়তো লেখাই ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতাম।

লেখা ও লেখক

কোন লেখকের লেখা পড়িয়া তাহার সম্বন্ধে যদি কৌতূহল জাগ্রত না হয় তবে বুঝিতে হইবে তাহার কলম ধরা নিতান্ত ব্যর্থ হইয়াছে। এ কৌতূহল একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার—তাহার সঙ্গে রচনার কোন যোগ নাই। লেখক ব্যক্তিটি কি রকম—তাহাই জানিবার জন্য পাঠক ব্যক্তিটির ঔৎস্থক্য। এই ঔৎস্থক্য হইতেই লেখকের জীবনী-রচনার প্রয়াস। নতুবা লেখকের সত্যকার জীবনী তাহার লেখার ভিতরেই আছে। লেখক যতই নৈর্ব্যক্তিকতার বড়াই করুন না কেন তিনি নিজের জীবনচরিত ছাড়া আর কি লিখিতেছেন? প্রত্যেক লেখকই আত্মজীবনী-লেখক। তবে একটুখানি প্রচ্ছন্নতা আছে এই মাত্র। গোলাপের আতর প্রচ্ছন্ন গোলাপ—কিন্তু গোলাপ যে তাহাতে সন্দেহ নাই। লেখার সঙ্গে লেখকের ওই রকম একটা প্রচ্ছন্নতার সম্বন্ধ। কিন্তু পাঠক প্রচ্ছন্নতায়

সন্তুষ্ট নয়, সে প্রকট চায়। সে লেখক ব্যক্তিটিকে সশরীরে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে চায়, তাহাকে সমুখে বসাইয়া বন্ধুর মতো কথা বলিতে চায়, উকীলের মতো জেরা করিতে চায়। না পাওয়া পর্যন্ত তার কৌতূহলের নিবৃত্তি নাই। আর তাহা কখনো সম্ভব হয় না বলিয়াই লেখকদের সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহলের নিবৃত্তি নাই। এত কৌতূহল তাই এক শ্রেণীর মানুষের জন্য অপর এক শ্রেণীর মানুষের। রাজনীতিক বল, কর্মবীর বল, যোদ্ধা বল, এমন কি ধর্মগুরুদের নাম করো—কাহারো প্রতি বোধ করি মানুষের এত কৌতূহল নয়।

আজ যদি শেক্সপীয়র, নেপোলিয়ান ও যীশুখৃষ্ট সশরীরে প্রত্যাবর্তন করিতেন, তবে মানুষে কি ভাবে তাঁহাদের গ্রহণ করিত! যীশুখৃষ্টকে সকলে দূর হইতে প্রণাম করিত, হয়তো তাঁহার দু'একখানা ছবিও তুলিয়া লইত, হয়তো কোন উৎসাহী মার্কিন ডলার-বীর তাঁহাকে আমেরিকায় লইয়া গিয়া বক্তৃতার আয়োজন করিবারও চেষ্টা করিত। কিন্তু তার বেশি আর কি হইত? প্রকৃত কৌতূহল তাঁহার সম্বন্ধে নাই।

নেপোলিয়ানকে লইয়া কিছু মাতামাতি হইত সন্দেহ নাই। তাঁহার অটোগ্রাফের চাহিদার অন্ত থাকিত না। উদ্যোগী হলিউড প্রযোজকেরা তাঁহাকে ছবিতে নামিবার প্রস্তাবস্বরূপ দক্ষিণার যে অঙ্কের উল্লেখ করিত তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া যাইত। আর তাঁহাকে যুদ্ধাপরাধী গণ্য করিয়া আসামীর কাঠগড়ায় তোলা যায় কিনা হয়তো সে পরামর্শও চলিত। দু'-চার দিন খবরের কাগজে তাঁহার সংবাদ ছাড়া আর কিছু স্থান পাইত না।

কিন্তু শেক্সপীয়রকে লইয়া সকলে আসর জমাইয়া বসিত। কেবল যে লেখক, সমালোচক ও চিত্রপ্রযোজকের দল এমন মনে করিবার কারণ নাই। প্রাকৃত জনেরাও, দেশের এবং বিদেশের সকলেই তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইত। কারণ মানুষ মাত্রেই সম্রাট্ শেক্সপীয়রের প্রজা। এই একমাত্র সাম্রাজ্যবাদ যাহার বিরুদ্ধে কোন লোকের কোন বিরুদ্ধতা নাই।

শেক্সপীয়র কি আহার করিতেন, তাঁহার পান-সভার সঙ্গী, তাঁহার পরিধেয়, তাঁহার হাতের অঙ্গুরী হইতে জুতার ফিতাটি পর্যন্ত কোন বিষয়ে কৌতূহলের অন্ত থাকিত না। তাঁহার সনেটের H. W. কে? সনেটের ব্ল্যাক লেডির প্রকৃত নাম কি? সত্যই কি তিনি হরিণ চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন? 'সিজার এণ্ড ক্লিওপেট্রা' সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত কি? নূতন কোন নাটক তাঁহার

হাতে আছে কিনা? কত রকমারি প্রশ্ন। শেষ পর্য্যন্ত 'মহত্তর শেক্সপীয়র' বার্নাডশ অবধি তাঁহার সঙ্গে 'ইণ্টারভিউ' করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইতেন। আর সর্ব্বকর্ম্মদক্ষ প্রেস রিপোর্টারের দল তাঁহাদের যুগল ছবি কাগজে ছাপাইয়া দিয়া বর্ণনা করিত—'মহত্তর ও মহৎ শেক্সপীয়র।' বার্নাডশ বিরক্ত হইয়া বলিতেন লোকগুলার ভদ্রতাজ্ঞান নাই। শেক্সপীয়র হাসিয়া বলিতেন—ক্ষতি কি?

আজ কালিদাসের সম্বন্ধে যে কৌতূহল আছে তাঁহার প্রভু ভারতসম্রাট্ বিক্রমাদিত্য-সম্বন্ধে তাহার শতাংশও নাই। আজ যদি হঠাৎ মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র ফিরিয়া আসেন—তবে তাঁহারা নিঃসন্দেহ সদ্যকারামুক্ত নেতাদের মতো সম্বর্দ্ধিত হইবেন—ইস্কুল কলেজে হরতাল হইবে, বইয়ের দোকান বন্ধ হইয়া যাইবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, লেখকদের সম্বন্ধে এই কৌতূহলের কারণ কি? তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি না জানিলে যে তাঁহাদের রচনা বুঝিতে পারা যায় না—একথা সত্য নয়। কালিদাস ও শেক্সপীয়র সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না, তবু তাঁহাদের কাব্য বুঝিতে বাধা নাই। বুঝিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু সে যেন অসম্পূর্ণ বোঝা—কারণ রচনা ও জীবন মিলিয়া তবে লেখার সম্পূর্ণতা। সাঁকোর উপর দিয়া দিব্য পার হইয়া যাওয়া যায়, কিন্তু তবু সাঁকোটা কি অসম্পূর্ণ নয়? নীচে নামিয়া জলের দিকে তাকাইলে তবেই ছায়াতে কায়াতে মিলিয়া সাঁকোর বৃত্ত পূর্ণতা লাভ করে। রচনা-সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। মানুষে বুঝিতে চায় না, পূর্ণতা চায়, বোঝা সেই পূর্ণতারই অঙ্গ। লেখা ও লেখক মিলিয়া তবে বৃত্তের পূর্ণতা।

বঙ্কিমচন্দ্র অনেক স্থলে ঘোড়ায় চড়িবার বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি কি ঘোড়ায় চড়িতে ভাল বাসিতেন? মাইকেল যে ডিনারে বসিয়া মুগের ডালের জন্য খিদিরপুরে লোক প্রেরণ করিতেন—মেঘনাদবধে তাহার আভাস কেন নাই? (যাঁহারা মনে করেন প্র-না-বি আফিঙ-খোর তাঁহারা ভ্রান্ত। আফিঙ-খোরের রচনা এর চেয়ে অনেক বেশি সরস। দৃষ্টান্ত কমলাকান্তের দপ্তর।)

অলঙ্কার তৈয়ারি করিবার সময়ে সোনাকে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়, (স্বর্ণকার ছাড়া সবাই একথা স্বীকার করিবেন) তবেই সে সোনা ঢালাই করা যায়। লেখকগণও লিখিবার সময়ে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে পরিস্রুত পরিশুদ্ধ করিয়া রচনায় ঢালাই করিয়া দেন। রচনায় যাহা পাই—তাহা লেখকের শোধিত ব্যক্তিত্ব। অশোধিত ও অশোধ্য ব্যক্তিত্ব বাহিরে থাকিয়া যায়। কিন্তু তবু তাহা লেখকের

ব্যক্তিত্বের অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। শিল্পের পক্ষে তাহা অনাবশ্যক ও তুচ্ছ হইতে পারে; কিন্তু ব্যক্তিত্বের পূর্ণরূপ দর্শনেব জন্য তাহা না তুচ্ছ, না অনাবশ্যক। আর আগেই বলিয়াছি পূর্ণতাই শিল্পের উদ্দেশ্য; মানুষে বুঝিতে চায় না, পূর্ণতা চায়, কিম্বা পূর্ণতা সাধনের জন্যই বুঝিতে চায়। শুনিযাছি স্যাঁকরার ঘরের ধূলা ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় না—লোকে কিনিযা লইয়া যায়—গুপ্ত স্বর্ণ-কণিকার লোভে। লেখকের বর্জিত ব্যক্তিত্বের জন্যও পাঠকের ঠিক সেই একই কারণে এত লোভ। লেখকের ব্যক্তিত্ব ঝাঁটানো এই আবর্জনা মানুষে লুব্ধভাবে ঘরে লইয়া যায়। আবর্জনা যে তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু সোনার কণাও প্রচ্ছন্ন থাকে। সেইজন্যে লেখকদের সম্বন্ধে যত কুৎসা প্রচলিত এমন বোধ হয় অন্য কোন শ্রেণীর মানুষের সম্বন্ধে নয়। আর মানুষে এ আবর্জনা বর্জন করিতে সাহস পায় না—কি জানি যদি প্রচ্ছন্ন সোনার কণা থাকিয়া যায়। পাঠকেরা লেখকের ব্যক্তিত্বের আবর্জনা ও সোনার কণা যুগপৎ স্মৃতিতে বহন করে। সেইজন্যই শেক্সপীয়রের হরিণ চুরির গল্পটা হ্যামলেটের সঙ্গে এক সিংহাসন অধিকার করিয়া অমর হইয়া রহিল।

হাসি

পাঠক, নিভৃতে তোমাকে একটা কথা বলি। সংসারে হাসির বড় দরকার। কথাটা অত্যন্ত পুরাতন, নয়? পুরাতন বই কি! যে এর মর্ম বোঝে তার কাছে কথাটা পুরাতন খবরেব কাগজের মতোই মূল্যবান। জীবনের আহার্যে হাসির লবণটুকু না পড়িলে সবই কেমন যেন স্বাদহীন হইয়া যায়। পরিমিত শুভ্র হাসি জীবন-ভোজের শুভ্র সৈন্ধব লবণ।

আন্তর্জাতিক বাতিকগ্রস্তেরা একটি সামান্য ভাষা সৃষ্টি করিতে চান। এক ভাষার অভাবেই নাকি মানুষ এক হইতে পারিতেছে না। কিন্তু তাঁরা ভাবিয়া দেখেন না যে, বিধাতা জাতিসৃষ্টির আগেই আন্তর্জাতিক ভাষা গড়িয়া রাখিয়াছেন। হাসির স্বর আর কান্নার ব্যঞ্জনবর্ণ। মানবের আদিপুরুষ এই ভাষামাত্রসহায় হইয়া নন্দন বনে পদার্পণ করিয়াছিল। নন্দনের নিষ্পাপ জীবনযাপনের কালে এই ভাষাতেই তাহাদের গৃহস্থালী চলিত। আন্তর্জাতিকতাবিরোধী শয়তান যেদিন তাহাদের মর্ত্যে পাঠাইয়া দিল, সেদিন হইতে আদি দম্পতি এই আদিম ভাষা

ভুলিয়া গেল। মর্ত্যের শিল্পীরা ক্ষণে ক্ষণে সেই আদি ভাষার কথা স্মরণ করাইয়া দেন, নন্দনের ভুলিয়া যাওয়া হাসির স্বর আর কান্নার ব্যঞ্জন।

কিন্তু চোখের জলের উপরে হাসিরই জিত। স্বর স্বয়ম্পূর্ণ, ব্যঞ্জন স্বরকে ছাড়িলে পঙ্গু। বাঙলা দেশ যে পঙ্গু তার কারণ সে হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে। এক সময়ে সে হাসিতে জানিত। কবিকঙ্কণের বাঙলার অট্ট, উদার এবং কিঞ্চিৎ স্থূল হাসি ওই ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র। আবার ভারতচন্দ্রের শিক্ষিত, মার্জিত, রুচিবিচারহীন নাগরিক বাঙলার তীক্ষ্ণ চিক্কণ পরিমিত হাসি হীরা মালিনীর চিত্র। ও যেন রুমালে-ঢাকা চাপা হাসি। নবদ্বীপাধিপতির সম্মুখে জোরে হাসিবার উপায় কি? তখন পলাশীর যুদ্ধের কাল। তাই বলিয়া ভাঁড়ুদত্তের হাসিও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। কৃষ্ণনগরের গোপাল ভাঁড় ভাঁড়ুদত্তের অধস্তন পুরুষ। আর হীরা মালিনীর হাসির পরবর্তী বিকার দাশরথির পাঁচালী।

মানুষ অপরকে দেখিয়া হাসে, কিন্তু তার চেয়ে উচ্চদরের হাসি নিজেকে লইয়া হাসা। সে হাসি হাসিতে কেবল দেবতারাই জানেন। সে হাসি ফলস্টাফ হাসিত; সে দেবতার Parody, তবু সে দেবতা। সে হাসি হাসিতেন চেস্টারটন (প্র-না বি'র বিশেষ বন্ধু)। স্থূল না হইলে নিজেকে লইয়া যেন হাসা যায় না—ওই স্থূলতাই তার হাসির খোরাক। ফলস্টাফ স্থূল, চেস্টারটন স্থূল, গোপাল ভাঁড়ও স্থূল ছিল। অপরকে লইয়া হাসিতে গেলে বোধ করি কৃশ হওয়া প্রয়োজন। শ কৃশ; ভল্‌টেয়ার কৃশ। (লেখকের দোহারা চেহারা)। ব্যাগ পাইপ স্থূল; বাঁশী কৃশ; বাঁশী ভাবায়, ব্যাগ পাইপ মাতায়।

পাঠক, সংসারে যদি স্বচ্ছন্দে চলিতে চাও, তবে নিজেকে লইয়া হাসিতে শেখো। মনে করো বৌবাজারের ট্রামখানার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতেছ, বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছ তখন মনে করো না কেন যে, বৌবাজারের ট্রাম আজ বন্ধ, কিছুতেই তুমি ও ট্রামে চাপিবে না। দেখিবে তখনি অপ্রত্যাশিতভাবে ট্রামখানা আসিয়া পড়িবে। একটু হাসিয়া উঠিয়া পড়ো। আবার দেখো, ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলে দরজার ছিটকিনি এমন আঁটিয়া গিয়াছে যে, বহু টানাটানিতেও খোলে না। বিরক্ত হইতেছ? কিন্তু তার চেয়ে মনে করো ছিটকিনিটা জড় লৌহখণ্ডমাত্র নয়, ও একটা সজীব লৌহহৃদয় প্রতিদ্বন্দ্বী। তখন টানাটানিতে নূতন রস, নূতন বীর্য্য অনুভব করিবে, যেন দুই মল্লের জীবনপণ সংগ্রাম। ছিটকিনি তো খুলিবেই—তোমার মনও খোলসা হইবে। আর যখন অতর্কিতে

ইন্‌কম ট্যাক্সের নোটিশখানা পাইয়া আধুনিক সভ্যতাকে অভিসম্পাত দিয়া মিছামিছি মনটাকে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছ, তখন কি ভাবিতে পারো না যে, ওখানা আয়করের নোটিশ নয়, বৃটিশ গবর্নমেণ্ট তোমার কাছে কর চাহিয়া পাঠাইয়াছে, তুমি ইংলণ্ডেশ্বরের করদমিত্র! অমনি ঘরের চারিদিকে অচিহ্নিত আকারে H. H. অক্ষর খোদিত দেখিবে, অশ্রুত ধ্বনিতে একুশ তোপের আওয়াজ শুনিবে, আর পথের জনতাকে তোমার শোভাযাত্রার অংশ বলিয়া মনে হইবে। নিজেকে লইয়া হাসিতে জানিলে সংসারের ভার লঘু হইয়া যায়।

ঘড়ি

আমার ঘড়িটির মতো এমন বশংবদ ভৃত্য আর পাইব না; দিন নাই, রাত্রি নাই কাজ করিয়া যাইতেছে। অবশ্য মুখে বক্ বক্ করিয়াই চলিয়াছে—কিন্তু ওই বকুনি তার কাজেরই অঙ্গ; বকুনি থামিলেই বুঝিতে পারা যাইবে তার কাজও থামিল। অনেকটা আমার অপর এক ভৃত্য বিনোদের মতোই আর কি! তার গজ্ গজ্ বক্ বক্-এর অন্ত নাই। কখনও যদি সে চুপ করিল—বুঝিতে পারা গেল, বিনোদ এবার অসুস্থ—সে শয্যাগ্রহণ কবিয়াছে।

ক্ষণে ক্ষণে ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ে। কালো আঁক-টানা চন্দ্রাকৃতি ফলকটার উপরে কাঁটা দুটি নিরন্তর জ্যামিতির সবগুলি কোণ রচনা করিতেছে। কখনও কখনও দুই বাহু টান করিয়া দিয়া ফলকটার পরিধি মাপিতেছে—আবার মধ্যাহ্নে ও মধ্য রাত্রে দুই বাহু যুক্ত করিয়া কাহার উদ্দেশে যেন প্রণতি জানায়! শাদা চাকতির উপরে কালো কাঁটার এই আবর্তন—অদ্ভুত! যেন জাঁতার হাতল ঘুরিতেছে। জাঁতাই বটে! কে যেন অলক্ষ্য হস্তে এক দিক্ দিয়া কালের অখণ্ড ফসল ভরিয়া দিতেছে—আর অনবরত, আর এক মুখ দিয়া সেকেণ্ড, মিনিটের চূর্ণকাল বাহির হইয়া হইয়া স্তূপীকৃত হইতেছে, প্রত্যেকটি কণা গণিয়া লওয়া যাইতে পারে! শক্তিশালী সাইক্লোট্রন যন্ত্র যেমন বস্তুকণাকে ভাঙিয়া শক্তিকণায় পরিণত করে—আমার ঘড়িটা তেমনি, কিম্বা ততোধিক শক্তি প্রয়োগে অলক্ষ্য, অদৃশ্য, অভাবনীয়, অখণ্ড কালকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ডে পরিণত করিতেছে—কাল-জগতের সাইক্লোট্রন আমার এই ঘড়িটা!

বেচারা কাঁটা দুটি! কলুর বলদের মতো না আছে তাহাদের আবর্তনের

শেষ, না আছে সময়ের ফসল হইতে তৈল নিষ্ক্রমণের অন্ত! সকলে নিজ নিজ প্রয়োজন মতো নির্দিষ্ট সময়টুকু লইয়া প্রস্থান করিতেছে—কিন্তু বেচারাদের ঘূর্ণির আর অন্ত নাই। অবশেষে এক সময়ে তাহাদের ক্লান্তি আসে, নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাহারা থামিয়া বলে 'মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মতো।' অমনি বিশ্রাম ছাড়িয়া উঠিতে হয়—আচ্ছা করিয়া চাবি ঘুরাইয়া দম দাও। তখনি আবার শুরু হয় টিক্ টিক্, টক্ টক্; কালের টিকটিকির টকটকানি। টিকটিকি তাহাতে আর সন্দেহ কি? টিকটিকির ধ্বনি যেমন গৃহস্থের যাত্রা নির্দেশ করে, কার্য্যারম্ভে বাধাদান করে—এরাও কি তেমনি নয়? বাহির হইতে যাইতেছিলে হঠাৎ ঘড়ির টিক্ টিক্ শুনিয়া একবার সে দিকে তাকাইলে—নাঃ আরও কিছুক্ষণ বসিয়া যাইতে পারা যায়! অমনি আবার কেদারাশ্রয় করিয়া অর্দ্ধশায়িত হইয়া পড়িলে!

কাঁটা দুটির বিচিত্র চেহারা। একটি বেঁটে মোটা; অপরটি লম্বা রোগা, একটি ব্যস্তবাগীশ, তড়বড় করিয়া এক ঘণ্টায় ফলকাবর্তন শেষ করে, অপরটি ধীর মন্থর, সেই সময়ে এক ঘর হইতে মাত্র অপর ঘরে গিয়া পৌছায়। কিন্তু তবু ওই ধীর মন্থরেরই মূল্য যেন বেশি, সে অপর ঘরে গিয়া না পৌছিলে সময়-সঙ্কেত ধ্বনিত হইবার হুকুম নাই। কাঁটা দুটিকে দেখিয়া আমার অফিসের স্থূলোদর বড়বাবু আর কৃশোদর কেরাণীবাবুকে মনে পড়িয়া যায়। কিম্বা মফঃস্বল আদালতের তেলেমলিন, কৃষ্ণবর্ণ চাপকান-পরিহিত শীর্ণ, দীর্ঘ মোক্তারবাবুকে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের কি ওই মিনিটের কাঁটাটিকে মনে পড়ে না? বেচারা লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলিয়া এ এজলাস হইতে ও এজলাসে ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে আর বর্তুলকায় হাকিম সাহেব ধীরে সুস্থে হেলিতে দুলিতে বহু সেলাম হজম করিযা নিজে কক্ষে প্রবেশ করিলেন! তবু দুইজনের পরিশ্রমে ও মূল্যে কত প্রভেদ। মোক্তারের খাটুনি হাকিমের খাটুনির বারো গুণ, কিন্তু হাকিম কি মোক্তারের চেয়ে বারো গুণ বেশি পায় না?

পার্লামেন্টের 'বিগবেন' হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দরীর মণিবন্ধের শোভা অতিক্ষুদ্র ঘড়িটি! ঘড়ির জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ, আকৃতিভেদ ও প্রকৃতিভেদ বড অল্প নয়! কেহ ঘণ্টায় একবার সময় জ্ঞাপন করে, কেহ দুইবার, কেহ বা চারবার; আবার কোন কোন লাজুক প্রকৃতির ঘড়ি আদৌ সময় জ্ঞাপন করে না, এমন কি তাহাকে কানের কাছে স্থাপন না করিলে তাহার সচলতা অবধি

বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু বাহিরে তাহাদের যতই ভেদ থাক, ভিতরটা বোধ করি সকলেরই সমান ; জড়ানো স্প্রিংটা নিয়মিত গতিতে ঢিলা হইতেছে আর কাঁটা দুটি চলিতেছে।

আচ্ছা, পৃথিবীর যেখানে যত ঘড়ি আছে সকলে যদি একযোগে হরতাল করিত তবে কি হইত ? সময়ের গতি কি বন্ধ হইত না ? সময়ের গতি কি ঘড়ির সৃষ্টি নয় ? সময় ঘড়ির সৃষ্টি নয় কিন্তু সময়ের যেরূপে আমরা অভ্যস্ত অবশ্যই তাহা ঘড়ির সৃষ্টি। মহাকালী যদি তাঁহার অঙ্গ হইতে সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টার অঙ্গুরী, বলয়গুলি খুলিয়া ফেলেন, তবে কি আর তাঁহাকে আমরা চিনিতে পারিব ? চিনিতে পারা দূরে থাকুক—তাহাকে উপলব্ধি করিতেই পারিব না —কারণ আমরা যাহাকে দেখিতেছি বস্তুতঃ তিনি মহাকালী নন—তাঁহার অলঙ্কারগুলি মাত্র। এই অলঙ্কারগুলিতেই সময়ের বোধ হয়, এই অলঙ্কারগুলি ঘড়ির সৃষ্টি ছাড়া আর কি ?

মনে করো ঠিক মধ্যরাত্রে একদিন ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়া শুনিলে তোমার দেয়ালাবলম্বী ঘড়িটি দুই ধাতব হস্তে তাল ঠুকিয়া ধ্বনি করিতেছে, আর কান পাতিয়া যদি থাকো তবে শুনিতে পাইবে, পাশের বাড়িতে, সমস্ত শহরে, সমগ্র দেশে, পৃথিবীর যেখানে যত ঘড়ি আছে সকলেই দুই হাতে তাল ঠুকিয়া শব্দ করিতেছে। সে এক অপূর্ব জগৎ সঙ্কীর্তন ! মহাকালের মন্দিরপ্রাঙ্গণে যন্ত্র-বাউলের সে কি অপার্থিব সঙ্গত ! মানুষে যখন নিদ্রায় অভিভূত যন্ত্র-বাউল তখন একবার করিয়া মহাকালকে বন্দনা করিয়া লয়। সারাদিন তাহারা ঠুক্ ঠুক্ শব্দে হাতুড়ি চালাইয়া মহাকালের বলয় অঙ্গুরীয়ক তৈয়ারী করিতেছে, মধ্যরাত্রে সেগুলি তাঁহার চরণপ্রান্তে রাখিয়া দিয়া হাতুড়ি-ফেলা হাতে তাল ঠুকিয়া নাম কীর্তন করে ! এই যন্ত্র-সঙ্কীর্তন একবার শুনিতে পাইলে ঘড়ির সার্থকতা-সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিবে না।

অটোগ্রাফ

আর কিছুই নহে, একখণ্ড কাগজে একটি স্বাক্ষর মাত্র—ইহারি জন্যে কত লোক পাগল। অটোগ্রাফ আদায় করিবার নূতন এক ধরণের পাগলামি বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। কোন লোক কোনপ্রকারে বিশিষ্টতা অর্জন করিলেই তাহার

স্বাক্ষর আদায় করিবার জন্যে ছুটাছুটি পড়িয়া যায়। গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের মতো মহাপুরুষদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম—যে ব্যক্তি ভাল ফুটবল খেলিতে পারে, যে ব্যক্তি একদৌড়ে আর সকলকে হারাইতে সক্ষম—তাহাদের স্বাক্ষরের জন্যেও না কত আগ্রহ। যে কোন প্রকারে একবার বিশিষ্টতা লাভ করিতে পারিলে আর তাহার রক্ষা নাই, সে বিশিষ্টতা যেমনি হোক, জলে-ভাসা সন্তরণ-বীরই হোক, কিংবা সাবান গেলা সাবান-শহীদই হোক, আর গাছে চড়ায় পূর্ববর্তীদের রেকর্ড-ভঙ্গকারীই হোক। অমনি ছোট বড়, স্ত্রী-পুরুষ পকেট হইতে, আঁচল হইতে ছোট্ট খাতাখানি খুলিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে—একটি স্বাক্ষর চাই। কোন কারণে যাহার খাতা জোটে নাই, সে এক টুকরা কাগজ আনিয়া ধরিবে—একটি স্বাক্ষব চাই। সংগ্রহকারীদের মধ্যে আবার যাহারা বেশী উৎসাহী, তাহাবা শুধু স্বাক্ষরে সন্তুষ্ট নয়—দুই ছত্র বাণীও তাহাদের চাই। সে বাণী যেমনি হোক, আর যাহারি হোক—ফুটবল খেলোয়াডও যদি পৃথিবীর ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করে—তাহাতেও তাহাদের যেমন আগ্রহ—গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের বাণীতেও ঠিক তেমনি। অটোগ্রাফের খাতা মহত্ত্বের কুরুক্ষেত্র—সেখানে রথী, মহারথী, পদাতিক ও অশ্বারোহী এক ভূমিশয্যায় শায়িত। মহৎকে সম্মান প্রদর্শনের উপলক্ষ্যে মহত্ত্বের এমন অপমান আর কোথাও দেখা দিয়াছে কি?

আসল কথা, প্রাকৃতজনের কাছে মহত্ত্বের বিশেষ মূল্য নাই, বিশিষ্টতা মাত্রই তাহাদের কাছে সমমূল্য। সংসারে কোনরকমে খানিকটা কোলাহল সৃষ্টি করিতে পারিলেই সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই কোলাহলের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ সব সময়ে সম্ভবপর নয়—স্বকালের মধ্যে তো নয়-ই, কাজেই সেদিক দিয়া চেষ্টাই হয় না—নির্বিচারে সকলের স্বাক্ষব খাতায় গাঁথিয়া রাখা হয়—তারপরে সম্পূর্ণ নির্বেদ। মহাকালের উপবে যে ভার অর্পিত—মহাকাল কিছুদিনের মধ্যেই খাতাখানি লুপ্ত করিয়া তাহার সমাধান করিয়া দেন।

অনেক সময়ে ভাবিযাছি অটোগ্রাফ আদায়ের মূল রহস্যটা কি? বীব-পূজার ভাব? বিশিষ্টতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন? না, আব কিছু! আমরা যে আগেব চেয়ে এখন বেশী বীবপূজক হইয়া উঠিয়াছি বা বিশিষ্টতার প্রতি আসক্তি যে বাড়িয়াছে এমন মনে করিবার কারণ নাই। অনেক ক্ষেত্রেই ইহা ইউরোপীয় প্রথার অনুকরণ মাত্র, অনেক ক্ষেত্রেই ইহা অর্থহীন হুজুগ ছাড়া আর কিছু নহে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অটোগ্রাফের একটা বিশেষ দ্যোতনা আছে বলিয়াই মনে হয়। মানুষ

মহত্ত্বকে, বিশিষ্টতাকে সম্মান করে, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও করে। মহত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা বা শক্তি সাধারণ মানুষের নাই। মহত্ত্বের সহিত ভীতির কণ্টক যদি সংযুক্ত না থাকিত, তবে হয়তো মানুষ মহত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইলেও হইত। কিন্তু বর্তমানে তাহা সম্ভব নয়। এখন ভীতিকে বাদ দিয়া মহত্ত্বকে গ্রহণের যে সহজতম পন্থা মানুষে আবিষ্কার করিয়াছে, তাহারি নাম অটোগ্রাফ। মরা-বাঘের মুণ্ড, বা নিহত মহিষের শিং মানুষ যেমন নিশ্চিন্তভাবে বৈঠকখানায় ঝুলাইয়া রাখে—মহাপুরুষের অটোগ্রাফও ঠিক সেই মনোভাব হইতে সংগৃহীত ও রক্ষিত। অর্থাৎ ইহাতে মহত্ত্বের চিহ্ন আছে—কিন্তু মহত্ত্বের কঠোরতা নাই, মহত্ত্বের প্রতি ক্লীবের সম্মানের ভাব আছে—কিন্তু বীরের ভীতির সম্মুখীন হইবার পরীক্ষা নাই—ইহা যেন একপ্রকার মহত্ত্বের আমসত্ত্ব, মহত্ত্বের নির্যাস রৌদ্রে শুকাইয়া বাক্সে ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে—প্রয়োজনমতো বাহির করিয়া চাখিলেই হইল—গন্ধে ও স্বাদে আমের আভাস দেয় বটে।

যে কোন কারণেই হোক, যাহার মাথা একবার সহস্রের ভিড়ের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহার আর রক্ষা নাই। একবার কোনরকমে তাহাকে চিনিতে পারিলে অটোগ্রাফ-আমসত্ত্ব-সংগ্রাহকের দল তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। স্থান, কাল, পাত্রের বিচার নাই। রেলের স্টেসনই হোক, আর রেস্তোঁরাই হোক, স্বদেশ হোক কিংবা বিদেশ হোক—সময় হোক আর সময় না-ই হোক, তোমার প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া ছাড়িবে। তুমি যদি অস্বীকার করো, তাড়া দাও, কটু কথা বলো, তবে তাহাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া যাইবে। পাঠক, জীবনে যদি সুখী হইতে চাও, তবে সর্বদা লক্ষ্য রাখিও তোমার মাথা যেন আর দশজনের মাথাকে কখনও ছাড়াইয়া না ওঠে।

মনে করো কলিকাতার কাজের কৃপণ মুষ্টি হইতে একটা দিনের ছুটি ছিনাইয়া লইয়া তুইশত মাইল দূরবর্তী এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছ। সেখানে তুমি তু'চার ঘণ্টার বেশি থাকিতে পারিবে না, সেই রাত্রেই ফিরিতে হইবে। বিকালবেলা যখন সেই দূরবর্তী স্থানে পৌছিলে আকাশে তখন কালবৈশাখীর অতর্কিত মেঘ উঁকিঝুঁকি মারিতে শুরু করিয়াছে। বন্ধুর বাসায় পৌছিয়া হাতমুখ ধুইয়া চা-পান করিয়া তুইজনে যখন মুখোমুখি বসিলে—কালবৈশাখীর ঝড়, লাল ধূলির প্রলয় গোধূলি সৃষ্টি করিয়া ছুটিয়া আসিল। গল্পটি দিব্য জমিবে মনে করিয়া যখন মনে মনে আগাম আনন্দ অনুভব করিতেছ—তখন,

সেই উদ্যত ঝড়ের আক্রমণ অগ্রাহ্য করিয়া একদল—হাঁ, পাঠক, তুমি ঠিকই ধরিয়াছ—একদল অটোগ্রাফ-সংগ্রাহক আসিয়া প্রবেশ করিল। কোথা হইতে তাহারা শুনিয়াছে যে, একজন বিশিষ্টের আবির্ভাব হইয়াছে। আর কি তাহারা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে? তাহারা আসিয়া সলজ্জ বিনয়ে তোমার অটোগ্রাফ যাচ্ঞা করিল, স্তম্ভিত বিস্ময়ে তোমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল এবং অন্ধকারের প্রাদুর্ভাব বলিয়া লণ্ঠনের আলো উস্কাইয়া দিয়া আবও একবার দেখিয়া লইল। ধরো, তুমি যদি সাহিত্যিক হও, তবে তোমার রচনার সঙ্গে মূর্তিটা 'কপি ধরিয়া' মিলাইয়া লইল। তোমার মনের পুষ্পিত গল্পগুলার ততক্ষণে নির্বাণ লাভ ঘটিয়াছে। সময় অল্প। অটোগ্রাফ-শিকারীর দল যাইবাব আগেই নির্দিষ্ট সময়টুকু চলিয়া গেল, কাজেই মনের গল্প মনে লইয়াই তোমাকে বিদায় লইতে হইল! ফিরতি ট্রেনে যখন চড়িলে, তখন কাহাকে অভিশাপ দিতেছ? অটোগ্রাফ-শিকারীদেব না নিজের অদৃষ্টকে? যাহাকেই দাও—তোমার জীবন হইতে এমন একটা অমূল্য মুহূর্ত স্খলিত হইয়া পড়িল—আর যাহার ফিরিবার সম্ভাবনা মাত্র নাই। পাঠক, আমার কথা শোনো—জীবনে সুখ যদি পাইতে চাও, তবে অটোগ্রাফ-সংগ্রাহকদের কবল এড়াইয়া চলিও—তাহার একমাত্র উপায় তোমার মাথা যেন কিছুতেই জনতার ঊর্ধ্বে উঠিতে না পায়। হিমালয় উন্নত, কিন্তু অসুখী, অবনতশিব বিন্ধ্যই সংসাবে একমাত্র সুখী—হিমালয়ে অভিযাত্রীর অভাব নাই—বিন্ধ্যের অটোগ্রাফ কেহ কখনও দাবী করে নাই।

কাউণ্টারের ওদিকে

কাউন্টারের ও-দিকের লোকের মতিগতিই বোধ হয় আর এক রকম। মধুপুরের একখণ্ড তৃতীয় শ্রেণীব টিকিট খরিদ করিবার উদ্দেশ্যে অনেকক্ষণ হইতে লাইনেব মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি—কিন্তু কাউণ্টারের পরপারবর্তী বাবুটির সেদিকে কিছুমাত্র হুঁস নাই। তিনি পার্শ্ববর্তী বাবুটিকে তাঁহার পিস-শ্বশুরের জীবনী শুনাইতে ব্যস্ত। আমার সম্মুখে এক ব্যক্তি পুঁটলি ও পিতল-বাঁধানো লাঠি লইয়া জৌনপুরের টিকিটের উমেদার। একটু ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে চাহিয়া আড় চক্ষে দেখিলাম লাইনের লেজুড় ঘরের দরজা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। ভালো করিয়া লেজুড়ের ক্রমবিকাশ দেখিবার সাহস নাই—কি

জানি সেই সুযোগে কেহ যদি নিজের দেহটাকে আমার ও জৌনপুরীর মধ্যে গুঁজিয়া দেয়।

পিসশ্বশুরের ভক্ত পাশের বাবুটিকে বলিতেছেন—শ্বশুরমশায় একজন সিদ্ধ পুরুষ। তিনি প্রাণায়াম করিতে করিতে মাটি হইতে আধ হাত উপরে উঠিতে পারেন। একবার প্রাণায়ামে বসিলে তাঁহার আর সংসারজ্ঞান থাকে না।

আর আমার ছোট শ্যালী—

পাশের বাবুটি শুধান—বয়স কত ?

—তা এখন বিবাহ দিলেই হয়

বয়সের আঁচ পাইয়া বাবুটির উৎসাহ বাড়িয়া যায়

তাঁহাদের এই পারিবারিক কাহিনীর পটভূমির আবহসঙ্গীতরূপে বিহার, উত্তরপশ্চিম ও পাঞ্জাব প্রদেশের অনেকগুলি ছোট-বড় সহরের নাম ধ্বনিত হইতে থাকে। জৌনপুর, আগ্রা, টুণ্ডলা, দিল্লী, লাহোর, কাশীজি, মোগলসরাই, পাটনা, কানপুর, এলাহাবাদ, মৃজাপুর, চুণার। কিন্তু বাবুদের ধ্যানভঙ্গ করিতে পারে না।

পিসশ্বশুরের ভক্ত ও তাঁহার কন্যার ভক্তের মধ্যে আলাপটা প্রায় এই ধরণে চলে—

শ্বশুরমশায়ের যিনি গুরুদেব তিনি থাকেন হিমালয়ে। শীতকালে একবার করিয়া তিনি নীচে নামেন—তখন আসেন শ্বশুরমশায়ের বাড়িতে

—সেবা-শুশ্রূষা করে কে ?

—আমার ছোট শ্যালী

—ওই যাঁর বিবাহের বয়স হইয়াছে ?

—আর কে করিবে ? শাশুড়ী তো নাই

—আহা তবে তো আপনার শ্যালীর বড় কষ্ট

—কি আর করা যায় ? এই বলিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। পাশের বাবুটিরও একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে—অবশ্য কারণ এক নয়।

সহকর্মীদের মধ্যে পারিবারিক সহানুভূতি অতি উত্তম। কিন্তু আমাদের অবস্থা স্মরণ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, তাহা উপভোগ করিবার মনোভাব কেন আমাদের নয়।

—স্যার অনেকক্ষণ যে দাঁড়িয়ে আছি। বাবুটি একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সমস্তগুলি উমেদারের মুখ আশায় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল—কিন্তু বাবুটির মুখ

উজ্জ্বলতর হইল, বিড়ি ধরাইবার দেশলাইয়ের আলোকে। এইবারে তিনি একটা খাতা বাহির করিয়া সেটাকে টেবিলের উপরে ফেলিয়া একটা কাগজ দিয়া তাহার ধূলা ঝাড়িলেন। পকেট হইতে একটা পেন্সিল বাহির করিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া তাহার শিস্ সূক্ষ্ম করিয়া লইলেন, টিকিটের আলমারির চাবির গোছাতে ঝনৎকার তুলিলেন। আহা কি মধুর সে ধ্বনি! যেন উর্ব্বশী নূপুরনিক্কণ করিয়া গেল। মনে হইল এইবার আমাদের আশার ফল ফলিল বুঝি। এমন সময়ে ভিতরের দরজা দিয়া একজন চাপরাশি এক চাঙারি খাবার ও কমলালেবু লইয়া প্রবেশ করিয়া একটা টেবিলের উপরে রাখিল। চেয়ারে জন তিনেক বাবু বসিয়াছিলেন—আমাদের সম্মুখের বাবু দুইটি সেই টেবিলে গিয়া যোগ দিলেন। হা হতোঽস্মি! উর্ব্বশীর নূপুরনিক্কণই বটে। এমনি করিয়াই বোধ হয় ছলনাময়ী পুরুরবাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়াছিল! আমরা যার যার গন্তব্যস্থানের নাম ইষ্টমন্ত্রের মতো জপ করিতে লাগিলাম। ঘাড় ফিরাইয়া দেখি লাইনের লেজুড় দরজা পার হইয়া গিয়াছে। কতদুব গিয়াছে, রাস্তায় পড়িয়া ট্রাম-বাসের গতিরোধ করিয়াছে কিনা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম, বাবু কয়টি আহার করিতেছেন। সেই দশটার সময়ে নাকে-মুখে কিছু দিয়া যাহারা গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আহারে বসিলে আপত্তি করা সৌজন্যসম্মত নয়। তবে একবার মনে হইল আহারের এমন পরিপাটি ব্যবস্থা থাকিলে কে দশটায় বাহির হইতে দ্বিধা করিবে! কিন্তু মানুষের মন নাকি বিচিত্র উপাদানে সৃষ্ট! এতক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি কাউণ্টারের কাষ্ঠ এত মজবুত এবং জালের তার এত মোটা কেন? উভয় পক্ষের পরস্পরের প্রতি মনোভাব এমন যে, কাঠ ও জাল ইহার চেয়ে লঘুতর উপাদানে নির্মিত হইলে এতক্ষণে একটা খুনাখুনী হইয়া যাইত। এই কাউণ্টারটা অটল থাকিয়া অনেকগুলি নরহত্যা নিবারণ করিতেছে।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি এই কাউণ্টারটাই মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। এপারে খরিদ্দার ওপারে বিক্রেতা—কাউণ্টারের মধ্যস্থতায় আমরা আর মানুষ নহি। ঘরের বাহির হইলেই বাবুটির ব্যবহার বদলিয়া যাইবে—আমিও হাসিয়া কথা বলিব। কিন্তু যেমনি দু'জনে দু'দিকে আসিয়া দাঁড়াইলাম—অমনি মুহূর্তে সব বদলিয়া গেল। আমরা আর মানুষ নহি, বিক্রেতা ও খরিদ্দার।

সংসারে কাউণ্টার তো আবার এক রকম নয়। সৈনিকের পোষাক, সে ওই কাউণ্টারের রকমফের। পোষাক খুলিয়া ফেলিলেই সে মানুষ, পোষাক চড়াইতেই সৈনিক। পোষাক পরিয়া যখন সে মার্চ করিয়া যায়—তখন সে আঠারো টাকার সেকেন্দার। ভয়ে পার্শ্ববর্তীর প্রাণ উড়িয়া যায়। আর পোষাকটা খুলিয়া নাও, অমনি সে আমাদের ও-পাড়ার পাঁচু বা খুদু। Uniform বা পোষাকে মানুষের রূপ-গুণ দুই-ই বদলায়। তখন আর পিতা-পুত্র পরস্পরকে চিনিতে পারে না। সোরাব রোস্তম যে পরস্পরকে চিনিতে পারে নাই—তার প্রধান কারণ নিশ্চয়ই সামরিক পোষাক রক্ত-সম্বন্ধ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আবার সৈন্যবাহিনীর তালে তালে পা মিলাইয়া চলাও কাউণ্টারের আর এক মূর্তি। মানুষের পদক্ষেপের স্বাভাবিক স্বতন্ত্র বিশিষ্টতাকে নির্বিশেষ করিয়া এমনি সাধারণ করিয়া তোলে যে, তাহা তখন যন্ত্রের তালে পরিণত হয়। একটা ইঞ্জিনের নিয়মিত ধ্বনির সঙ্গে তাহার আর কোন প্রভেদ থাকে না। ব্যক্তিকে দলিত, মথিত, পিণ্ডীকৃত করিয়া নির্বিশেষ করিয়া তবে সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়—নতুবা তাহাকে দিয়া খুনজখম করানো সম্ভবপর হয় না, এমন কি তাহার ব্যক্তি-জীবনের নামটা পর্যন্ত একটা সংখ্যায় পরিণত হইয়া যায়—কারণ সংখ্যার কোন ব্যক্তিত্ব নাই, বৈশিষ্ট্য নাই, সে একান্তভাবে নির্বিশেষ। আমাদের ও-পাড়ার পাঁচু বা খুদু তখন হইয়া দাঁড়ায়—৬৯-৬।

এই সংখ্যার কথায় 'রক্তকরবীর' রাজার জালের কথা মনে পড়িয়া গেল। ওই জালটা একটা কাউণ্টার ছাড়া আর কিছু নয়। ওই জালটা আছে বলিয়াই রাজা অমানুষ আর যক্ষপুরী যন্ত্রপুরী। এই জাল মানুষে গড়ে, কিন্তু ক্রমে তা মানুষের চেয়েও প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। যক্ষপুরীর রাজার ট্র্যাজেডির হেতু ওই জালটা। যেদিন তিনি এই ইন্দ্রজাল ভঙ্গ করিলেন—সেইদিন তার মুক্তি। যক্ষপুরীর রাজার মতো আজকার মানুষের আসল যুদ্ধ নিজের গড়া এই জালের বিরুদ্ধে। একদিন এই জাল ভাঙিয়া সে বাহির হইবেই। কিন্তু সে কবে? তখন কি সে দেখিবে না যে তাহার রঞ্জন ধূলায় লুণ্ঠিত আর নীলকণ্ঠ পাখীর পালক চুলে গুঁজিয়া নন্দিনী তার শোকে পাগল! প্রাণ ও প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়াই শক্তি এত ভয়ঙ্কর। প্রাণ, প্রেম ও শক্তির কি কখনো সমন্বয় হইবে? বামে নন্দিনী ও দক্ষিণে রঞ্জনকে লইয়া মানুষের মুক্তিযাত্রায় যক্ষপুরীর রাজার বাহির হইবার দিন কি এখনো আসে নাই?

ডেলি প্যাসেঞ্জার

এই যে লোকটি চলিয়াছে, কোনরকমে পা-দুটো টানিয়া, প্রতি পদক্ষেপে পথের সঙ্গে যাহার লড়াই, পিঠ বাঁকা, ঘাড় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, এক হাতে দুটা ফুলকপি ঝোলানো, আর এক হাতে একটা ঔষধের শিশি, পকেটে গোঁজা একটা বার্লির কৌটা, পাঠক, ওই লোকটাকে তুমি চেন কি? বহুবার বহুদিন দেখিয়াছ তাই না চেনাই সম্ভব! আর একটু কাছে গেলে দেখিতে পাইবে, গায়ের কোটটি জীর্ণ, হাতার সুতা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, গলার কাছে তেলে ও ঘামে মলিন। ধুতিতে তাহার শেলাই, এক শেলাইয়ের উপরে আবার সেলাই; জুতাজোড়া এমন ছিন্ন যে সুদক্ষ মুচিরও অসাধ্য। আরো একটু কাছে যাও তাহার মুখের প্রত্যেকটি রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। দারিদ্র্য এবং দুশ্চিন্তা এবং দুঃখ রেখাক্ষরে ডায়ারির আঁকজোক কাটিয়া রাখিয়াছে ওই মুখমণ্ডলে। একদিকে তাহার অটল ধৈর্য্য অন্যদিকে দুঃখ-দারিদ্র্যে নিত্য লড়াই তাহার জীবনে—তাহারি চিহ্নে ক্ষত-বিক্ষত ওই মুখমণ্ডল। তাহার জামা-খোলা দেহ দেখিলে তুমি চমকিয়া উঠিবে—কঙ্কালের মধ্যে এত শক্তি, কঙ্কালের এমন প্রাণ, কঙ্কালে এমন চলমানতা আসিল কি প্রকারে?

ওই লোকটা কে জানো? ও একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার। কোন কবি তাহাকে অবলম্বন করিলে দুঃখের নূতন রামায়ণ রচনা করিয়া ফেলিতে পারিত, যে দুঃখের তুলনায় রামচন্দ্রের দুঃখ বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু কবিদের চোখে ওকে পড়ে না কেন? ওর রাজ্য নাই, রাজধানী নাই, সাড়ম্বরে রাজবেশ ছাড়িয়া বল্কল পরিবে তেমন চেলাংশুকই বা তাহার কোথায়? ঐশ্বর্য্যের যে উচ্চতম ধাপে রামচন্দ্রের অধিষ্ঠান, তাহারি নিম্নতম ধাপে ওই লোকটা দণ্ডায়মান—তাই কি ওকে কবিদের চোখে পড়ে না?

না পড়ে না পড়ুক—অকবির মুখে লোকটার জীবনী একটু শুনিতে দোষ কি? আগেই বলিয়াছি লোকটা একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার। বাড়ী হয়তো কোন্নগর, বা উত্তরপাড়া কিংবা আরও দূরে হওয়া বিচিত্র নয়। সেখান হইতে প্রতিদিন কলিকাতায় যাতায়াত করে এবং মাসের শেষে ত্রিশটি টাকা পকেটে করিয়া বাড়ি ফেরে। যুদ্ধের দরুণ অতিরিক্ত আরও কয়েকটি টাকা পায়। কিন্তু হায় যাহার যুদ্ধ আজীবন, যাহার প্রতিপক্ষ অসংখ্য ও অপরাজেয়, বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হইলেই তাহার সে কয়টি উপরি টাকা লোপ পাইবে! লোকটা ভোরবেলা পাঁচটার সময়ে ওঠে, সাতটার মধ্যেই তাহার স্নানাহার শেষ করিয়া লইতে হয়, যেমন স্নান

তেমনি আহার, তখনো পাড়ার সকলে নিদ্রিত, তারপরে এক মাইল পথ ছুটিয়া ট্রেন ধরে! সাড়ে দশটায় আফিসের সরকারী টাইম, কিন্তু একঘণ্টা আগে না পৌছিলে বড়বাবুকে খুশি করা যায় না, বড়বাবু যদি রাগ করেন—সর্ব্বনাশ! সে পরিণামের কথা ভাবিতেও তাহার শরীর কণ্টকিত হইয়া ওঠে অমনি সে মাঠ পার হইয়া দ্রুততর বেগে ছুটিতে থাকে! মাঠের চাষীরা সকলেই তাহাকে চেনে—রোজ সকালে তাহারা কঙ্কালের এই জীবন-মরণ পণ-করা দৌড় দেখিয়াছে, আগে হাসিত, এখন অভ্যস্ত দৃশ্যে আর তাহাদের হাসি পায় না। তারপরে আছে ট্রেন ধরা, ঠেলাঠেলি করিয়া ওঠা, হাওড়ায় ঠেলাঠেলি করিয়া নামা, এবং আফিসে পৌছিয়া হেড দারোয়ান হইতে সকলকে শেলাম করিতে করিতে, বড়বাবুর শূন্য চেয়ারের কাছে নমস্কারের ভঙ্গি করিয়া নিজের চেয়ারটিতে গিয়া বসা! আফিস শেষ হইবার সরকারী টাইম সাড়ে পাঁচটা কিন্তু তাহাকে আরও এক আধঘণ্টা উপরি খাটিতে হয়, নতুবা বড়বাবু রাগ করিতে পারেন—সর্ব্বনাশ! আবার সকলকে সে শেলাম করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িয়া স্টেশনের দিকে ছুটিতে থাকে। বাড়িতে যখন পৌছায়—তখন রাত্রি প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত। মাঝে মাঝে তাহাকে রবিবারেও বাহির হইতে হয়—তা ছাড়া বড়বাবু, মেজোবাবু, সেজোবাবু, ছোটবাবু প্রভৃতির বাড়িতে ছেলেমেয়েদের বিবাহে, অন্নপ্রাশনে লুচির ঝুড়ি লইয়া পরিবেষণের জন্যও কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাইতে হয়। নিমন্ত্রিতদের আহারান্তে তাহাকে হঠাৎ যখন বড়বাবুর চোখে পড়িয়া যায়, তিনি বলেন 'ওহে মুচ্ছুদ্দি তুমি এবারে ব'সে পড়ো।' মুচ্ছুদ্দি ভয়ে ভয়ে খাইতে বসে কিন্তু মুখে কিছু রোচে না—বাড়িতে ছেলেমেয়েদের অর্দ্ধভুক্ত ক্ষুধিত মুখ মনে পড়িয়া খাদ্য তাহার কাছে বিস্বাদ লাগে। একবার বড়বাবু তাহার সঙ্গে কিছু খাদ্য বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তাহার বাড়ি পৌছিতে গভীর রাত্রি হইল। ছেলেমেয়েরা সেই গভীর রাত্রে উঠিয়াই লুচি সন্দেশ খাইল। পরদিন তাহাদের দারুণ পেটের অসুখ। পাড়ার ডাক্তার বিনা পয়সার ভিজিটে গিয়া বিরক্ত হইয়া মত প্রকাশ করিল—'মুচ্ছুদ্দি ডাক্তারকে ভিজিট দিতে পারে না, এদিকে বাড়িতে দেখ্‌ছি লুচি সন্দেশের ঢেউ খেলে যাচ্ছে।' ডাক্তারের দোষ নাই, সে প্রকাশ করিয়াছিল যে ওগুলি সে কিনিয়া আনিয়াছে। ছেলেমেয়েরা প্রায়ই বলে—বাবা আবার একদিন এনো। তাহাদের বাবা সেদিনের অসুখের নজির তুলিয়া বলে—'মনে নেই সেদিনের কথা—সব ভেজাল।' মুচ্ছুদ্দি সেদিনের অসুখে নেহাৎ দুঃখিত নয়। দরিদ্র যে

শুধু রাজা মহাজনকে ভয় করে তাহা নয়, নিজের স্ত্রীপুত্রকে তাহার সবচেয়ে বেশি ভয়।

কিংবা ওই লোকটার স্ত্রী গত হইয়াছে। সকাল বেলার রান্না ওকে নিজেকেই করিতে হয়। রাত্রির রান্না তাহার বারো চৌদ্দ বছরের মেয়েটি করে। পাড়ার বন্ধুরা বলে—তবু যাহোক মেয়েটি বড় হইয়াছে তাহার সাহায্য পাও। কথাটা শুনিয়া তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, মেয়েটি বড় হইয়াছে—মানে তাহার বিবাহের বয়স আসন্ন। তাহার মাথা ঘুরিয়া ওঠে—সে আর চিন্তা করিতে পারে না। রামচন্দ্র সীতার স্বর্ণমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাকে ভোর ছয়টায় উঠিয়া রান্না করিতে হয় নাই, এবং গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া ছিন্ন মশারি কৌশলে টানাইবার দুঃখ বহন করিতেও হয় নাই। আমি যদি চিত্রকর হইতাম এবং বস্তু-তান্ত্রিক চিত্রকর—তবে পত্নীবিয়োগবিধুর রামচন্দ্রের ছবি আঁকিতাম তিনি গভীর রাত্রে মশারি টানাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন। মুচ্ছুদ্দি প্রতি রাত্রে মশারি টানাইবার সময়ে একবার করিয়া স্ত্রীকে স্মরণ করে—ছোট একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। ওই একটি দীর্ঘনিশ্বাসে সহস্র মেঘদূতের উপাদান ঘনীভূত।

পাঠক, একেবারে তোমাকে একটি দুরূহ সমস্যার সমাধান করিতে আহ্বান করিব। মুচ্ছুদ্দির বেতন ত্রিশ টাকা, উপরি সাত টাকা। এই সাঁইত্রিশ টাকায় সাতজন প্রাণীর এক মাসকাল কিভাবে চলে তাহার সমাধান করিতে পারো? কি সহজ নয়? অসাধ্য? হাঁ—অসাধ্যই বটে। কিন্তু এই অসাধ্যসাধন বহু বছর ধরিয়া মুচ্ছুদ্দি করিয়া আসিতেছে। অথচ জগতের বীরপুরুষদের তালিকায়, অসাধ্য-সাধকদের তালিকায় মুচ্ছুদ্দির নাম নাই কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমি বহু চিন্তা করিয়াও পাই নাই। রামচন্দ্রের যুগেও নিশ্চয় এমন দুঃস্থ ব্যক্তি ছিল। কিন্তু কবিগুরু তাহার দিকে কটাক্ষমাত্র করেন নাই। কোন যুগেই এমন দুঃস্থের অভাব ছিল না—কিন্তু কবিদের দৃষ্টি তাহারা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহাদের বীরত্ব কি নামধন্য বীরপুরুষদের চেয়ে অল্প? ইহাদের নীরব, অখ্যাত, পরম ধৈর্য্যশীল বীরত্বের মহিমা কোন্ মহাবীরের কীর্তির চেয়ে লঘু? বীরপুরুষেরা যদি হন হিমালয়ের তুষার কিরীটের সূর্য্যকরবন্দিত তুঙ্গতা—ইহাদের সহিষ্ণু, বিনম্র মহিমার একমাত্র তুলনা বিন্ধ্য পর্বতের বর্ণবিলাসহীন দগ্ধ অনুর্বর, শ্যামলতা-বিহীন রুক্ষ শৃঙ্গগুলি, প্রত্যহের অগস্ত্যের কাছে যাহারা মাথা নত করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু পথ ছাড়ে নাই, স্ব স্ব স্থানে নির্বিকার দাঁড়াইয়া কর্তব্য পালন

করিয়া যাইতেছে। বহুখ্যাত যুগের অখ্যাত এই বীরপুরুষের দল। অখ্যাত তত্রাচ বীব। ইহাদের কুরুক্ষেত্র অষ্টাদশাহব্যাপী মাত্র নয়, দীর্ঘজীবনব্যাপী। ইহারা সমুদ্র বন্ধন করে নাই সত্য, কিন্তু দুঃখের লবণাম্বু বাঁধিতে ইহাদের তৎপরতার অন্ত নাই। অদৃষ্টের বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে ইহারা প্রত্যেকে একটি দুর্ভেদ্য আশ্রয়স্থান। ইহারা দুর্ভাগ্যের সৈনিক। কাব্যের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে ইহাদের স্থান না হয় তো নাই হইল, জীবনের ক্ষেত্রে ইহাদের তুলনা কোথায়?

আড্ডা

সংস্কৃত ভাষায় আড্ডার প্রতিশব্দ নাই কেন? অথবা বিশাল শব্দাম্বুধির তলে লুক্কায়িত মণিমুক্তার মতো হয়তো শব্দটি সাধারণের অগম্য অবস্থায় বিরাজ করিতেছে—কেবল আমরা জানি না। কিন্তু যদিই বা একটা প্রতিশব্দ থাকে—তাহাতেই বা কি? আড্ডা শব্দে যে ঘনিষ্ঠতা, যে নৈকট্যবোধ, যে বিশ্রম্ভরস বিদ্যমান, অজ্ঞাত প্রতিশব্দে কি তাহা আছে? সমুদ্রগর্ভের মুক্তায়, আর সুন্দরীর কর্ণাভবণ মুক্তায় যে প্রভেদ—নিশ্চয় সেই রকম প্রভেদ আছে আড্ডা শব্দে আর সংস্কৃত প্রতিশব্দটিতে।

কিন্তু আড্ডার প্রতিশব্দ নাই বলিয়াই যে সেকালের মুনিঋষিরা আড্ডা দিতেন না, ইহা স্বীকার করা যায় না। বরঞ্চ প্রতিশব্দ নাই বলিয়াই বস্তুটি ছিল, ধারণা করা অনুচিত নয়। বস্তু থাকিলে শব্দের অভাব আব মনে পড়ে না।

আড্ডার ন্যূনতম সংখ্যা কি? দুইজনে আলাপ করা চলে—আড্ডা চলে না। তিনজনে চলিতে পারে—কিন্তু বেশ মসৃণভাবে চলে না। তিন সংখ্যার ত্রিভুজের তীক্ষ্ণ কোণগুলিতে কেবলি খোঁচা মারিতে থাকে। আমার মনে হয় চারটাই আড্ডার ন্যূনতম সংখ্যা। এই সংখ্যাকে ঊর্দ্ধে বেশি দূর তোলা যায় না। সাত আটের বেশি তুলিলে আড্ডার প্রকৃতি বিকৃত হইয়া যায়। নয়জনে মিলিয়া উচ্চাঙ্গের সদালাপ সম্ভব। প্রমাণ বিক্রমাদিত্যেব নবরত্ন-সভা। দশজনে অর্থাৎ দশচক্রে রাজনীতি আসিয়া পড়ে, যার ফলে মানুষ তো দূরের কথা—ভগবান্‌কে ভূত করিয়া দেয়। বারোজনে মিলিলে আড্ডার নিবিড়তা আর থাকে না—কারণ বারোজনের সমাবেশকেই তো বলে বারোয়ারী। অবশ্য মাঝখানে ছয় সংখ্যাটা

ষড়যন্ত্র করিয়া বসিয়া আছে—কিন্তু কোন্ আড্ডায় ষড়যন্ত্র না হয়—তবে নির্দোষ ষড়যন্ত্র—এই যা প্রভেদ।

কোন রকমে একবার যদি প্রাচীন যুগে চলিয়া যাওয়া যায়—তবে নিশ্চয় সে-যুগের আড্ডার প্রমাণ সংগ্রহ করা অসম্ভব হয় না। কল্পনা করা যাক, সরস্বতী নদীর তীরে ঋষিপত্তনে মৌদ্গল্য ঋষির আশ্রম। ঋষির আমন্ত্রণে ধৌম্য, পরাশর, গৌতম প্রভৃতি ঋষিগণ আসিয়াছেন। মৌদ্গল্য অতিথিদিগকে মুদ্গ অর্থাৎ মুগের ডাল ভিজা এবং কিঞ্চিৎ ইক্ষু গুড় দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এই সব ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি-গণ সেই সুখাদ্য চর্বণ করিতে করিতে যে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করিতেন—এমন কোন শাস্ত্রগ্রন্থে দেখিলেও বিশ্বাস করিতে আমি রাজী নই। গৌতম হয়তো বিশুদ্ধ বৈদিক সংস্কৃতে বলিয়া উঠিলেন—আরে শুনেছো ভায়া, কণ্বের তপোবনের খবর। গৌতমের অশাস্ত্রীয় কণ্ঠস্বরে ব্রহ্মর্ষিদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সকলে একবার পিছনে ফিরিয়া দেখিয়া লইলেন—অর্বাচীন কেহ নিকটে আছে কিনা? তারপরে গলার স্বর নীচু করিয়া শুধাইলেন—ব্যাপারটা কি? গৌতম বলিলেন—ওই যে মেয়েটা ছিল—কি যেন নাম?

পরাশর বলিয়া উঠিলেন—শকুন্তলা। ঋষিপত্তনের সব আশ্রম বালিকাদের নাম ঋষি পরাশরের কণ্ঠস্থ। (বাস্তবিক, Scandal-টা যে অনসূয়া বা প্রিয়ংবদাকে লইয়া নয়, খাস শকুন্তলাকে লইয়া পরাশর কেমন করিয়া তাহা বুঝিলেন! একেই বলে ঋষিদৃষ্টি!)

গৌতম বলিলেন—হাঁ, হাঁ, সেই শকুন্তলাকে নিয়ে............ ....

তারপরে চারজনের কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ্ হইয়া প্রায় স্বগত হইয়া পড়িল। কেবল দুটি কথা শুনিতে পাওয়া গেল—'দুষ্মন্ত' আর 'ঢলাঢলি'। মৌদ্গল্য ফিরিয়া একটি ব্রাহ্মণ বটুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—বৎস, এখানে আমরা শাস্ত্রালোচনা করছি—যাও 'দণ্ড গোলক' (ডাং গুলি) খেলোগে।'

চার ঋষিতে মিলিয়া এই যে কাণ্ড—ইহাই কি আড্ডা নহে। ফল কথা শকুন্তলার Scandal তড়িৎবৎ ঋষিপত্তন, কুশপত্তন প্রভৃতি স্থানের তপোবন হইতে সমস্ত ব্রহ্মাবর্তে ছড়াইয়া পড়িল। মহারাজ দুষ্যন্ত রাজধানীতে ফিরিবার পূর্বেই দুষ্যন্তশকুন্তলার উপাখ্যান আর্যাবর্তের ঋষিদের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হইয়া গেল। সত্য কথা বলিতে কি, প্রাচীন পুরাণগুলি সেকালের আড্ডার রিপোর্ট ছাড়া আর কিছু নয়। পুরাণগুলি আড্ডারূপ পার্লামেণ্টের 'ব্লু-বুক'।

আড্ডার উপজীব্য কি ? পরচর্চা। তবে একেবারে পর নয়। কারণ নিছক পরচর্চায় আনন্দ নাই। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের চর্চায় অর্থাৎ নিন্দায় যেমন আনন্দ, তেমন বোধ হয় আর কিছুতেই নয়। কাজেই দেখা যাইতেছে পরচর্চা নামান্তরে আত্মচর্চা বই আর কিছু নয়। কিম্বা ইহা একাধারে আত্মপরচর্চা। নিজেকে অপরের মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া নিন্দা করিয়া মানুষ একপ্রকার আনন্দ পায়। অনুপস্থিত বন্ধুকে উপলক্ষ্য করিয়া যখন আড্ডা জমিয়া ওঠে, তখন বন্ধুটি আসিয়া পড়িলে সকলে অকস্মাৎ নীরব হইয়া যায়। 'আরে, এসো, এসো, কোথায় ছিলে ?' বন্ধুটি অশরীরীরূপে নিজেদের মধ্যেই ছিল। ইহা বন্ধুত্বের এক বিশেষ অধিকার।

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, ভূৎ-ভবিষ্যৎ বর্তমান, সর্বদেশে ও কালে আড্ডার প্রভাব বিরাজিত। মরুভূমির বেদুইনগণও খর্জুরপুঞ্জের ছায়ায় বসিয়া আড্ডা দিয়া থাকে। ওই আড্ডাই সত্যকার মরূদ্যান। আড্ডা না থাকিলে সমস্ত জগৎটাই সুবৃহৎ সাহারায় পরিণত হইত। অনেক উন্নতনাসিক ব্যক্তি আড্ডার নিন্দা করিয়া থাকেন—কিন্তু আড্ডার ফিলজফি জানিলে এমন নিন্দনীয় কাজ তাঁহারা কখনই করিতেন না। আড্ডার ফিলজফি কি ? আগেই বলিয়াছি, ইহা এক প্রকারের আত্মনিন্দা। ট্র্যাজেডির অলঙ্কারে যাহাকে Katharsis বলে সেইজাতীয় এক বস্তু। তবে pity এবং fear নয়, গ্লানি এবং অহঙ্কার। নিজের গ্লানি এবং অহঙ্কার অন্যের মধ্যে আরোপ করিয়া নিন্দার দ্বারা তাহার শোধন। তুমি যখন এক আড্ডাতে রামের চরিত্র-শোধন রূপ মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত, তখন নিশ্চিত থাকিতে পারো যে, অন্য আড্ডায় রামও অনুরূপ মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছে। এইরূপে জগৎ ব্যাপিয়া পরোক্ষে নোংরা কাপড় কাচা চলিতেছে। এই তত্ত্বদৃষ্টি লাভ করিলে বুঝিতে পারিবে জগৎটা একটা বৃহৎ রজকালয়। আমরা প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিক ধোপা। কোন কাজের একটা ফিলজফি আবিষ্কার করিতে পারিলে কাজটা করা সহজ হইয়া পড়ে। পাঠক, আড্ডার ফিলজফি যখন জানিলে—নিশ্চিন্ত মনে এবার আড্ডা দিতে পারো। অবশ্য আমার সমর্থনের জন্য যে বসিয়াছিলে, এমন মনে করিবার কারণ নাই, তবু ফিলজফিটা জানিলে বিবেকের দংশন কিছু মৃদু হইতে পারে মনে করিয়া ব্যাখ্যা করিলাম।

সিগ্‌ন্যাল

রেলের সিগ্‌ন্যাল দেখিলে আমার মন উদাস হইয়া যায়। কোথাও কিছু নাই, মাঠের মাঝখানে একটা সিগ্‌ন্যাল কেমন যেন খাপছাড়া, কেমন যেন অসঙ্গত। ওই অসঙ্গতিই বোধ হয় মন উদাস হইয়া যাইবার হেতু। ওই উৎকর্ণ সিগ্‌ন্যালটা নির্জনতার প্রান্তে মানব সংসারের বাণী বহন করিয়া তর্জনী তুলিয়া দণ্ডায়মান। ও যেন নিস্তব্ধতার প্রহরী! পথের মোড়ে যে পুলিশ হাত উঁচু করিয়া জনতো নিয়ন্ত্রণ করে, সিগ্‌ন্যালটা তারই অনুরূপ। ও হাত নীচু করিয়া গাড়ীর আগমন সঙ্কেত জানায়, হাত উঁচু করিয়া থাকিলে গাড়ীর সাধ্য কি তাহার সীমা অতিক্রম করে? রাতের অন্ধকারে ওর লাল নীল দুই চক্ষু জলিয়া উঠিয়া সঙ্কেতবার্তা জ্ঞাপন করিতে থাকে।

রেল গাড়ীতে চলিতে চলিতে হঠাৎ ওই সিগ্‌ন্যালটা আসিয়া পড়ে—মন চঞ্চল হইয়া ওঠে, একটু পরেই আর একটা সিগ্‌ন্যাল, তারপরেই গাড়ীতে ঝাঁকুনি লাগে—লৌহমৃদঙ্গে গোটা কতক দ্রুত তাল পড়ে, লয়ের পরিবর্তন ঘটে, গাড়ী এক লাইন হইতে আর এক লাইনে চালিত হয়—তারপরেই স্টেশন। গাড়ী হয়তো থামে না—প্লাটফর্মের উপরে স্থিতিশীল জীবনযাত্রার আবছা ছবি হুস করিয়া চলিয়া যায়—আবার সিগ্‌ন্যাল আসিয়া পড়ে, পর পর দুটা—তারপরেই আবার সেই ঢালা মাঠ—একটানা শূন্যতা—মহাকাব্যের পটভূমির যোগ্য বিরাট্ বিস্তৃতি, অখণ্ড নির্জনতা! সিগ্‌ন্যালগুলি লৌহদণ্ড তুলিয়া ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির তপোবনের শান্তিরক্ষা করিতেছে; দেখিয়া আমার মন উদাস হইয়া যায়!

দিনের সিগ্‌ন্যাল দেখিয়া যেমন মন উদাস হয়, রাতের সিগ্‌ন্যাল দেখিয়া তেমনি বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। বড় স্টেশনের আকাশে ওই যে লাল নীল আলোর তারকামালা ওর মধ্যে কোন্‌টি আমাদের গাড়ীর অপেক্ষায়? ঘন অন্ধকারের মধ্যে কেমন করিয়া ড্রাইভার এ সঙ্কেত বুঝিতে পারে? হয়তো সঙ্কেত বুঝিবার কোনো সরল উপায় আছে, কিন্তু আমার মতো অবিশেষজ্ঞের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা থাকে না। নৌকার মাঝি তারার সঙ্কেত বুঝিতে পারে। হয়তো সঙ্কেতজ্ঞ ট্রেনের ড্রাইভার সিগ্‌ন্যালের তারা দেখিয়া ট্রেন চালায়। মানুষ নূতন যানবাহন তৈরী করিবার সঙ্গে নূতন আকাশ ও নূতন তারার সৃষ্টি করিয়াছে।

অন্ধকারের পটে ঘন লাল, ঘন নীল ওই আলোর বিন্দুগুলি কী বিপুল রহস্যেরই না কেন্দ্র! রাতের বেলা স্টেশনে গেলেই ওই তারাগুলির দিকে আমার

দৃষ্টি পড়ে। স্টেশনের আর যে গুণই থাক—মুগ্ধভাবে সিগ্ন্যালের আলোর দিকে তাকাইয়া থাকিবার অনুকূল স্থান রেলের স্টেশন নয়। কাজেই কাজের অবসরে, যেমন কুলি ডাকা, গাড়ীতে মাল তোলা, দু'পয়সার পান কিনিয়া দেওয়া প্রভৃতি, আমার চোখ ঘুরিয়া ফিরিয়া সিগ্ন্যালের আলোর উপরে গিয়া পড়ে। অন্ধকারের মধ্যে কোথায় কি পরিবর্তন ঘটিল বুঝিতে পারা যায় না—লাল আলোটির স্থানে হঠাৎ নীল-আলো। গাড়ীর এঞ্জিনখানা ফুঁসিতে থাকে। ওই সঙ্কেতের কি মোহিনী শক্তি—বিরাট্ গাড়ীখানা হঠাৎ নড়িয়া উঠিয়া চলিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ গাড়ীখানা অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া যায়—কেবল গার্ডের গাড়ীর পিছনের লাল আলোটি বিদায়-লক্ষ্মীর নিটোল অনামিকাবেষ্টনী অঙ্গুরীর দীপ্ত চুনির টুকরার মতো জ্বলিতে থাকে। বিদায়ের শেষ চিহ্ন ওই অশ্রু-অরুণ নেত্র!

আজও মনে পড়ে, বাল্যকালে, সে কি আজকার কথা! পশ্চিমের কোন্ এক স্টেশনে সন্ধ্যাবেলাতে সিগ্ন্যালের আলোর সারি দেখিয়াছিলাম! কোন্ স্টেশন সেটা? সে কি গয়া না মোগলসরাই? শীতের সন্ধ্যা; ধোঁয়াতে, কুয়াসায় অন্ধকারকে গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। আমি প্লাটফর্মে দণ্ডায়মান, এমন সময়ে চোখে পড়িল স্টেশন দিগন্তের নবোদিত তারকা-মালা, লাল, নীল, ঘনবর্ণ! সেই ছাপ আজও মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। যখনই, যেখানেই সিগ্ন্যালের আলো দেখি না কেন বালক-কালের সেই সন্ধ্যা মনে পড়িয়া যায়।

এই আলোগুলির উপরে কবিরা কবিতা লেখে না কেন? (চেস্টারটন লিখিয়াছেন!) নদীগিরি, অরণ্যপর্বত, আকাশসমুদ্র মানুষের মনকে মুগ্ধ করে; এ সব মানুষের সৃষ্টি নয়। দেবতারা তিলোত্তমা সৃষ্টি করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন—মানুষ নিজেকে মুগ্ধ করিবার জন্য যে কয়টি বস্তু এ পর্যন্ত সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে রেলের সিগ্ন্যাল তার মধ্যে একটি!

সত্য কথা বলিতে কি রেলে চড়িতে আমি ভালবাসি। রেলের গাড়ীই এ যুগের লৌহ-তুরঙ্গ। এই লৌহ-তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া আমি সংযুক্তার সন্ধানে কতবার না যাত্রা করিয়াছি! সেই যাত্রাপথের সন্ধিস্থান ওই লোহার সিগ্ন্যাল-গুলি। অতর্কিতে এক একটা আসিয়া পড়ে—আর চমকিয়া উঠি! আমার সংযুক্তার দিল্লী আর কতদূর? যেদিন পৃথ্বীরাজ অশ্ব ধাবিত করিয়া দিল্লী চলিয়া-ছিলেন—দিল্লী কতদূর এ প্রশ্ন কি তাঁহার মনে ক্ষণে ক্ষণে উদিত হয় নাই? তখন তাঁহার পথে সিগ্ন্যালের কাজ কে করিয়াছিল? রাজপুতানার শুষ্ক

মরুভূমিতে বনস্পতি আছে কি? গিরিচূড়াই ছিল খুব সম্ভবতঃ তাঁহার অটল সিগ্‌ন্যালের সঙ্কেত।

তারপরে যুগের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তারও কিছু পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব নয়—আর জৈব-তুরঙ্গের স্থানে আসিয়াছে রেলের লৌহ-তুরঙ্গ! এ যুগের পৃথ্বীরাজের দিল্লীপথের মাঝে মাঝে ওই সিগ্‌ন্যালগুলি পথের ক্ষীয়মাণ হ্রস্বতা জ্ঞাপন করিতেছে! যেমন যুগ, তেমনি যোগ! কিন্তু তাই বলিয়া কি রহস্যের কিছু কমতি হইয়াছে?

রেলের জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া আছি। সারিবদ্ধ টেলিগ্রাফের খুঁটি, তারের উপরে টিয়া পাখীর ঝাঁক, তৃণহীন প্রান্তর গোরুর গবেষণার স্থল, দীর্ণ মাঠ বৃষ্টির জন্য মুখব্যাদান করিয়া আছে, জনহীন নদীর খাত, শালের বন, কয়লা-খনির ধোঁয়া—হঠাৎ একটা সিগ্‌ন্যাল আসিয়া পড়িল! কলম্বাসের নৌবাহিনীর সম্মুখে ভগ্ন বৃক্ষপল্লব! স্টেশন নিকটবর্তী।

ক্রমে আলো মিলাইয়া আসিতে থাকে, আকাশে একটার পরে একটা কালো পর্দা পড়িতে পড়িতে অন্ধকার বেশ নিরেট হইয়া ওঠে, ওই যে অদূরে অনচ্ছ আকাশে নীল আলো—স্টেশন নিকটবর্তী! সংযুক্তার রাজধানীও আর দূরে নয়—পৃথ্বীরাজ চমকিয়া চঞ্চল হইয়া ওঠে! আমি যদি কবি হইতাম তবে সিগ্‌ন্যালের উপরে কবিতা লিখিতাম—সে সম্ভাবনা যখন নিতান্তই নাই, তাই শাদা গদ্যে শুধু একবার জানাইয়া রাখিলাম রেলের সিগ্‌ন্যাল আমার বড় ভালো লাগে। দিনের সিগন্যাল উদাস করিয়া দেয়, রাতের সিগ্‌ন্যাল দেখিয়া বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

ক্রিকেট

হঠাৎ সংবাদপত্রগুলি ক্রিকেট-সচেতন হইয়া উঠিয়া ক্রিকেট খেলার তাৎপর্য্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিয়া গিয়াছে। এমন ক্ষেত্রে আমার নীরব হইয়া থাকা উচিত নয়। আমাকেও কিছু লিখিতে হয়। প্রথমে ভাবিলাম ক্রিকেট সম্বন্ধে না লিখিয়া বাঙলা মতে 'ডাং-গুলি' খেলা সম্বন্ধে কিছু লিখি। তারপরে ভাবিলাম তাহাতে লোকে 'প্র-না-বি'কে ক্রিকেট অনভিজ্ঞ ভাবিবে কিংবা 'ডাং-গুলি' বিশেষজ্ঞ ভাবাও বিচিত্র নহে। সত্য কথা বলিতে কি ক্রিকেট ও 'ডাং-গুলি' দুই খেলাতেই আমার সমান অভিজ্ঞতা। বিশেষ, খেলা

ও ঔষধ এ দুটি বিষয়ে বৈদেশিক প্রভাবকে অস্বীকার করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। তাই নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধেই কিছু লিখিতে হইল।

কোন বিষয়ে লিখিতে গেলে প্রথমে তাহার সংজ্ঞা নির্দেশ করা বিধেয়। ক্রিকেট খেলার সংজ্ঞা কি? দর্শকমাত্রেই জানেন, ক্রিকেট একপ্রকার খেলা, যাহাতে একজন লোক মাঠের মধ্যে তিনটা কাঠি পুঁতিয়া একটা লাঠি হাতে করিয়া আত্মরক্ষা করিতে থাকে, আর এক ব্যক্তি দূরে দাঁড়াইয়া একটা বল ছুঁড়িয়া পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিটিকে আহত করিতে চেষ্টা করে। লোকটি প্রায়শঃ আহত হয় —কিন্তু মাঝে মাঝে বলটি লোকটির গায়ে না লাগিয়া কাঠিতে আঘাত করিয়া তাহাদিগকে ধরাশায়ী করিয়া দেয়। তখন বিপক্ষের কি আনন্দ! এমন কেন হয়, বুঝিতে পারি না। লোকটির গায়ে লাগিলেই তো আনন্দিত হইবার কথা। বোধ করি ভদ্রতার খাতিরে মনের আনন্দ চাপিয়া রাখে। যখন খেলা চলিতে থাকে, তখন দর্শকগণ মাঠের মধ্যে বসিয়া কমলালেবু ও চীনেবাদাম খাইতে থাকে। বলের দ্বারা আহত হইলে লোকটি মাঠের মধ্যে ব্যথায় ছুটাছুটি করে—লোকটা কতবার ছুটিল, সেই অঙ্ক লিখিয়া রাখা হয়—পরে উভয় পক্ষের অঙ্কের সংখ্যা বিচার করিয়া কে কতবার আহত হইয়াছে, তদ্দ্বারা হারজিত নির্ণীত হইয়া থাকে। আমার এই সংজ্ঞা যে ভ্রান্ত নহে, তাহার স্বপক্ষে একটি ইংরেজি গল্প পড়িয়াছিলাম। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে বন্দী হইয়া একজন ফরাসী সৈনিককে কিছুকাল ইংলণ্ডে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। সে একদিন মাঠে ক্রিকেট খেলা দেখিতে গিয়াছিল। সে কি দেখিল? আমি যাহা দেখিয়াছি, সে ঠিক তাহাই দেখিয়াছিল। একটি লোক বল ছুঁড়িয়া দণ্ডধারী ব্যক্তিটিকে আহত করিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু হাতের লক্ষ্য অভ্রান্ত নহে বলিয়া বলটি গায়ে না লাগিয়া প্রায়ই কাঠি তিনটিতে লাগিতেছিল। ফরাসী সৈনিকটি কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, এমন ভ্রান্ত নিশানা লইয়া ইংরেজ কি রকমে ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জিতিল। তারপরে তাহার যখন বল ছুঁড়িবার পালা আসিল, বলের প্রথম আঘাতেই আত্মরক্ষাশীল ব্যক্তিটিকে সে ধরাশায়ী করিয়া দিল এবং এতদিনে ওয়াটার্লুর পরাজয়ের কথঞ্চিৎ শোধ লওয়া হইল ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। বস্তুতঃ ইহাই ক্রিকেট খেলার স্বরূপ—প্রাকৃত জনে যাহাই ভাবুক না কেন!

ক্রিকেট খেলার ইতিহাস জানি না, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য ও ভবিষ্যৎ যে না জানি এমন নয়। ক্রিকেট খেলায় লোকে যেমন আগ্রহ অনুভব করে, এমন আর

কিছুতেই নয়। এই যে ছয় বৎসরব্যাপী বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়া গেল, ইহা কি থামানো যাইত না? একটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সূচী ঘোষণা করিয়া দিলে—অবশ্যই থামিত, অন্ততঃ সেই কয়েক দিনের জন্যে যে তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রিকেটের মাঠেই যথার্থ আন্তর্জাতিকতার সূত্রপাত ও ভিত্তিপাত। আবার ইঙ্গ-ভারতীয় সম্বন্ধের কালো মেঘের রজতরেখাও এই ক্রিকেট খেলা। প্রিন্স রণজি ইংলণ্ডে যে সম্মান ও আদর পাইয়াছেন, তাহা গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও জোটে নাই। এক ডজন প্রিন্স রণজি ইংলণ্ডে পাঠাইতে পারিলে এতদিনে স্বরাজ আমাদের করতলগত হইত! এবারে ভারতীয় যে দলটি ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলিতে গিয়াছে—তাহাদের উক্তি কি আশাজনক নয়? একজন ভারতীয় খেলোয়াড় বলিয়াছেন—'ইংলণ্ডের মাটি বেশ নরম!' এমন আশার বাণী কয়জন ভারতীয় রাজনীতিক বলিতে পারিয়াছেন? তাঁহাদের কাছে বিলাতের মাটি বিলিতি মাটি, যেমন নীরস, তেমনি কঠিন, যত ভিজানো যায়, তত আরও বেশি কঠিন হয়। মহাত্মা গান্ধীকে গোলটেবিল হইতে শূন্যহাতে ফিরিতে হইয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট দলের নেতা পতৌদির নবাবকে তেমন ব্যর্থ হইয়া ফিরিতে হইবে না, তিনি খ্যাতি ও সুযশে পকেট ভরিয়া লইয়া ফিরিবেন, ওদেশের হোটেলওয়ালা ও দোকানদারদের পকেট পূর্ণ করিয়া দিয়া।

ক্রিকেট খেলার ভবিষ্যৎ কি? আণবিক বোমার আকার কত বড় জানি না (জানিবার ইচ্ছাও নাই), নিশ্চয়ই ওই ক্রিকেট বলটার চেয়ে বড় নয়। ক্রিকেট বলই পরমাণবিক বোমা, যাহার তুলনায় আণবিক বোমা তুচ্ছ। ক্রিকেট বলই ভাবী জগতে অদৃষ্টনির্ণয় করিবে। এমন একদিন আসিবে, যখন আস্ত্রিক যুদ্ধ মিটিয়া যাইবে, কিন্তু মানুষের যুদ্ধ-স্পৃহা মিটিবে না—তখন ক্রিকেট খেলাই যুদ্ধের সাধ মিটাইবার কাজে লাগিবে। দুগ্ধের স্বাদ ঘোলে মেটে—কিন্তু পরিণত মানব-সমাজের পক্ষে দুধের চেয়ে ঘোল কি অধিকতর উপকারী নয়? তখনকার আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব মিটাইবার প্রধান উপায় হইবে ক্রিকেট খেলা। দুই জাতির মধ্যে বিবাদ বাধিলে তাহা মিটাইবার উপায় হইবে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। খেলার ফলাফল বিবদমান জাতিদ্বয় সানন্দে স্বীকার করিয়া লইবে, আধুনিক শান্তির সর্তের মতো অনিচ্ছুক স্কন্ধের উপরে তাহা বলপ্রয়োগে চাপাইয়া দিতে হইবে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান বা U. N. O. এবং তাহার পরে I. C. A. বা ইণ্টারন্যাশন্যাল ক্রিকেট এসোসিয়েশন। খেলার অপর নাম লীলা।

আমাদের শাস্ত্রমতে লীলাতেই জগতের সূত্রপাত, আবার আমাদের শাস্ত্রমতে লীলাতেই হইবে জগতের সমাধান। আদ্যবন্তে চ একই পরিণাম, কেবল মাঝখানে যা একটু গোল। এইটুকু কোনমতে পার হইতে পারিলেই আর চিন্তা নাই।

গোরুর গাড়ী

ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষের মতিগতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অচল প্রাচ্য এবারে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পশ্চিমের লোকের চোখে এ দেশকে যে অচল মনে হয় তার প্রধান কারণ ও-দেশের চেয়ে এদেশের গতির তাল স্বতন্ত্র। এ দেশ অচল নয়, মন্থর। যে ব্যক্তি এরোপ্লেনে উড়িয়া চলিয়াছে তার কাছে মাটির গোরুর গাড়ীটাকে অচল বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু গোরুর গাড়ী তো অচল নয়—মন্থর মাত্র! এতদিনে সেই সাধের সনাতনী ভারতবর্ষীয় গোরুর গাড়ীও বুঝি লোপ পায়। যন্ত্রবাহন যন্ত্রবহুল ইউরোপের নিরন্তর কর্মব্যস্ততার হাঁসফাঁস আমাদের শান্ত জীবনের মধ্যে অনেক পরিমাণে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আমরা ইউরোপের মেল গাড়ীখানার পিছনে বাঁধা অনিচ্ছুক মালগাড়ীখানার মতো ছুটিতে বাধ্য হইতেছি। নাগরিক ভারতবর্ষ ইউরোপের Parody হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীন সত্তা এখনো আছে পল্লী-ভারতের; স্বাধীন গতি এখনো আছে এদেশের গোরুর গাড়ীর; পল্লীগ্রামের ধমনীর তাল এখনো স্পন্দিত ওই গোরুর গাড়ীর গতিতে। গোরুর গাড়ীর পরিবর্তে এদেশের পল্লীর শত সহস্র অখ্যাত জটিল পন্থায় একবার মোটর গাড়ী চালু করিয়া দাও। বাস্, আর কিছুই করিতে হইবে না। দেখিতে দেখিতে এখনো যেটুকু ভারতবর্ষীয়ত্ব আছে তাহা লোপ পাইবে—আমরা সর্ব্বতোভাবে ইউরোপের Parody হইয়া উঠিব। সেই আশঙ্কাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধ উপলক্ষে যে সব মার্কিন মিস্ত্রি এ দেশে আসিয়াছে তন্মধ্যে একজন ভারতবর্ষের গোরুর গাড়ী দেখিয়া বড়ই হতাশ হইয়াছে। বোধ করি গোরুর কষ্ট দেখিয়া লোকটা গোরুর প্রতি অনুকম্পান্বিত হইয়া স্থির করিয়াছে শীঘ্রই একপ্রকার উন্নত-ধরণের গোরুর গাড়ী তৈয়ারী করিয়া আনিয়া এদেশে চালু করিবে। মানুষে যখন বিশেষ করিয়া পশুর প্রতি সমবেদনাপরায়ণ হইয়া ওঠে তখন দেখা যায় তার ফলে পশুর দুঃখ তো কমেই না—বরঞ্চ মানুষের দুঃখ বাড়িয়া যায়—প্রকৃষ্টতম

উদাহরণ পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি। এই মার্কিন মিস্ত্রির সমবেদনার প্রস্তাবের ফলে প্রতিদিন আশঙ্কায় কাটিতেছে—কবে বা উন্নততর ধরণের গোরুর গাড়ী এদেশের সনাতনী গোরুর গাড়ীকে কোণঠাসা করিয়া পথঘাট জুড়িয়া বসে। এই উন্নততর গোরুর গাড়ী ঠিক কি রকম হইবে জানি না—তবে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বস্তুটা নিম্নতর ধরণের মোটর গাড়ী ছাড়া আর কিছু নয়। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, ও দেশের জখমী মোটর গাড়ীগুলিকেই নূতন ধরণের গোরুর গাড়ী বলিয়া এ দেশে চালাইয়া দেওয়া হইবে—কেবল তাহাতে Horse Power-এর বদলে Bullock Power যোগ করা হইবে। এ দেশের গোরুর দুঃখ যে কমিবে এমন অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই, তবে ও দেশের কারখানার মালিকদের কিছু ঘাটতি কমিলেও কমিতে পারে। আর এ দেশের যে সব কারিগর গোরুর গাড়ী তৈয়ারী করিয়া জীবিকা অর্জন করিত তাহাদের বৃত্তিহীন হইবার আশঙ্কাও অল্প নয়।

কিন্তু এ সব তো গেল অর্থনীতির হিসাব। এ ছাড়া আর একটা হিসাব আছে যাহাকে বলা যাইতে পারে পরমার্থ নীতির হিসাব। সেই পরমার্থ বা গোরুর গাড়ীর বিশেষ তত্ত্বটি কি? এ দেশের শাসন যন্ত্রটার চালক যাহাতে ভারতবর্ষীয় লোক হয় সেজন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্টের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে। ভারতীয়দের দ্বারা শাসন কার্য্য চালিত হইলে দেশের কিছু উন্নতির আশা করা একেবারে অবাস্তব নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি ভারতীয়দের মন ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া গিয়া থাকে, অর্থাৎ এমন যদি হয় যে, তাহারা দেহে ভারতীয় আর মনে ইউরোপীয় তবে সে রকম চালকের দ্বারা শাসনযন্ত্র চালিত হইলে এমন কি লাভ হইবে? ক্ষতি হওয়াও বিচিত্র নয়। চিন্তা করিবার বিষয় এই যে, আমাদের মন কি ধীরে ধীরে পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে না? মানুষের চেয়ে কলের উপরে আমাদের ভরসা কি ক্রমেই প্রবল আকার ধরিতেছে না? এ দেশের গোরুর গাড়ীতে যে মোহ আছে, সৌন্দর্য্য আছে, তাহার ধীরমন্থর গতিতে ভারতবর্ষের ধীরমন্থর জীবনের যে স্পন্দন আছে তাহা কি আর তেমন করিয়া আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে? সংস্কারের ঝোঁকে কি আমরা সংস্কৃতিকে পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলি নাই? ভাঙনের নেশায় কি আমরা ভাঙিবার হাতুড়িটা পর্য্যন্ত ভাঙিয়া বসি নাই? কালাপাহাড় আমাদের চেয়ে চতুর, সে হাতুড়িটা কখনো ভাঙে নাই।

ভারতবর্ষের প্রতীক ভারতবর্ষের সনাতন গোরুর গাড়ী। আমি যদি চিত্রকর হইতাম—আর কখনো ভারতবর্ষের একটি প্রতীকী চিত্র আঁকিবার প্রয়োজন হইত—তবে আর কিছু না আঁকিয়া একখানি গোরুর গাড়ী আঁকিতাম। উদার প্রান্তরের বুক চিরিয়া সরু একটি পথের ফালি, উচ্চাবচ তরঙ্গিত হইয়া নিরুদ্দেশের মুখে ধাবিত, সেই পথের উপরে একখানি গোরুর গাড়ী। গাড়োয়ান মাথায় জীর্ণ গামছা বাঁধিয়া একটি বাঁশের বাঁশী বাজাইতেছে! তাহার মুখে চোখে কিছুমাত্র ত্বরা নাই; গাড়ীর মন্থর তালের সঙ্গে বাঁশীর সুর মিশিয়া রৌদ্রদীপ্ত নীল আকাশের গায়ে গায়ে সৌন্দর্য্যের আলোকলতা বয়ন করিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর শ্যামল মরকতের পাত্রের উপরে রৌদ্রে-মাজা আকাশের নীলার মুখাবরণ আর তার উপরে বাঁশীর সুর আর রোদের টানা-পোড়েনে-বোনা খুঞ্চাপোষটি কাহার নিপুণ হাতে সযত্নে টানিয়া দেওয়া! দ্বিপ্রহরের রৌদ্রাভিষেক অতিক্রম করিয়া কোন্ সন্ধ্যার স্বর্ণতোরণের অভ্যন্তর দিয়া নক্ষত্রভাস্বর নিশীথের অভিমুখে সেই গোরুর গাড়ীর নিরুদ্দেশ যাত্রা! তাহার ত্বরা নাই, তাহার বিশ্রাম নাই। "Without haste, without rest!" ভারতবর্ষের পরিজ্ঞাত ইতিহাস, অর্দ্ধজ্ঞাত পুরাণ ও অজ্ঞাত কিংবদন্তীকালের এমন প্রতীক আর কি হইতে পারে জানি না! এ গরুর গাড়ীর আবিষ্কার কে করিয়াছিল কেহ জানে না। আর্য্যগণ আসিবার আগে, আর্য্যেতর সভ্যতা ছিল, তারও আগে হইতে ছিল এই গোরুর গাড়ী। গোরুর গাড়ী ও বিন্ধ্যপর্বত ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বস্তু। আর্য্যবংশোদ্ভূত অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্বতের মহিমাকে খর্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু লোপ করিতে পারেন নাই। আর্য্যরাজাদের পুষ্পক রথ গোরুর গাড়ীকে দ্রুত অবজ্ঞায় অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু সে পুষ্পক আজ কোথায়? বিন্ধ্যপর্বতের খর্বোন্নত অনাড়ম্বর তরঙ্গমালা ধীর মন্থর গমনে ভারতবর্ষের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত—গোরুর গাড়ীও গুজরাট হইতে আসাম পর্য্যন্ত আপনার চলমান অধিকার স্থাপন করিয়াছে। রেল, মোটর, এরোপ্লেন তাহার রাজ্যের প্রত্যন্তে আসিয়া বাধা পায়—প্রবেশ করিতে পারে না।

এবারে তাই কি কলের গাড়ী নাম ভাঁড়াইয়া গোরুর গাড়ীর রাজত্ব আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে? মোটর গাড়ী এবার গোরুর গাড়ী সাজিয়া সমুদ্র পার হইতে আসিতেছে। মার্কিনী পরিকল্পিত এই নূতন গোরুর গাড়ী যানবহনের রাজ্যে 'পঞ্চম বাহিনী'। এবারে তাহার হাতে রক্ষা পাওয়া ভার!

ইতিহাসের যাত্রাপথে ভারতবর্ষের আর একটি সঙ্গী আছে চীনদেশ। চীনেরও প্রতীক গোরুর গাড়ী। পৃথিবীর ইতিহাসে দুইখানি গোরুর গাড়ী পাশাপাশি চলিয়াছে চীন আর ভারতবর্ষ। গোরুর গাড়ীর মানদণ্ডে দুইটি সভ্যতম দেশ। আবার মোটর গাড়ীর মানদণ্ডে দুইটি অসহায়তম, পশ্চাদ্গামীতম দেশ। মোটর গাড়ীর প্রচুর ধূলিজালে গোরুর গাড়ী আচ্ছন্ন, কাহারো চোখে পড়ে না। ওই ধূলিজালে গোরুর গাড়ী অর্দ্ধাচ্ছন্ন—বিকৃতভাবে চোখে পড়িতেছে। এরোপ্লেন বিদ্যুৎগতিতে উড়িয়া যায়—ওই গতির দ্রুতিই গোরুর গাড়ীকে দেখিবার অন্তরায়; ওই গতির দ্রুতিতেই গোরুর গাড়ীকে অচল বলিয়া মনে হয়। এই মানদণ্ডেই ভারতবর্ষ এবং চীন অসভ্য।

চীন এবং ভারতবর্ষের যত দুর্গতি সহ্য করিয়া জীবিত আছে এমন আর কোন জাতি নয়। এর চেয়ে অনেক কম দুর্দশায় অনেক জাতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! এই চিরজীবিতা সভ্যতার প্রধান প্রমাণ। আর এই চিরজীবিতার কারণ চীন ও ভারতবর্ষ গোরুর গাড়ীর তত্ত্বকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিল। গোরুর গাড়ী প্রস্তুত করা সহজ; নষ্ট হইলে মেরামত করা কঠিন নয়, আর তাহাকে চালনায় কোনরূপ কৌশলের প্রয়োজন নাই। ক্ষেতের একটা গাছ আর খামারের দুটো গোরু এই তো তার সরঞ্জাম। এই দুই প্রাচ্য দেশ জীবনযাত্রার 'গর্ডন গ্রন্থি' গোড়া ঘেঁষিয়া ছেদন করিয়া দিয়াছে, সেই জন্যই বহু আততায়ী জাতি এই দেশকে জয় করিয়াছে, কিন্তু কেহই বশ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ তাহার প্রাণকে সাত লক্ষ ভাগে দেশের সাত লক্ষ গ্রামে ছড়াইয়া দিয়াছে। সে প্রাণ পুরুষকে পুঞ্জীভূত করিয়া নগর গড়ে নাই। ভারতবর্ষের সভ্যতার লক্ষণ বিকেন্দ্রীকরণ; তাহার প্রাণ গ্রামে, আর গোরুর গাড়ীতে গ্রামের রক্ত চলাচল করে।

ইউরোপ সভ্যতাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া শহর গড়িয়াছে। একটি শহরে দেশের প্রাণ পুঞ্জিত, সমস্ত দেশ সেখানে পৌছিতে চায়, কাজেই আবশ্যক তার দ্রুতি। আর এই চাহিদার ফলেই দ্রুত বাহনের সাধনায় সে রেল, মোটর, এরোপ্লেন আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু এই ঐকান্তিক কেন্দ্রীকরণই তার মৃত্যুর কারণ। একটি শহরের পতন হইলেই কেন যে একটা দেশের পতন হইবে তা ভারতবর্ষ বুঝিতে পারে না। বর্তমান যুদ্ধে লণ্ডন ও দুই চারটা শহরের পতন ঘটিলেই ইংলণ্ড জার্মান কবলিত হইত। প্যারিসকে রক্ষা করিতে গিয়াই ফ্রান্স গেল। বার্লিনের পতনের পরে আর জার্মানীকে ঠেকাইয়া রাখা গেল না। নেপোলিয়ান মস্কো অধিকার

করিয়াও রাশিয়াকে পদানত করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তারপর হইতে রাশিয়া কেন্দ্রীকরণের সাধনায় নিরত। এবারে মস্কো অধিকৃত হইলে যে তাহার পতন ঘটিত না, এমন মনে করিবার কি হেতু আছে? একথা আর কেহ জানুক বা না জানুক স্টালিন বিলক্ষণ জানিতেন। তাই জার্মানীর মস্কো-অভিযান সমস্ত পণে তিনি ঠেকাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ সমস্তের মূলেই ওই কেন্দ্রীকরণের আতিশয্য। কেন্দ্রীকরণ কাচের ন্যায় কঠিন, কিন্তু ভঙ্গুর। কেন্দ্রীকরণ দেশকে প্রবল করে, কিন্তু ভাঙে যখন তখন আর রক্ষা নাই। বিকেন্দ্রীকরণ রবারের মতো, নরম কিন্তু স্থিতিস্থাপক। তাহা দেশকে প্রবল করে না, কিন্তু সহিষ্ণুতার বল দান করে। মোটর দৌড়ায় খুব, কিন্তু একবার ভাঙিলে তাহাকে ঘাড়ে করিয়া বহন ছাড়া গত্যন্তর নাই। আর মন্থর গোরুর গাড়ী ভাঙিতে পারে সত্য, কিন্তু সারাইতে কতক্ষণ!

পাঠক, এ সব কথা হয় তো তোমার ভালো লাগিবে না, খুব সম্ভব বুঝিতেও পারিবে না। কিন্তু এত গোলযোগে প্রয়োজন কি? শীতের রাত্রে দীর্ঘপথ গোরুর গাড়ীতে করিয়া কখনো গিয়াছ কি? প্রচুর খড়ের গদির উপরে বিছানাপাতা, দু'দিকে মোটা পর্দা টানিয়া দিয়া, পথের তালে তালে দুলিতে দুলিতে যদি কখনো যাত্রা করিয়া থাকো—তবে বুঝিবে গোরুর গাড়ীতে কি আরাম! তার কাছে রেল, মোটর তুচ্ছ। গোরুর গাড়ীর মন্থরতায়, একপ্রকার নবাবী আছে যাহার অধিকাংশই দিল্লীর বাদশাহী, অম্বুরী তামাক প্রভৃতির সঙ্গে গত হইয়াছে। এই নবাবী প্রাচ্যের স্বভাবসিদ্ধ। ব্যস্তবাগীশ পশ্চিম এরোপ্লেনে চড়েতো চড়ুক। এসো পাঠক, আমরা উদ্দেশ্যহীন গোরুর গাড়ীর লক্ষ্যহীন যাত্রায় বাহির হইয়া পড়ি। প্রচুর অবকাশের ঢিলে-জামা-টা গায়ে জড়াইয়া আসর জমাইয়া বসি। পশ্চিমের অচলতার অপবাদের উত্তরে আমরা বলিব—ওরা চঞ্চল, ওরা নিতান্তই ছেলেমানুষ। এত হাঁসফাঁসের অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের ত্বরা নাই, আবার বিরামও নাই। "Without haste, without rest"—ইহাই গোরুর গাড়ীর বাণী।

রৌদ্রদগ্ধ ভারতবর্ষ

আজ ছাব্বিশে বৈশাখ। মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। গাড়ীর গতি দ্রুত। রুক্ষ প্রান্তর পার হইয়া চলিয়াছি—ভূ-দৃশ্য দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই বাঙলাদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া বিহার প্রদেশে পড়িয়াছি কি না! দুইদিকে লাল মাটির

রিক্ত মাঠ, নির্জলা নদী, শালের অরণ্য, দিগন্তে পাহাড়ের রেখা এখনো দেখা দেয় নাই। প্রখর রৌদ্রের ঘাম-তেল-ঘষা দৃশ্য মরীচিকার মতো কম্পমান।

গাড়ীর মধ্যে আমরা তিনটি প্রাণী। আমি এবং আর এক ভদ্রলোক ও তাহার ভৃত্য। কামরার শার্সি ফেলা, পাখা ঘুরিতেছে, গাড়ী দুলিতেছে। ভৃত্যটি, তাহার প্রভুর জন্য ইকমিক কুকারে রান্নায় নিযুক্ত। ভদ্রলোকটি টাইম টেবল পড়িতেছে আর এক একবার ধূমায়িত কুকারের দিকে তাকাইয়া আসন্ন আহারের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আমি একাকী বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছি। ডান দিকের জানালা দিয়া তাকাইয়া আছি—মাঝে মাঝে বাম দিকের জানালাতেও তাকাইতেছি—দুইদিকের দৃশ্যে মিলাইয়া লইবার জন্যে। দুইদিকে একই দৃশ্যের রূপান্তর।

গাড়ীর মধ্যেই যা কিছু প্রাণের লক্ষণ, গাড়ীতেই যা কিছু ধ্বনি এবং গতি, বাহিরের দৃশ্য নিশ্চল, নির্জীব, জীবনচিহ্ন বিবিক্ত—এ যেন পৃথিবীর প্রান্তর নয়—কোন মৃতগ্রহের প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি—চন্দ্রলোকের প্রান্তর কি ইহার চেয়ে খুব বেশি ভিন্ন? কেবল স্টেশনে আসিয়া যখন গাড়ী থামে তখন দু'দশজন লোক দেখিতে পাওয়া যায়। পানি পাঁড়ে জল লইয়া আগাইয়া আসে, স্টেশন মাস্টার কালো টুপি ও স্থূল দেহ লইয়া ব্যস্ততা দেখায়, দু'চারজন যাত্রী ওঠা-নামা করে, বড় বড় প্রাচীন গাছের তলে মধ্যাহ্নতন্দ্রায় অন্য গাড়ীর যাত্রীরা ঢুলিতে থাকে, সিগ্ন্যালম্যান প্রাণপণে সিগ্ন্যাল টানে, ঘন্টিওয়ালা ঘণ্টা মারে, গার্ড নিশান দোলায়—গাড়ী আবার নড়িয়া ওঠে। নিস্তব্ধের অদৃশ্য সূতার মাঝে মাঝে স্টেশনের শব্দমণি-গাঁথা বিচিত্র এই হার, নির্জীবতার মরুভূমিতে স্টেশনগুলি প্রাণের মরূদ্যান।

স্টেশন ছাড়িয়া এবারে আর এক প্রান্তরের মধ্যে পড়িয়াছি। চড়াই রেল লাইন—ইঞ্জিনের হাঁসফাঁস শব্দ বড়ই উৎকট হইয়া উঠিয়াছে। ঢেউ-খেলানো দগ্ধ মাঠ গাড়ীর গতি ও মোড় ঘুরিবার সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে তরঙ্গিত হইতেছে—নিশ্চল ঢেউ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া একটার সঙ্গে আর একটায় মিশিতেছে, একটার ঘাড়ে যেন আর একটা ভাঙিয়া পড়িতেছে। অতি দূরে একটা কলের চিমনি, প্রখর রৌদ্রে দূরবর্তী বাড়ীর অদৃশ্য-প্রায় শুভ্রতা। হঠাৎ এক সার তাল গাছ আসিয়া পড়িল। তারপরেই একটা নদীর শুষ্কখাত, নদী পার হইতেই শালবন। গাড়ী প্রকাণ্ড শালবনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। লাইনের ঠিক পাশের গাছগুলি

ছোট, কিন্তু যতই দূরে যাওয়া যায় বনস্পতির সংখ্যা প্রচুর। বনের মধ্যে নিশ্চয় ঘন ছায়া আছে, কিন্তু গাড়ীর উপরে প্রচণ্ড রৌদ্র।

ভারতবর্ষের মতো বিরাট্ দেশকে যদি দেখিতে হয় তবে এভাবে দেখা ছাড়া উপায় নাই—এইভাবেই তাহাকে দেখিবার প্রকৃষ্টতম পন্থা। আজ সকালে যখন রওনা হইয়াছিলাম—ছিল ভেজা মাটি, খাল বিল, ধান পাট, আম জামের দেশ, ছিল পথের দুইদিকে ছায়া-ঘেরা পল্লী, ছিল ঝিল পুকুর আর বড বড় নদী। তারপরে পৃথিবীর শ্যামলিমা ক্রমে ফিকা হইতে থাকিল—উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি লঘু হইয়া আসিল, মাটির কালো রঙে গেরুয়া মিশিয়া লাল হইয়া উঠিল, মাঠে ঢেউ দেখা দিল, শাল তাল জাগিতে আরম্ভ করিল—বস্তুবহুল চিত্রপট ক্রমে রেখাবিরল হইয়া উঠিতে উঠিতে অবশেষে আকাশ ও পৃথিবীর ন্যূনতম রেখায় আসিয়া ঠেকিল। ঊর্দ্ধে নভোরেখার ধনুষ্ক খিলান—নিম্নে পৃথিবীর একটি সমতলরেখা, আর এই দুইকে অভিষিক্ত করিয়া ঝরিতেছে সোনার রৌদ্র—যেন শূন্যে বিলম্বিত পাখী উড়িয়া-যাওয়া একটি সোণার দাঁড়! কোন্ বিহঙ্গের আশ্রয় এই সনাতন সুবর্ণদণ্ড জানি না! সে বুঝি ওই সোণার রৌদ্রে মাতাল হইয়া উড়িয়া গিয়াছে—বিশ্বের দূরতম প্রান্তে!

আমার দুইদিকে রৌদ্রদগ্ধ ভারত—এই তো আমার ভারতবর্ষ। আধুনিক শহরের কল-মিলের ধোঁযায় ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন, আধুনিক শহরের নভোস্পর্শী অট্টালিকার অন্তরালে ভারতবর্ষ অন্তর্হিত, আধুনিক রাজনীতির বিষোচ্ছ্বাসে ভারতবর্ষ মলিন! কিন্তু ভারতবর্ষকে তো দেখিতেই হইবে!

ভারতবর্ষকে দেখিতে হইলে ভারতবর্ষের জনশূন্য প্রান্তরে আসা ছাড়া উপায় নাই। ভারতবর্ষ তাহার নির্জন মহাপ্রান্তরে পঞ্চাগ্নির হোমানল জ্বালিয়া মীনশান্ত সরোবরের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া আছে। মহাতপস্বী ভারতবর্ষ ঝটিকাপূর্ব প্রকৃতির ন্যায় নিঃশ্বাস রোধ করিয়া তাহার মহাপ্রান্তরগুলিতে ধ্যানস্থ। তাহার নেত্র মুদ্রিত, তাহার অঙ্গুলি মুদ্রান্বিত, তাহার বক্ষবিলম্বী অক্ষমালা গ্রহসমূহের মতো অচঞ্চল। কে তাহার কাছে আসিল, কে চলিয়া গেল, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে কি পাইল এবং কি পাইল না সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। দেশাতীত এই তপস্বীর সমগ্র দেশ পদ্মাসন, কালাতীত এই তপস্বী কাল-নাগকে সযত্নে কণ্ঠে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার নিমীলিত চক্ষুর দেশ-কাল-সংস্কারের সপ্ততালভেদী অন্তর্লীন দৃষ্টি বিশ্বের পরপারবর্তী মহাধ্রুব জ্যোতির্বিন্দুটির প্রতি একাগ্রে অভিনিবিষ্ট!

এই আমার সেই ভারতবর্ষ! রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তরে একবার চকিতের মধ্যে যেন তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম।

মনের মধ্যে হঠাৎ গুঞ্জরিয়া উঠিল—

আমার ভারতবর্ষ নহে সে তো ভৌগোলিক সীমা,
সে যে এক অপূর্ব মহিমা।'

ওই দুটি ছত্র মনের মধ্যে তপস্বীর অঙ্গুলিচালিত জপমালার মতো ক্রমাগত আবর্তিত হইতে থাকিল!

আমার ভারতবর্ষ নহে সে তো ভৌগোলিক সীমা,
সে যে এক অপূর্ব মহিমা!'

অপূর্ব মহিমাই বটে! আমাব ভারতবর্ষ ভাবৈকদেহ। কিন্তু এই মহিমাকে, এই ভাবস্বরূপকে উপলব্ধি করিবার ক্ষেত্র কোথায়? সে ওই তাহার রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর! সে ওই তাহার নিস্তব্ধ নির্জনতা! কি পরম সৌভাগ্যের ফলে জানি না, একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া আকস্মিকভাবে সেই মহাতপস্বীকে আজ দেখিতে পাইলাম।

সূর্য্য-নমিত দিগন্তের দিকে গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে।

যন্ত্রবর্জিত ভারতবর্ষ

প্র-না-বি'র সঙ্গে ট্রেনে করিয়া চলিয়াছি। হাওড়া স্টেশন ছাড়াইতেই গাড়ীখানা লাইন হইতে লাইনান্তরে চালিত হইয়া আচ্ছা করিয়া ঝাঁকুনি খাইল—পুরু গদির উপরে বসিয়া থাকিলেও সে প্রবল ঝাঁকুনি মজ্জার মধ্যে অনুভব করা যায়। দুইদিকে কল-কারখানার টিনের চালা, পোড়ো জমি আর জলাভূমি—এমন অবসন্ন ও মলিন! সমস্ত প্রকৃতি ও ভূখণ্ড যেন কলিকাতার পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টের মতো। এত বড় শহরের ঠিক বাইরেই এমন হতশ্রী কুৎসিত দৃশ্য। 'Mighty Heart'-এর কি লক্ষ্মীছাড়া পরিবেশ। কেবল আকাশের দিকে চাহিলে প্রকৃতির প্রসন্নতা কতক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্র-না-বি গাড়ীর দেয়ালে ঠেস দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন আমি উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া আছি, কিছু বলিলে টুকিয়া লইয়া পাঠককে উপহার দিবার আশায়।

আমাদের লম্বা-পাড়ির মেলগাড়ী বেলুড় স্টেশন অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধমান কর্ডে ঢুকিয়া পড়িল—দুইদিকে ইটখোলার গভীর গর্ত—কলিকাতার সুউচ্চ প্রাসাদশ্রেণীর পরিপূরক দৃশ্য। অর্থাৎ আশেপাশের গভীর গর্তগুলিকে কলিকাতার বাড়িঘরের বিপরীত দৃশ্য বলা চলে—বাড়িঘরগুলি যত উঁচু এই গর্তগুলি তত নীচু ইহা যেন একপ্রকার উল্টা কলিকাতা। চন্দ্রমণ্ডলে যেমন কলঙ্কের খাল—এ গর্তগুলিও তেমনি খুব্‌লে-খাওয়া। গাড়ি আর একটু অগ্রসর হইতেই শহরের ভুক্তাবশেষ ভূখণ্ডের সীমা অতিক্রম কবিয়া প্রকৃতিব নিত্য-লীলার আসরে গিয়া পৌছিলাম। দুইদিকে ধানের ক্ষেত, পক্বপ্রায় ধানের উপরে অপরাহ্নের আভা, মাঝে মাঝে দু'চারটা গাছের ঝোপ, দূবে গ্রামের পুঞ্জিত বাঁশ ও আম-কাঁঠাল, জলাশয়ে শাপলা, ইতস্ততঃ গো-মহিষ, টেলিগ্রাফের তারে ফিঙের দল, আকাশ বকের তিলক-কাটা, প্র-না-বি'ব মুখে প্রসন্নতা, বুঝিলাম—প্রশ্ন করিলে এখন উত্তর পাওয়া যাইবে।

আমি সসঙ্কোচে শুধাইলাম—এবারে কলকাতায় এসে কেমন লাগল ?

প্র-না-বি বলিলেন—অনেককাল পবে কলকাতায় এলাম, কাজেই মন্দ লাগবার কথা নয়, কিন্তু একটা কথা খুব বেশি ক'রে মনকে নাড়া দিল।

আমি চুপ কবিয়া রহিলাম—জানি পুনরায় প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন নাই।

তিনি বললেন—সেদিন একটা কাল্‌চার এসোসিয়েশনে সভাপতিত্ব ক'রতে গিয়েছিলাম। সেখানে কি বলেছিলাম জানেন ? বলেছিলাম যে মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা—সবই ধ্বংস পাবার মুখে—এভাবে চললে আর এক আধ শতাব্দীব মধ্যে সংস্কৃতির শেষ চিহ্নটুকুও লোপ পাবে।

আগুনকে প্রোজ্জ্বলতর করিবার আশায় যেমন খুঁচাইয়া দেওয়া হয়—সেইভাবে আমি ছোট্ট একটি প্রশ্নের খোঁচা মারিলাম—কেন ?

তিনি বলিলেন—কেন কি ? চারিদিকে দেখ্‌ছেন না—মানুষ আজ কর্মভারে পীড়িত। তার ঘাড় থেকে এই বোঝা নামিয়ে না নিলে তার ভাববার অবসর কোথায় ? যে লোকটা মাথায় আড়াই-মণি বোঝা নিয়ে চলেছে, তার বেদান্ত আলোচনার বা কালিদাসের রসগ্রহণের মতো মনের অবস্থা কি ? আজ জীবিকার্জনেই যাচ্ছে মানুষের পনের আনা সময়—চিন্তা করবে সে কখন ? অহৈতুকী চিন্তা ! যে এক আনা সময় তার হাতে থাকে তার রসে কি কাল্‌চারের ফসল ফলানো সম্ভব ! মানুষের জীবিকার্জনের দায় কমিয়ে না আনলে, তাকে তার

প্রয়োজনের দাসত্ব থেকে মুক্তি না দিলে, তাকে আবার অগাধ অবসরের মানস সরোবরে বিলাস করতে না দিলে তার আধ্যাত্মিক মৃত্যু সুনিশ্চিত।

আমি বলিলাম—সভ্যতা সংস্কৃতির অভাব কি আপনি লক্ষ্য করেছেন?

—করেছি বইকি কিন্তু এখনও যে সকলের চোখে পড়ছে না তার কারণ পুরাতনের জের খানিকটা পর্য্যন্ত চলে। এই যেমন ইঞ্জিন কেটে দিলেও গাড়ীর চাকা খানিকদূর পর্য্যন্ত গড়ায়।

গাড়ী বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌছিল। গাড়ীর সব যাত্রীই কি একটিমাত্র মনোভাব লইয়া এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল? নতুবা সবাই একযোগে মিহিদানার দোকানে গিয়া পড়িল কেন? পঙ্গপাল যেমন ক্ষেতের শেষ ফসলকণাটি নিঃশেষ করিয়া আবার উড়িয়া যায়, যাত্রিগণ মিহিদানার শেষ দানাটি শেষ করিয়া গাড়ীতে আপন আপন স্থানে আসিয়া বসিল। ড্রাইভার ও গার্ডেরও বোধ করি মিহিদানা ভোজন শেষ হইয়াছে—নতুবা গাড়ী ছাড়িল কেন?

প্র-না-বি পূর্বানুবৃত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন—প্রাচীন যুগের ধাক্কায় এখনও সংস্কৃতির গাড়ীখানা চলছে বলেই আজও সভ্যতা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু ভুলে যাবেন না, ওটা বর্তমানের রেশ নয়, পুরাতন ধাক্কার জের—মৃত্যুর পরেও মৃত দেহের আক্ষেপের মতো। সংসারে আজ পনেরো আনা লোকের সময়াভাব—জীবিকার্জনের গুরুভারে তারা নিষ্পেষিত। আর যে এক আনা লোকের অবকাশ আছে, তারা তাকে ঠেসে ভর্তি করেছে রাজনীতি আর অর্থনীতি দিয়ে। যেখানে যাই, কেবলি শুনি—Planning আর Politics। বিজ্ঞান নয়। যে-বিজ্ঞান মানুষের বুদ্ধিকে মুক্তি দেয়, তাকে অনন্তের স্বাদ দেয়—আপেল ফল ছুঁড়ে তাকে আকাশের দিকে তাকাতে ইঙ্গিত করে বিজ্ঞানের সে-মূর্তি নয়। বিজ্ঞানের ব্যাবহারিক ফললাভের আশায় মানুষ উদ্‌গ্রীব। বিজ্ঞান চর্চা করলে অনেক টাকা হবে, অনেক শক্তি করায়ত্ত হবে—এই লোভেই সকলে বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকেছে। বিজ্ঞান-জাহ্নবীর স্রোতের চেয়ে তার ফেলে-যাওয়া পলিমাটির দিকেই সকলের লোভ—ওখানে চাষ হবে। কাল্‌চার হচ্ছে অবকাশের ফসল, অতিরিক্তের আনন্দময় মূর্তি, আবশ্যকের স্রোতের অনাবশ্যক ফেনা। কিন্তু কোথায় বা আজ অবকাশ, কোথায় বা অতিরিক্ত—আর কোথায়ই বা অনাবশ্যক।

আমি শুধাইলাম—কাল্‌চারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কিরূপে সম্ভব?

তিনি বলিলেন—তার জন্য ভারতবর্ষকে যন্ত্রবর্জিত করা দরকার—ইংরাজ বর্জনের চেয়ে তা বেশি বই কম প্রয়োজনীয় নয়।

বাইরের দিকে উদাসভাবে তাকাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—যন্ত্রবর্জিত ভারতবর্ষের একটি রূপ আমি মনে মনে দেখে থাকি। যন্ত্রবাদের স্রষ্টারা আশা করেছিল, যন্ত্র মানুষকে প্রয়োজনের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে—কিন্তু দেখল সে লাঙল ও তাঁতের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বেঁধেছে কারখানার শৃঙ্খলের বন্ধনে, অতিলোভের রজ্জুতে, যেন ঊর্ণা জালের বন্ধনের পরিবর্তে দেহে নিয়েছি শিকলের বাঁধন।

আমি মনে স্বপ্ন দেখ্‌ছি—চল্লিশ কোটি লোকের দশ কোটি বাড়ির প্রত্যেকটি ছোট একটি কারখানা। কারখানা এবং চাযের ক্ষেত এবং ফুলের বাগান এবং বিদ্যালয় এবং দেবমন্দির—একত্র। চল্লিশ কোটির প্রত্যেকটি লোক চাষী এবং মজুর এবং শিক্ষক এব শিল্পী এবং পূজারী—একত্র। আমাদের যিনি চালক হবেন, তিনি সাধক এবং শাসক এবং কবি এবং দার্শনিক—একত্র। আমাব মনে ভারতবর্ষের যে রূপ বিরাজমান, তা অতীত এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—একত্র—অর্থাৎ তা সনাতন। কিন্তু এ সমস্তর ভূমিকাস্বরূপ প্রথমে চাই যন্ত্রবর্জিত ভারতবর্ষ। তখন কর্তব্যে এবং সৌন্দর্য্যে ভেদ ঘুচে যাবে, কর্ম এবং আনন্দ এক হয়ে উঠ্‌বে, মজদুর এবং শিল্পীতে কোন ভেদ থাক্‌বে না। মনে রাখবেন প্রাচীন লোক-সংগীত ও লোক-সাহিত্য যারা রচনা করেছে, তারা লাঙল চালাতো, তাঁত বুনতো, চরকা কাট্‌তো, সোনা-রূপার বাসন বানাতো। এখন যারা কলের লাঙল চালায় আর কারখানায় কাজ করে, তারা কোন রকম সংগীত ও সাহিত্য এ পর্য্যন্ত তৈরী করতে পারেনি। কাজে তাদের আনন্দ নেই, যে-আনন্দ শিল্পের মূল কথা।

ইতিমধ্যে কখন যে আমরা আসানসোল অতিক্রম করিয়াছি, জানিতেই পারি নাই—হঠাৎ চোখে পড়িল রেলপথের বামদিকে অদূরস্থ বার্নপুরের লোহার চিমনির শ্রেণী—তরল অন্ধকারে ভূতের মত ছায়াশরীরী। একটা চিমনি দিয়া মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড একটা আগুনের হল্‌কা আকাশে অনেকটা দূর পর্য্যন্ত লাফিয়ে উঠ্‌ছে—যন্ত্রবাদের রাক্ষসী জিহ্বা।

প্র-না-বি বলিলেন—ওই রাক্ষসী জিহ্বাই জীবনের সব রস নিঃশেষে মুছে নেবে—নিয়েছে, এখনও যেটুকু বাকী আছে, অল্পদিনের মধ্যে তার চিহ্নটুকুও আর

থাক্‌বে না। আমার যন্ত্রবর্জ্জিত ভারতবর্ষ বাতুলের স্বপ্ন বলে উপহসিত হবে—লোকে সত্য মনে করবে—ওই রাক্ষসের জিহ্বাটাকেই; কিন্তু ওটাই কি একমাত্র সত্য? তবে ওগুলো কি?

এই বলিয়া তিনি আকাশের তারাগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

কবির পদ্মা

রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য, দুই তীরভূমির মধ্য দিয়া পদ্মা প্রবাহিতা। একদিকে ঘনবসতি পল্লী, প্রৌঢ় শস্যক্ষেত্র, প্রাচীন বয়সের আম কাঁঠালের বাগান, আর একদিকে নূতন-জাগা কোমল চর, জলচর পাখীর পায়ের চিহ্নগুলি এখনো তাহাতে অবিকৃত, একদিকে সুউচ্চ তটভূমির প্রান্ত ঘেঁষিয়া বিদেশী মাল্লার দল ঈষৎ নত হইয়া পড়িয়া গুণ টানিয়া চলিয়াছে আর একদিকে নিষ্কলঙ্ক কন্যাভূমির শুচি-শুভ্রতা দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত; পূর্ব্বতীরে তাহার সূর্য্যোদয়, আর পশ্চিমতীরের দূরতম প্রান্তে নিমজ্জমান সূর্য্যগোলকের শেষতম বিন্দুটি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়—আর এ দুইকে সংযুক্ত করিয়া উর্দ্ধে আকাশের নীলকান্ত পাষাণের নির্ম্মল তোরণ, নিম্নে পদ্মার জলপ্রবাহ, বর্ষায় গৈরিক, শরতে নীলাভ, শীতান্তে নীল।

রবীন্দ্রনাথের পদ্মা প্রবাহের এক দিকে—

> 'কত গ্রাম, কত মাঠ, কত ঝাউ ঝাড়
> কত বালুচর কত ভেঙে পড়া পাড়',

আর,—

> কভু শান্ত হাম্বাস্বর,
> কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্ম্মর
> জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্য পরে
> চিলের সু-তীব্র ধ্বনি, কভু বায়ু ভরে
> আর্ত্ত শব্দ বাঁধা তরণীর, মধ্যাহ্নের
> অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
> স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি।'

আর একদিকে—

'নদীর জল প্রতিদিনই বেড়ে উঠছে। পরশুদিন বোটের ছাতের উপর থেকে যতখানি দেখা যেতো আজ বোটের জানালায় বসে প্রায় ততটা দেখা যাচ্ছে—

প্রতিদিন সকালে উঠে দেখি তটদৃশ্য অল্প অল্প করে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। এতদিন সামনে ঐ দূরে গ্রামের গাছপালার মাথাটা সবুজ পল্লবের মতো দেখা যেতো—আজ সমস্ত বনটা আগাগোড়া আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে।'

আবার—

'আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষাবা নৌকো বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে, আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকো যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি—যখন আর কয়দিন থাকলে ধান পাকতো তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতে পারা যায়। যদি ঐ শীষের মধ্যে দুটো চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে এই তাদের আশা।'

এই গেল পদ্মার দুই তীরের অবস্থা।

আর ঊর্দ্ধে—

'স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্মল বিস্তার,
মধ্যাহ্ন আলোকপ্লাবে জলে স্থলে বনে
বিচিত্র বর্ণের রেখা।'

আর ওই সঙ্গে নিম্নে—

'ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে; অর্দ্ধ-মগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে; ভাঙা উচ্চতীর;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটীর;
বক্রশীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হ'য়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত জিহ্বার মতো; গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠ মগন
করিছে কৌতুকালাপ; উচ্চ মিষ্ট হাসি
জলকলস্বরে মিশি পশিতেছে আসি
কর্ণে মোর; বসি এক বাঁধা নৌকা পরি

বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি
রৌদ্রে পিঠ দিয়া; উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে; ধৈর্য্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে, তার স্নেহ জ্বালাতন।'

সংসারের গতি স্বর্গ হইতে মর্ত্যে প্রত্যাবর্তনের পথে দুষ্মন্তের রথের মতো—কাছের জিনিষ দূরে যাইতেছে—দূরের বস্তু কাছে আসিয়া পড়িতেছে—ছোট বড়, এবং বড় ছোট হইতেছে—আমরা সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে দুষ্মন্তের মতো নিত্য নিয়ত স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। কবির পদ্মাও এই নিয়মের অন্তর্গত। বহুকাল পরে পরিচিত পদ্মা কবির কাছে অপরিচিতপ্রায়া।

"…এখন এসে দেখি সে-নদী যেন আমাকে চেনে না। ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল, সব শেষে উত্তর-দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মতো একটি বনরেখা দেখা যায়। সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ যে একটা ঝাপসা বাষ্পরেখাটির মতো দেখ্‌তে পাচ্ছি, জানি ঐ আমার সেই পদ্মা। আজ সে আমার কাছে অনুমানের বিষয় হ'য়েছে। এইতো মানুষের জীবন; ক্রমাগতই কাছের জিনিষ দূরে চ'লে যায়, জানা জিনিষ ঝাপসা হ'য়ে আসে, আর যে-স্রোত বন্যার মতো প্রাণমনকে প্লাবিত করেছে, সেই স্রোত একদিন অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মতো জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।'

এই যদি জীবনের ধর্ম হয়, ইহজীবনেই যদি একদা-প্রিয় অপরিচিত হইয়া পড়ে তবে কবির সেই আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা কোথায়? পরজন্মে পদ্মাতীরে ফিরিয়া আসিলে পদ্মা কবিকে চিনিতে পারিবে এমন ভরসা কি জোর করিয়া করা চলে? অথবা যে-পদ্মা পূর্বে দিগন্ত হইয়া অপসৃত হইতে হইতে পশ্চিম দিগন্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে—সে কি কবির জীবনের গতির সঙ্গেই তাল রাখিয়া চলিতেছে না? কবি-জীবনের অস্তাচল ঘেঁষিয়া প্রবাহিত হইবার জন্যই কি সে পূর্বাচলের দিগন্ত পরিত্যাগ করে নাই? আর আজ যখন কবি পশ্চিম দিগন্তেরও পরপারে অস্তমিত—তখন কবির পদ্মা কি তাঁহার সহগমন করে নাই! নদীকে সর্পিণী বলা হইয়া থাকে—তাহা যদি হয় তবে সর্পিণী কি নির্মোকখানা মাত্র ফেলিয়া রাখিয়া সূক্ষ্মতর শরীরে প্রস্থান করে নাই! আমরা যাহাকে এখন পদ্মা

বলিতেছি—তাহা যে তাহার নির্মোক মাত্র নয়—তাহা কে জোর করিয়া বলিতে পারে ?

শুধু পদ্মা কেন, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিই অনন্ত নাগিনী। সে মুহুর্মুহু নির্মোক পরিত্যাগ করিতেছে। আমরা তাহার খোলসটা মাত্র দেখি, কবিরা দেখিতে পান তাহার স্বরূপকে। কেবল খোলসটা দেখি বলিয়াই বিশ্ব আমাদের চোখে বস্তুপিণ্ড। নদী বারিপ্রবাহ, তরু অঙ্গারের বিকার, পাহাড় প্রস্তরস্তূপ—আর আকাশ অগাধ শূন্যতা। সেইজন্যই কবির পদ্মায় আর আমাদের পদ্মায় এত প্রভেদ। কবির পদ্মা চিত্রাঙ্গদা বলিয়াই কবির সহিত তাহার গান্ধর্ব পরিণয় সম্ভব হইয়াছিল। আমাদের কাছে সে মানচিত্রের নির্জীব নীল রেখা।

কবির সহিত পদ্মার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে ইহা চিন্তা করিতে মন সরে না। কবি-স্বর্গে পদ্মা সূক্ষ্মতর স্বরূপে বিরাজ করিতেছে বরঞ্চ এই জল্পনা করিয়াই সুখী হইব। স্বর্গের ভূ-বৃত্তান্ত আমার ভালো জানা নাই—তবু মনে হয় সেখানে পদ্মার অনুরূপ একটা নদী আছে এবং সেই নদীর ঘাটে সোনার তরী নামে একখানা বোট বাঁধা। মৃত্যুর পরে কবি সেই পরিচিত নদী, সেই পুরাতন নৌকা দেখিয়া খুশী হইয়া উঠিয়াছেন। আপন অভ্যস্ত কোণটিতে গিয়া বসিয়াছেন। তপসে, ফটিক প্রভৃতি মাঝিমাল্লার দল নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা নিজ নিজ স্থানে আসিয়া লগি, বৈঠা, হাল ধরিয়া বসিয়া অনুকূল বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। এ যাত্রার আর শেষ নাই—কারণ এ যাত্রা লক্ষ্যহীন, যে-নিরন্তর অবাধ গতির স্বপ্ন সারা জীবন ধরিয়া কবি দেখিয়াছেন—ওখানে তাহারই—যেন পরমাসিদ্ধি !

মহাত্মা গান্ধীর লাঠি

বঙ্কিমচন্দ্র লাঠিব প্রশস্তিতে সব কথাই লিখিয়াছেন কেবল একটি ছাড়া। তিনি মহাত্মা গান্ধীর ধৃতযষ্টি মূর্তি দেখেন নাই, কাজেই লাঠির মহত্তর বিভূতি তাঁহার প্রশস্তি হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে! অদৃষ্টের কোন্ রহস্যে ওই বাঁশের টুকরা গান্ধী-মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে জগৎ-প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

পাঠক, গান্ধী-চরিত্র সমুদ্রের মতো অতল এবং অপার ; সে সমুদ্রের ডুবারীও আমি নই, নাবিকও আমি নই। গান্ধী-চরিত্র ব্যাখ্যার যোগ্যতা বা সাহস আমার

নাই। তাঁহার হাতের ওই লাঠিখানার বর্ণনা যদি করিতে পারি তবেই যথেষ্ট মানিব।

মহাত্মাজী কবে হইতে লাঠি ধরিয়াছেন ঠিক বলিতে পারি না। খুব সম্ভবতঃ যখন সাহেবী পোযাক ছাড়িলেন লাঠিও তখনি ধরিয়াছেন। তাঁহার যষ্টিবিহীন ছবি এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য। পরবর্তীকালের চরখার মতো হাতের লাঠি তাঁহার চিরন্তন সঙ্গী।

এক সময়ে বয়স যখন অল্প ছিল লাঠিগাছা তাঁহাকে ভর করিয়া দাঁড়াইত, এখন বৃদ্ধবয়সে তিনিই লাঠির উপর ঈষৎ ভর কবিয়া চলেন। পাঠক, নন্দলালের অঙ্কিত তাঁহার সেই যষ্টি-নির্ভর ছবিখানা দেখিয়াছ? ধৃতযষ্টি মুষ্টিতে শিরাগুলি স্ফীত, বাহুর মাংসপেশী পরিদৃশ্যমান, ঈষৎ নত মুখমণ্ডল, যুগ্ম চোখের দৃষ্টির ঠেলায় পথের বিঘ্ন অপসারিত, চরণদ্বয়ের অগ্রগতির অব্যাহত একনিষ্ঠা, দেখিয়াছ সেই ছবি। তাহার পটভূমির খোপে খোপে ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষের মূর্তি—চুম্বক-চঞ্চল শত সহস্র সব লোহার পুতুল! সমস্ত দেশের চঞ্চলতা আর উৎসাহ আছে ওই ছবিখানিতে। "হাম জব যাত্রা শুরু করেঙ্গে তামাম্ হিন্দুস্থান উথল যায়েঙ্গে।" তামাম্ হিন্দুস্থানের উতলা ভাব আছে ওই ধৃতযষ্টি ছবিতে।

ওই ক্ষীণ লাঠিখানা একাধারে রাজদণ্ড, মানদণ্ড, হিন্দুস্থানের জাদুকরের জাদুদণ্ড। গান্ধী যখন যাত্রা করেন ভারতবর্ষ তাঁহার অনুসরণ করে, সেই শোভাযাত্রার পথপ্রদর্শক ওই লাঠি! গান্ধী যখন যাত্রা করেন চল্লিশ কোটি তাঁহার অনুসরণ করে, চল্লিশ কোটির ভিড় দুই শত কোটিতে পরিণত হয়, তখনও তাঁর পথপ্রদর্শক ওই লাঠি।

কল্পনা করিতে ভাল লাগে মুসা যখন বন্দী য়িহুদিদের লইয়া Promised Land-এর অভিযাত্রা করিয়াছিলেন তখন তাঁহার হাতে ছিল এমনি একখানা লাঠি। আবার যেদিন বিহারের আম্রবনের ছায়া দিয়া বারাণসীর পথে চলিয়াছিলেন শ্রমণ গৌতম সেদিনও তাঁর হাতে ছিল এইরকম একখানা লাঠি। মধ্যযুগের ভ্রাম্যমাণ সাধকেরা লাঠি ছাড়া কখনো চলিতেন না। মনুষ্যকুলের মতো উদ্ভিদজগতেও যদি জন্মান্তর গ্রহণের রীতি থাকে তবে এই সব লাঠি একই বংশকুলে জন্মানো কি খুবই অসম্ভব! শুধু তা-ই নয়, গান্ধীর হাতের এই লাঠি জগতের সমস্ত লাঠির হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। ইতিহাসের অনন্ত হিংসার পরিত্রাণ আছে ওই পূত পবিত্র হাতের স্পর্শে। তারপরে একদিন যখন এই যষ্টির বিশ্রামের দিন আসিবে

পৃথিবীর হিংসাতুর জনগণ এই লাঠির টুকরাগুলিকে যীশুর ক্রুশকাষ্ঠের মতো সযত্নে, সাগ্রহে, দেশবিদেশে লইয়া গিয়া, স্তূপ রচনা করিয়া চিরকাল ধরিয়া রক্ষা করিবে। এই স্তূপের মূলে সন্ধ্যাবেলায় ভক্তদের আর্তকণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতে থাকিবে—"রঘুপতি রাঘব রাজারাম।" সেদিন না আসুক।

পণ্ডিত জওহরলাল

পণ্ডিত জওহরলাল ভারতীয় রাজনীতির প্রিন্স হ্যামলেট। বাস্তব জগৎ ও পুস্তক-জগৎ খুঁজিয়া আর কোথাও ইঁহার দোসর মিলিল না। শেক্সপীয়রের কল্পনা আজ রূপগ্রহ করিয়া ভারত রাজনীতির সার্বভৌমক্ষেত্রে অভিনব চারণের মতো পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছে—সে ব্যক্তিটি পণ্ডিত জওহরলাল।

পণ্ডিতজীর ছবি আজ কে না দেখিয়াছে? পঞ্চাশোত্তীর্ণ শরীর এখনো সতেজ সবল যেন নমনীয় ইস্পাতে গড়া, ইংরাজের কয়েদ তাঁহার উপরে কোন চিহ্ন রাখিতে পারে নাই। পরণে শাদা খদ্দরের থান; খদ্দরের শাদা পাঞ্জাবীর উপরে স্বনামে প্রসিদ্ধ হাত-কাটা জামা; মাথায় শাদা গান্ধীটুপির নীচে চুলগুলিতে এখন পাক ধরিয়াছে; মুখে দীপ্তবুদ্ধির একটি শুভ্রতা! সেই কোণ-বহুল মুখমণ্ডল কার না পরিচিত? সারাদেহে তাঁহার বালকের চঞ্চলতা। আর সকলে যখন হাঁটিয়া চলে, জওহরলাল তখন ছুটিয়া চলেন; এরোপ্লেন তাঁহার যথার্থ বাহন; নিজের পঞ্চাশ বছর বয়সটাকে কোনরকমে পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হওয়াই যেন তাঁহার উদ্দেশ্য। পাহাড়ে শহর চুংকিং-এর অগণিত সিঁড়ি বালকের আগ্রহে লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিয়া গিয়া, নিজের ক্লান্তিতে নিজেই বিস্মিত হন, হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়—বয়স পঞ্চাশ হইল। বয়সের অর্দ্ধশতাব্দী পার হইল কিন্তু স্বাধীনতার অর্দ্ধ পথও কি অতিক্রান্ত হইয়াছে? সেইজন্যই কি তাঁর বিষাদ?

কারণ যা-ই হোক, জওহরলালের মনে কোথাও একটা বিষাদ আছে। চঞ্চল দৃষ্টিতে সেই প্রশান্ত বিষাদ ঘনীভূত। নদী উচ্ছল এবং চঞ্চল, আকাশের অলক্ষ্য মেঘ তাহার উপরে বিষাদের কালো আভা টানিয়া দিয়াছে। প্রিন্স হ্যামলেটের চোখে এইরকম একটা বিষাদ ছিল। তাহার মাতা, বন্ধু পরিজনবর্গ কতই না চেষ্টা করিয়াছে ওই কালো পর্দাখানা খুলিয়া ফেলিতে। পারিয়াছে কি? কেহই হ্যামলেটের স্বরূপ জানিতে পারে নাই। আমরাও কি জওহরলালজীকে জানিতে

পারিয়াছি? মনে তো হয় না। জওহরলাল রাজনীতিককে জানি, জওহরলাল দেশ-প্রেমিককে জানি, তাঁহার মধ্যেকার লেখককে জানি, বক্তাকে জানি, লক্ষ লোকের জনতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখা জাদুকরকে জানি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের উত্তপ্ত 'লু' হাওয়ার চলমান ঘূর্ণির মতো গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অগ্নিবর্ষী জওহর-লালকে জানি, কিন্তু আসল মানুষটিকে কি জানিতে পারিয়াছি? ওই কালো পর্দাখানার আড়ালে কি সে প্রচ্ছন্ন নয়? তিনি নিজেও কি জানিতে পারিয়াছেন? হঠাৎ এক একবার কালো পর্দাখানা নিমেষের জন্য উড়িয়া যায়—অমনি তাঁহার গুপ্ত ব্যক্তিত্বের এক আধ ঝলক বাহির হইয়া পড়ে।

চুংকিং-শহরের সোপানশ্রেণী আরোহণ করিয়া এই চির বালকের মনে পড়িয়া যায়, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে মত ও পথ লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া সূক্ষ্ম তর্ক চালাইয়া, পরাস্ত না হইয়াও আত্মসমর্পণ করেন। একটি প্রাণীরও হত্যায় যাঁর আপত্তি তিনি অনায়াসে চোরাবাজারীদের ফাঁসি কাষ্ঠে পাঠাইবার পরামর্শ দেন। জেলে বসিয়া বই লেখেন, বাহিরে আসিয়া কাজ, সে কাজ আবার জেলে যাইবারই ভূমিকা! তাঁহার সত্তায় কোথায় যেন একটা দ্বিধা আছে। সেই দ্বিধার দুই পারে দুই ব্যক্তি। দুইজনে কিছুতেই হাত মিলাইতে পাবিতেছে না—কেবল আকুলি-বিকুলি! হ্যামলেট নয় তো কি?

জওহরলালের সত্তায় এই দ্বিধা কিসের? শিক্ষায় আর সংস্কারে? মতে আর পথে? সাহিত্যে আর রাজনীতিতে? কিংবা শিল্পীতে আর কর্মীতে? শান্তির সময়ে যিনি আন্তর্জাতিক, সংগ্রামের দিনে তিনিই প্রচণ্ডতম জাতীয়তাবাদী। দেশের লোকে সব সময়ে তাঁর আন্তর্জাতিকতা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করে না, আবার বিদেশীরা তাঁর জাতীয়তাবাদে রাগিয়া ওঠে। তাঁহার অস্তিত্বের এপার ওপার পরস্পরের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। ভারতবর্ষে পণ্ডিতজীর চেয়ে মহত্তর ব্যক্তি অনেক জন্মিয়াছেন—কিন্তু এমন বিচিত্রতম ব্যক্তিত্ব আর দেখা যায় নাই। গান্ধী-চরিত্র লইয়া ভাবীকাল অনেক মহাকাব্য লিখিবে আর জওহর-চরিত্র হইবে নাটকের উপজীব্য। এই চরিত্রে নাটকীয় দ্বন্দ্ব আছে, চরিত্রের এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের দ্বন্দ্ব। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে জওহরলালের প্রকৃত জীবনী কখনো লিখিত' হইবে না; একজনের কলমের আঁচড় দেখিতে দেখিতে অপর জনের কলমের আঁচড়ে দুর্বোধ্য হইয়া ওঠে। এই ব্যক্তিটির 'বস্‌ওয়েল' সম্ভব নয়।

কর্মীর পোষাকের নির্বাসিত শিল্পী, রাজনীতির আসরের সাহিত্যিক, শেক্সপীয়র'

বিহীন হ্যামলেট এই জওহরলাল। গণরাজের দরবারের এই অভিজাত! বিদেশী বীণাপাণির আশিঃপূত স্বদেশের এই চাঁদ-কবি। কর্মপ্রবাহের জনকল্লোলের তীরে বসিয়া উদাসীন এই দার্শনিক। প্রচণ্ড উৎসাহের কেশরপুঞ্জ-আকর্ষী শিল্পের এই সন্ন্যাসী। জওহর-চরিত্র বিষমের সমন্বয়। তাঁহার চোখের প্রশান্ত বিষাদের কালো যবনিকা ঘুচাইয়া কেহ তাঁহাকে কখনো জানিতে পারিবে না। আর জানিতে পারিবে না বলিয়াই তাঁহার বিষয়ে কৌতূহলেরও কখনো শেষ হইবে না।

স্বর্গীয় প্রভাত মুখুজ্জে

পাঠক, আমার প্রিয় গ্রন্থকার স্বর্গীয় প্রভাত মুখুজ্জে। তোমারও নিশ্চয় একজন প্রিয় গ্রন্থকার আছেন। কে? হয়তো শরৎচন্দ্র কিম্বা পরশুরাম, কিম্বা আরও নবীন কেহ হওয়া বিস্ময়ের নয়। না, রবীন্দ্রনাথ নন। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ-ভাবে কাহারো প্রিয় হওয়া সম্ভব নয়, তিনি সকলের। রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস যেন ভারত মানসচিত্রের সিন্ধু ও গঙ্গা, সকলের আয়ত্ত হইয়াও বিশেষের অনায়ত্ত। বিশেষ করিয়া আমার এ কথা তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। ব্যাস, বাল্মীকি আরও বিরাট্, আরও সর্বমানবিক। তাঁহারা মহাসমুদ্রের মতো। ভারতবর্ষকে তাহারা বেষ্টন করিয়া আছেন—কিন্তু কেমন যেন মানবসম্বন্ধের বাহিরে। সেই সমুদ্রে তীর্থস্নান করা চলে, দূরে দাঁড়াইয়া শোভাসন্দর্শন করা চলে, দুঃসাহসী হইলে নৌ-যাত্রাও অসম্ভব নয়, সেই সমুদ্রের কোলে যে-সব রত্নসম্ভাবী দ্বীপ আছে, তাহাতে পৌঁছিতে পারিলে সপ্তডিঙা মধুকর ঐশ্বর্য্যের ভারে অবনমিত হইতে পারে—কিন্তু তাঁহারা বাড়ীর পুকুরটি নন। রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস আমাদের জীবনপ্রবাহ, তাঁহারা না থাকিলে এ মানসক্ষেত্র কি শ্যামল হইত, উর্বর হইত, এমন স্নিগ্ধ শোভাময় হইত! কিন্তু তবু তাঁহারা বিশেষের সম্বন্ধের অতীত।

ব্যক্তিগত গ্রন্থকার আরও নিম্নতর পর্য্যায়ের লোক। তাঁহারা যেন গ্রামের পাশের ছোট নদীটি। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে প্রচ্ছন্ন যোগ তাহাদের নিশ্চয় আছে—মহাসমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার টান সেখানে আসিয়া না পৌঁছিলেও মহাসমুদ্রের অভিযাত্রীই তাহারা। গ্রামের ছোট নদীটি মানব-সম্বন্ধের দ্বারা, বিশেষের বেষ্টনী দ্বারা কেমন যেন ব্যক্তিগত। এ বড় সামান্য শক্তি নয়। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছাড়াও বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, মহাসমুদ্র তো আমাদের অধিকাংশের কাছেই

দূরশ্রুত কিম্বদন্তী মাত্র। কিন্তু গ্রামের নদীটি ছাড়া নিজেদের অস্তিত্ব যেন কল্পনাই করিতে পারি না। সে নদী আমার পানের, স্নানের, অবগাহনের, নৌ-বিহারের এবং সন্ধ্যাযাপনের সঙ্গী, সে যেন আমারি খানিকটা। প্রভাত মুখুজ্জে আমার মনের সেই ছোট্ট নদী।

প্রভাত মুখুজ্জের ছোট গল্পগুলি পড়িয়াছ? আর একবার পড়িও। তাঁহার উপন্যাসগুলিও ছোট গল্পের মালা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ, এক একটি ছোট গল্প। তাঁহার গল্পগুলি যেন রোমান্সের উজ্জ্বল বুদ্বুদ। লেখকের নিঃশ্বাসে বিস্ফারিত হইতে হইতে, ইন্দ্রধনু বুনিতে বুনিতে উচ্চতর আকাশে যাত্রা করে—যখন তাহাকে নূতন জ্যোতিষ্ক বলিয়া ভ্রম হইতে থাকে—ঠিক সেই সময়ে কৌতুকপরায়ণ লেখক ছোট্ট একটি আঘাত করিয়া বাষ্প গোলকটি ভাঙিয়া দেন—ইন্দ্রজালের চাতুরী কোথায় অপসারিত হয়, হাতে থাকে শুধু এক বিন্দু জল। পাঠকের মুখে যখন বিস্ময়ের বিক্ষোভ, লেখকের মুখে তখন চঞ্চল কৌতুক, তাঁহার স্নিগ্ধ বিদ্রূপোজ্জ্বল চোখ যেন বলিতে থাকে—কেমন হইল তো? দেখিলে তো তোমার রোমান্সের পরিণাম কি? জীবনটা রোমান্স নয়, রোমান্সের সমাধি। বাঙালীর জীবনকে লইয়া এমন সকরুণ বিদ্রূপ আর কোন লেখক করিয়াছেন কি? তাঁহার 'নিষিদ্ধফল' বাঙালী জীবনের রোমিও-জুলিয়েট লীলার উল্টা-রথ। কুণো সংসার হইতে সে রথ রোমান্সের দিকে যাত্রা করিয়া আবার সেই গৃহাশ্রয়ে ফিরিয়া আসে। বাঙালী-জীবনের কর্ণ দুটি মৃদু অঙ্গুলিতে স্পর্শ করিয়া এমন পরিহাস আর কে করিয়াছেন? একেবারে কেহ করেন নাই—এমন বলিতে পারি না। প্রভাত মুখুজ্জের জুড়ি আছেন স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখুজ্জে। বাঙালী পাঠক বোধ করি তাঁহার নামটাও ভুলিয়া গিয়াছে। তিনিই না বলিয়াছেন মানুষ মরিলে ভূত, ভূত মরিয়া 'মার্বেল' হয়। তাঁহার গল্পেই না পড়িয়াছি যে, এক শবসাধক বীরকে কোন বিভীষিকা যখন ভীত বিচলিত করিতে পারিল না, তখন দেবী থিয়েটারের এক বীরকে পাঠাইয়া দিলেন। সে আসিয়া যাত্রাদলের অভিমন্যুর ভঙ্গীতে এবং গর্জনে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া বক্তৃতা সুরু করিতেই সেই শবসাধক অবিচলিত-হৃদয় পুরুষ আর ভয় সংবরণ করিতে পারিল না। সে এক লাফে শবাসন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল—আর পাগল হইয়া গেল। বাঙালীর থিয়েটারকে লইয়া এমন পরিহাস আর তো কোথাও দেখি নাই। প্রভাত মুখুজ্জে আর ত্রৈলোক্য মুখুজ্জেতে কোথায় যেন একটা মিল আছে।

প্রভাত মুখুজ্জেকে প্রথম দর্শনের কথাই আজ বলিব। গ্রামে থাকিতেই তাঁহার গল্প পড়িয়াছিলাম। পরে যখন কলিকাতায় আসিলাম, তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিবার বাসনা হইল। এ বাসনা স্বাভাবিক—পাঠক, তুমি বাল্যকালে কলিকাতায় আসিয়া জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, মনুমেণ্ট প্রভৃতি কি দেখিয়া লও নাই ? কলিকাতায় আমাদের গ্রামের একটি ছেলে থাকিত—সে আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। তাহাকে মনের কথা জানাইলাম। সে বলিল—বিলক্ষণ তাঁহাকে তো রোজ দেখিয়া থাকি। তাহার কথা অবিশ্বাস করি কি প্রকারে। কলিকাতার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সে ওয়াকিবহাল। তাহার কাছেই তো প্রথমে শিখিয়াছিলাম—ট্রাম হইতে উল্টা দিকে মুখ করিয়া নামিতে নাই। 'বাস' থামাইবার জন্য 'জানানা' বলিয়া চীৎকার করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। কলেজে 'প্রক্সি' দিয়া সরিয়া পড়িবার বিদ্যাও তাহারি কাছে শিক্ষা। কাজেই সে যে প্রভাত মুখুজ্জেকে দেখাইয়া দিবে, তাহাতে কি বৈচিত্র্য থাকিতে পারে ?

একদিন বিকালে সে আমাকে হেদোর ধারে লইয়া গিয়া দূর হইতে বেঞ্চিতে উপবিষ্ট এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখাইয়া দিয়া বলিল—ওই যে প্রভাতবাবু! আমি দেখিলাম কালো, স্থূলকায়, শার্ট-পরিহিত, ছড়ি-হাতে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি। ইনিই তাহা হইলে প্রভাত মুখুজ্জে ; যোড়শী, দেশী ও বিলাতীর লেখক! আহা আমার গ্রাম্য নয়নদ্বয় ধন্য হইল। তারপরে আমি প্রায়ই একাকী গিয়া দূর হইতে আমার ধ্যানের গ্রন্থকারকে দেখিয়া আসিতাম। আমাদের গ্রামের আর একটি যুবক কলিকাতায় থাকিত। তাহার একটি হাতক্যামেরা ছিল—তাহাকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া, অনেক চা-বিস্কুট পান করাইয়া, কাকুতি-মিনতি করিয়া প্রভাত মুখুজ্জের একখানা ছবি তুলিয়া দিতে সম্মত করিলাম। সে দূর হইতে বেঞ্চাসীন প্রভাতবাবুর একখানা ছবি তুলিয়া দিল। আমি ছবিখানা বাঁধাইয়া আমার ঘরে টাঙাইয়া রাখিলাম। ইহার কয়েকদিন পরেই একদিন সংবাদপত্রে পড়িলাম—প্রভাতবাবুর অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে। বলা বাহুল্য মনে বড় আঘাত পাইলাম। গ্রন্থকারগণও যে মরে তাহা যেন নূতন করিয়া জানিলাম। ছবিখানির দিকে তাকাইয়া সান্ত্বনা পাইতাম—তা ছাড়া তাঁহার গ্রন্থাবলী তো ছিলই। তারপরে বহুকাল হেদো তে যাই নাই—যাইবার প্রয়োজন আর ছিল না। কয়েক মাস পরে একদিন বিকালবেলা একটা কাজের উপলক্ষ্যে হেদোর বাগান অতিক্রম করিয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। ওই বেঞ্চিখানায় তিনি বসিতেন। কিন্তু

এ কি! তিনিই তো বসিয়াই আছেন? কি আশ্চর্য্য! এ যে প্রভাত মুখুজ্জে। সেই ছড়ি, সেই জামা, সেই গায়ের রঙ! চক্ষু রগড়াইয়া দেখিলাম—হাঁ, ঠিক সেই ব্যক্তিই—যাঁহার ছবি আমার ঘরে টাঙানো! কাজ পড়িয়া রহিল—বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ছবিখানাকে ফ্রেম ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। আর তাঁহার শতবার পঠিত গ্রন্থাবলী লইয়া আর একবার পড়িতে বসিলাম। মনে হইল, কৌতুকপরায়ণ গ্রন্থকারের এ-ও যেন একটা কৌতুক। মনে হইল পুস্তকের কালো অক্ষরগুলি হইতে একটা চাপা বিদ্রূপের কিরণচ্ছটা বিকীরিত হইতেছে। মনে হইল বইয়ের পাতাগুলি খস খস শব্দে বলিতেছে—'কেমন হইল তো! হিরো-ওয়ার্শিপের পরিণাম দেখিলে তো!' এই অভিজ্ঞতার ফলে প্রভাত মুখুজ্জেকে সশরীরে না দেখিয়াও যেন পরিহাসের আভায় উজ্জ্বলতররূপে দেখিয়া লইলাম। মানুষের প্রিয় গ্রন্থকার কি কখনও মরিতে পারে? 'রসময়ীর রসিকতা' করিবার জন্য তাঁহারা বাঁচিয়াই থাকেন।

ক্লাসিকস্

প্র-না-বি-র সূর্য্যমুখী বাড়িতে সকালবেলা উপস্থিত হইয়া দেখি তিনি ঘরে নাই। ভৃত্য বলিল, বাবু বাগানের মধ্যে। কিছু দূর অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাইলাম যে, একটি মহুয়া গাছের তলায় ঘাসের উপরে একদল যুবক পরিবেষ্টিত হইয়া প্র-না-বি আসীন। এই যুবকদল নিশ্চয় আমার মতোই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহুদূর হইতে আসিয়াছে। কিন্তু আমারও তো দেখা করা চাই। কলিকাতার প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ প্র-না-বি-র মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহা জানিবার জন্যই আমার এতদূর আসা।

আমি নিকটে গিয়া একান্তে বসিলাম, পিছন ফিরিয়া ছিলেন বলিয়া প্র-না-বি আমাকে দেখিতে পাইলেন না, যুবকেরাও কেহ প্রশ্ন করিল না। আমার আগমন কোনরূপ আন্দোলন সৃষ্টি করিল না, ফলে অনায়াসে আমি তাহাদের আলাপের স্রোত অনুসরণ করিতে সমর্থ হইলাম।

প্র-না-বি বলিয়া যাইতেছেন—আপনারা সকলেই যুদ্ধ প্রচেষ্টা থেকে সবেমাত্র মুক্তি পেয়েছেন। এখন পুরাতন পরিবেশে ফিরে এসে কি দেখতে পাচ্ছেন? পুরাতন যেন নূতন বেশ পরিগ্রহ করেছে—তাই নয়? জরতী যেন উমারূপে

আবির্ভূত হ'য়েছেন। এখন এই নূতনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন আপনাদের প্রধান সমস্যা। এবারকার বোমাবর্ষী যুদ্ধের ফলে কেবল যে পুরাতন ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছে তা নয়, মানুষের মনের অনেক সংস্কার—তার কতক জীর্ণ, কতক নবীন, কতক মন্দ, কতক ভালো, ভেঙে পড়ে অবলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। এখন আমাদের প্রথম সমস্যা হচ্ছে মানুষের বাসভূমি থেকে সেই অনাবশ্যক স্তূপের অপসারণ আর প্রধান সমস্যা হচ্ছে সেখানে নূতন আবাসিক হর্ম্যের গঠন।

একটি যুবক বলিল—আপনি আমাদের মনেব ভাব ঠিক বুঝেছেন। কিন্তু তার উপায় কি? আর আমাদের দ্বারা তা কতখানি সম্ভব তাও জানিনে। আমরা সকলে যুদ্ধকালে একই শ্রেণীভুক্ত ছিলাম। তখন আমরা স্থির করেছিলাম যদি বেঁচে ফিরতে পারি, তা হলে অন্য কাজে যোগ দেবার আগে কিছুদিন বিশ্রাম করবো। তখন আমাদের প্রধান কাজ হবে একত্রে কবিতাপাঠ। এখন আমাদের এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে আপনার বক্তব্যের কতখানি মিল, কি ভাবে মিল তা ঠিক অনুধাবন করতে পারছিনে। লোকের কাছে যদি বলি যে আমরা লোকালয় থেকে দূরে অবস্থান ক'রে কিছুকাল কবিতাপাঠ ক'রে সময় কাটাবার সিদ্ধান্ত কবেছি, তবে আশঙ্কা হচ্ছে সবাই বলবে আমবা পলায়নী-মনোবৃত্তিশীল, সবাই আমাদের 'ডিকামেরনের' নায়ক বলে উপহাস করবে।

প্র-না-বি বলিলেন—তা মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু এই উপহাসে আপনাদের শঙ্কিত হওয়া উচিত নয়, যেহেতু যুদ্ধক্ষেত্রের জীবন আশঙ্কায় আপনারা অভ্যস্ত। আব পলায়নী-মনোবৃত্তির কথাই যদি উঠল তবে বলি কোন শ্রেণীর কাব্য আপনারা পাঠ কববেন তারই উপরে সব নির্ভর করছে। যদি আপনারা ফ্যাশানের কবিতা, সর্বদেশের আধুনিক কবিতা পাঠ করেন—তবে আমিই সর্বাগ্রে আপনাদের কাপুরুষ বলবো, কারণ ওই সব কবিতা জগৎ-ভয়লোচনের দিকে তাকাতে ভয় পেয়ে নিজের নিজের গৃহে আবদ্ধ থেকে স্বকপোলকল্পিত জগতের কথা লিখে গিয়েছে।

আধুনিক কবিতার প্রধান ত্রুটি তা হচ্ছে গিয়ে খণ্ড সত্তার সৃষ্টি। বুদ্ধি, ভাবাবেগ, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির বিচিত্র সমবায় নিয়ে যে মানবজীবন গঠিত, আধুনিক কবিরা সে খোঁজ রাখে না। তাদের কবিতার মূল প্রেরণা বুদ্ধির ধাক্কা। ও এক রকম বুদ্ধির কসরৎ ও একপ্রকারের বীজগণিত। মহাকবিদের জীবনধারণা এত গুরুভার যে, কেবল বুদ্ধি তাকে ধারণ ক'রে রাখতে অসমর্থ। ঐতিহাসিক নানা

কার্য্যকারণের ফলে মানুষ আজ খণ্ডিতসত্তা—আধুনিক শিল্প, সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত সবই সেই খণ্ডিত জীবনের প্রতীক। এই খণ্ডিত জীবনের চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে বিজ্ঞানের মধ্যে। বর্তমান বিজ্ঞান আর শিল্প সহোদর। তারা আমাদের মাথাকে নাড়া দেয়, আত্মাকে জাগ্রত করে না। কাজেই এই কবিতা রচনা আর এই কবিতা পাঠ এক রকমের পলায়ন। মানুষের অখণ্ড সত্তা থেকে খণ্ড সত্তার মধ্যে পলায়ন। দুর্গ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হ'লে দুর্গবাসী সৈন্যদল যেমন তার অধিকৃত অংশ পরিত্যাগ ক'রে এসে অনধিকৃত অংশে আশ্রয় গ্রহণ করে—অনেকটা তেমনি।

তখন আর একটি যুবক প্রশ্ন করিল—তা হলে মানুষের পূর্ণ সত্তা কোন্ শ্রেণীর কাব্যে আছে?

প্র-না-বি বলিলেন—সাহিত্যের ধ্রুবপদ অংশে, যাকে বলা হয়ে থাকে ক্লাসিকস্। আমাদের দেশে আছে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, তুলসীদাস। ওদের দেশে ক্লাসিকসের অভাব নেই। গ্রীক নাট্যকার থেকে আরম্ভ ক'রে গ্যেটে পর্য্যন্ত কত নাম করবো। ইতিহাসের স্রোতের অনেক হাজার বৎসর ভাঁটিতে জন্মেছি—তাতে অসুবিধা অনেক, কিন্তু মস্ত সুবিধা এই যে, আগ্রহশীল পাঠকের জন্য প্রথম শ্রেণীর ক্লাসিকস্ স্তূপীকৃত হ'য়ে আছে। এমন অনাবিল ঐশ্বর্য্য ছেড়ে ইলিয়ট, স্পেণ্ডার পড়ে যারা জীবন কাটায়, তারা নিতান্তই কৃপার পাত্র।

—কিন্তু ব্যাস বাল্মীকি কি সেকেলে নন?

এবারে প্র-না-বি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সেকেলে? আধুনিক কবিরা কি একেলে নয়? না, মহাকবিদের কাব্য সর্বকেলে। এই যে যুদ্ধটা হয়ে গেল তার সবচেয়ে নিখুঁত বর্ণনা আছে ব্যাসদেবের মহাভারতে! গীতার চেয়ে মহত্তর war correspondence আর কি লিখিত হয়েছে? সঞ্জয়ের চেয়ে বড় war correspondent আর কে? তাঁর লিখিত যুদ্ধসংবাদ আজ চার হাজার বৎসর পরেও পঠিত হচ্ছে, এখনকার Golder, Paul Wintertonএর যুদ্ধ বর্ণনায় ইতিমধ্যেই কি অর্দ্ধ-বিস্মৃতির আবছায়া আভাস পড়েনি?

একজন যুবক বলিল—তবে কি আপনি বলতে চান যে, মহাকবিরা ত্রিকালজ্ঞ।

প্র-না-বি বলিলেন—চাই এবং চাই না। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বেশী করে বলতে চাই তা হচ্ছে কাল তিনটে নয় একটা মাত্র। সময়ের স্রোতকে আমরা

নদীর স্রোত বলে থাকি। গঙ্গা নদী তিনটে না একটা? ফুলের লতা যেমন কঞ্চির বেড়া বেয়ে ওঠে, মানুষের অভিজ্ঞতা তেমনি কালকে অবলম্বন ক'রে রয়েছে। এখন এই কাল নদীর স্রোতের মতো একটানা লম্বা পদার্থ নয়। ও জিনিসটা ঘুরে ঘুরে উঠেছে—প্যাঁচানো লোহার সিঁড়ির মতো বা মশা-মারা চীনের আবর্তক ধূপের মতো। কাল চক্রাকারে থাকে থাকে উঠে গিয়েছে। সবগুলি চক্রই একই ছাঁচে বা Pattern-এ গঠিত অথচ ঠিক পুরাতনের পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়, সহোদর ভাইদের মধ্যে যেমন প্রচ্ছন্ন ঐক্য থাকে—তবু তারা স্বতন্ত্র।

এখন মহাকবিরা কালের একটা চক্রকে অবলম্বন ক'রে কাব্য রচনা করেন, কিন্তু কালচক্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন মিল থাকবার জন্যে সর্বকালের কথা আপনি ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে তাঁদের কাব্যে। সেইজন্যই হোমারে এবং বাল্মীকিতে, শেক্সপীয়রে এবং কালিদাসে আজও মানুষ তার মনের খোরাক পাচ্ছে। মহাকবি ও নিম্ন-স্তরের কবিদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, তাঁরা একটা কালচক্রকে সমগ্রভাবে দেখতে পান আর শেষোক্ত দল তার একটা টুকরোর বেশী দেখতে পায় না। এই দৃষ্টির তারতম্যেই মহাকবি আর কবি। এই জন্যেই মহাকাব্য বা classics চিরকালের আভাস বহন করে। কাজেই মহাকাব্য পড়লে কেবল যে চিরকালের বাণী পাওয়া যায় মাত্র তা-ই নয়, প্রত্যেক শিক্ষিত লোকেরই Classics পড়া উচিত। ক্লাসিক্স্ ছাড়া শিক্ষা শুধু অসম্পূর্ণ থাকে না—মনুষ্যত্বও খণ্ডিত থেকে যায়। আপনাদের প্রতি আমার পরামর্শ এই যে আপনারা লোকালয় থেকে দূরে অবস্থান ক'রে লোকালয়ে পুনঃপ্রবেশের ভূমিকাস্বরূপ কিছুকাল ক্লাসিকস্ পাঠ করুন। এ পলায়নী-মনোবৃত্তি নয়—সংসারসংগ্রামে প্রবেশের শিক্ষা। সৈন্যদল যখন রণবিদ্যা শিক্ষার জন্য রণক্ষেত্র থেকে দূরে অবস্থান করে তখন তাদের কেউ কি ভীরু অপবাদ দেয়?

এই বলিয়া তিনি নিজের পকেট হইতে ইলিয়াডের একখানি ক্ষুদ্রায়ত সংস্করণ বাহির করিয়া বলিলেন—এই দেখুন ইলিয়াড। আমি লোকালয় থেকে দূরে থাকি বটে কিন্তু যখনি জনসমুদ্রের এই শঙ্খটিকে কানের কাছে স্থাপন করি—তখনই আমি শুনতে পাই জনসমুদ্রের কল্লোল। সমুদ্রকে দেখতে হলে তীরে গিয়ে বসা উচিত, সাঁওতাল পরগণার নির্জনতা আমার সেই তীরভূমি। যারা কলকাতায় আছে তারা কলকাতাকে দেখতে পাচ্ছে না—দেখছি আমি, আমার পাইলট বা নাবিক হোমার—আরও অনেকে আছেন ঘরের শেল্‌ফে সজ্জিত।

প্র-না-বি বলিয়া চলিলেন। প্রসন্ন আকাশ হইতে শরতের রোদ সোনা ঢালিয়া দিতে লাগিল। 'প্রত্যক্ষ সজ্ঘর্ষের' কথা ভুলিয়াই গেলাম। কেন জানি না—স্বর্গ হইতে মর্ত্যে প্রত্যাবর্তনের সময়কার দুষ্যন্তের সেই কথাটি কেবলি বারংবার মনে পড়িতে লাগিল—'অহো উদাররমণীয়া পৃথিবী।' তবে কি পৃথিবী স্বর্গের অপেক্ষাও রমণীয়া।

হোমার-দর্শন

চ্যাপম্যানের মাধ্যমে কীটসের হোমার-দর্শনের সেই সনেটটি আমাকে চিরকাল আকর্ষণ করে—কবিতাটির সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ। কিন্তু তার সত্য তখনি বুঝিতে পারিলাম যখন কীট্‌সের মতো অনুবাদের মাধ্যমে আমার হোমার-দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিল। আদিকবি হোমারের কথা অবশ্যই শুনিয়াছিলাম, তাঁহার বিস্তৃত বিচিত্র রাজ্যের সংবাদও অনবগত ছিলাম না। কিন্তু শোনা এক আর দর্শন আর এক বস্তু। ড্যারিয়েনের গিরিশৃঙ্গ হইতে অপূর্বদর্শন প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্ময়ের চমক কর্টেজের বিস্ফারিত দৃষ্টিকে নিষ্পলক করিয়া দিল। ছবিটি কি সুন্দর! কর্টেজের হাতের বন্দুক স্খলিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। বিলম্বিত বাহুদ্বয় কঠিন ও অসাড়। অধরোষ্ঠ ঈষন্মুক্ত, নেত্র নিষ্পলক—কর্টেজ প্রশান্ত মহাসমুদ্রের অভাবিত মহিমায় অভিভূত। Stout বিশেষণটির বিশেষ অর্থ কি? বলশালী না কঠিনহৃদয়? বাচ্যার্থ বলিষ্ঠ হইলেও কঠিনহৃদয়ের ব্যঞ্জনা আছে। কর্টেজের মতো নরঘাতী দস্যুর সাধারণতঃ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু এ এমন একটা অসাধারণ ব্যাপার যে তাহার সৌন্দর্য্য-বিমুখ কঠিন হৃদয়ও যেন বিগলিত হইয়া গেল। রত্নাকরকেও এই একই অর্থে stout বলা যাইতে পারিত। কিন্তু কেবল সৌন্দর্য্য বলিলে কর্টেজের stoutness-এর প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখানো হয় না। প্রশান্ত মহাসাগরের সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রচণ্ড একটা আঘাত ছিল—বিস্ময়ের আঘাত। এই বিস্ময় প্রকৃতিহস্ত নিক্ষিপ্ত হাতুড়ির মতো অতর্কিতে কর্টেজের stout হৃদয়ের উপরে আসিয়া প্রচণ্ড আঘাত করিল। সৌন্দর্য্যমিশ্র বিস্ময়—সোনার এনামেল করা লোহার হাতুড়ি। তাহার সঙ্গীরা নীরব বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে মূঢ়ের মতো তাকাইতে লাগিল—কিন্তু দলপতি কর্টেজ নিস্পন্দ, নির্বাক—সংজ্ঞা-বিরহিত।

সমস্ত মহৎ সৌন্দর্য্যের মধ্যেই আঘাত নিহিত। মুগ্ধ সৌন্দর্য্য মানুষকে চঞ্চল করে—তাহাতে আঘাত নাই; মহৎ সৌন্দর্য্য মানুষকে নিস্তব্ধ করিয়া দেয়—সৌন্দর্য্যাহতের নড়িবার শক্তি থাকে না। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র চঞ্চল হইয়া ওঠে—সূর্য্যোদয়ে তাহার নড়িবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পায়।

প্রথম হোমার-দর্শনের বিস্ময় কত পুরুষ ধরিয়া না মানব-সমাজকে অভিভূত করিয়া দিতেছে। কর্টেজের দুইদিকে বিস্মিতের সারির আর অন্ত নাই—তিন হাজার বৎসর দীর্ঘ এই সারি। তারি মাঝে একস্থানে কীট্‌স আছেন—তাঁরও অনেক পরে আমি আছি—আশা করি, পাঠক, আমার কাছাকাছি কোন এক স্থানে তুমিও আছো। আর যদি না থাকো—তবে অবিলম্বে এই দলে যোগ দিয়ো।

হেলেন চিরকাল মানুষকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে! কি কুক্ষণেই না ট্রয়ের রাজপুত্র তাহাকে দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তারপরে তাহাকে উদ্ধারের ও রক্ষার জন্য দুই সভ্য জাতি পরস্পরকে আঘাত করিয়া ধ্বংস হইয়া গেল। তখন হইতে হেলেন মানুষের সৌন্দর্য্য-স্পৃহার অনধিগম্য প্রতীক। যুগে যুগে মানুষের আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রতি উদ্বাহু হইয়া উঠিয়াছে। এই কি সেই মুখ যাহার জন্য সহস্র রণপোত যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিল? এই কি সেই মুখ—যাহার জন্য অভ্রবিলীন হর্ম্যচূড়া পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল? এই কি সেই মুখ চুম্বনসুধায় মানবহৃদয়কে যাহা অমর করিয়া দিতে পারে? ইলিয়াডের হেলেনের ইহাই স্বরূপ।

কিন্তু ওডীসি কাব্যে কবিগুরু আর একপ্রকার বিস্ময়ের ধাক্কা পাঠকের জন্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে-সৌন্দর্য্যের শিখায় ইলিয়াম নগর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে সেই হেলেনকে দেখিতে পাই—স্বামী মেনেলাসের গৃহে। পূর্বেতিহাস ও অপূর্বগৌরব বিস্মৃত হেলেন নিতান্ত সাধ্বী রমণীর মতো স্বামীর সঙ্গে আহারে নিযুক্ত, অতিথি টেলিমেকাসের দিকে সুনের বাটি অগ্রসর করিয়া দিতেছে—সংসারের অতি পরিচিত অতি পুরাতন সুখদুঃখের কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছে। দেখিয়া তখনই আর একবার পাঠকের মন বলিয়া ওঠে—এই কি সেই মুখ যাহার জন্য—ইত্যাদি, ইত্যাদি!

হেলেন অবশ্য পূর্ব কথা একেবারে ভোলে নাই—মাঝে মাঝে ট্রয়ের জীবনের খুঁটিনাটি বলিতেছে—কিন্তু তাহাতে কোন দ্বিধা সঙ্কোচ নাই। যেন তাহার জন্য

হাজার হাজার নিরপরাধ ধ্বংস হয় নাই—যেন তাহার নিষ্ঠাহীনতা ইতিমধ্যেই সংসারের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া ওঠে নাই? যেন—কেবল সে স্বামীর উপর রাগ করিয়া পাশের বাড়ীতে গিয়া একবেলার জন্যে লুকাইয়াছিল? এমন নীরন্ধ্র ক্ষমা কেমন করিয়া সম্ভব হইল? সীতার উত্তরচরিতে অভ্যস্ত ভারতীয় মনের কাছে—ইহা একটা দুর্বোধ্য প্রহেলিকা।

বরঞ্চ মেনেলাস ও হেলেনের দাম্পত্যজীবন দেখিয়া মনে হয় যে তাহার স্বামী যেন কিছু খুশিই হইয়াছে, পত্নী-গৌরবে সে যেন সত্যই গৌরবান্বিত। তাহার পত্নী যে রূপময়ী ছলাকলালাবণ্যময়ী তাহা কি প্রমাণ হইয়া যায় নাই? রূপ-হীনাকে হরণ করিতে যায় কে? তাহাকে উদ্ধার করিতে চায় কে? গ্রীক ও ট্রোজানগণ যতই শত্রু হোক—এক বিষয়ে তাহারা ঐক্যমত—হেলেন সুন্দরী। এই সার্টিফিকেটের গৌরবে মেনেলাস যেন গৌরবান্বিত। গ্রীকগণ আর সব ক্ষমা করিতে পারে—কেবল সৌন্দর্য্যহীনতাকে নয়। সৌন্দর্য্য যে কেবল একটা কায়িক সম্পদ্ নয়, মানসিক ও নৈতিক গুণ তাহা কি হোমারের সমকালীন গ্রীকগণ বুঝিতে পারিয়াছিল? সৌন্দর্য্যের মানসিক অর্থ খুব সম্ভব বুঝিয়াছিল—কিন্তু নৈতিক অর্থ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারে নাই—নতুবা হেলেনের' পরিণাম ভিন্ন রকম হইত।

কিন্তু কবিগুরু যে হেলেনকে একেবারে দণ্ডিত করেন নাই—এমন মনে করা চলে না। কেবল দণ্ড সম্বন্ধে হেলেন সচেতন নয়। তাহার পর্বগৌরব ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ওডীসিতে উল্লেখমাত্র নাই—সে নিতান্তই ঘরের বধূ। যে-ছিল সৌন্দর্য্যের দাবাগ্নিশিখা তাহাকে গৃহ প্রদীপে পরিণত করা কি এক-প্রকার শাস্তি প্রদান নয়? হোমার তাহাকে নৈতিক দণ্ড দেন নাই বটে—কিন্তু শৈল্পিক দণ্ড দিয়াছেন। এ যেন দেবী-চৌধুরাণীর পুকুর-ঘাটে বাসনমাজা। দেবী-চৌধুরাণীর পক্ষে ইহা দণ্ড নয়, কারণ সে নিষ্কামব্রতধারিণী। হেলেন আর যাই হোক নিষ্কামিনী নয়। ইলিয়াড কাব্যে সকলের লক্ষ্যের কেন্দ্রে হেলেন—ওডীসিতে সে কাহারো চোখেই পড়ে না, ইলিয়াডে ছিল সে একমাত্র—ওডীসিতে সে কেহই নয়। ইহাই কি তাহার দণ্ড নয়? নৈতিক দণ্ড দিবার অধিকার তাঁহার হয়তো ছিল না—কিন্তু শৈল্পিক দণ্ড দিতে তিনি কার্পণ্য করেন নাই। বাস্তবিক ওডীসি কাব্যে হেলেন কেহই নয়—ওডীসির নায়িকা পেনিলোপি। তাহার পাতিব্রত্য ওডীসির পটভূমি। গৃহচারিণী রাজপুত্রী নসিকা, সাধ্বী

পেনিলোপি—ইহারাই ওডীসির প্রধান নারীচরিত্র। গৃহধর্ম ওডীসির প্রাণ—যেমন বীরধর্ম ছিল ইলিয়াডে। ইলিয়াড ও ওডীসি পরস্পরের পরিপূরক। এই গৃহধর্মের প্রভাব ওডীসিতে এতই বেশি যে হেলেন পর্য্যন্ত গৃহচারিণী হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ববর্তী কাব্যের সঙ্গে ইহার এই প্রভেদের কারণ কি? ইলিয়াডের বীরত্ব-কাহিনীর শ্রোতারা কি ঘরের কথা শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল? ইলি-য়াডের যোদ্ধারা কি ঘরে ফিবিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল? আজ যখন এই প্রবন্ধ লিখিতেছি তখন বৃহত্তর যুদ্ধান্তে বিদেশী সৈনিকদের বাড়ী ফিরিবার ব্যস্ততা দেখিয়া ওডীসিয়ুসের ব্যাকুলতার আভাস পাইতেছি। একিলিসের শৌর্য্য আর তাহাদের ভালো লাগিতেছে না—পেনিলোপির নিষ্ঠার জন্যে সকলেই লালায়িত। আমাদের চোখের সম্মুখেই ইলিয়াড কাব্যের লীলা হইয়া গিয়া এখন ওডীসির পালা চলিতেছে। কেবল নূতন হোমার দেখা দিল না—তাই পুরাতন হোমার আব একবার পাঠ করিয়া লইলাম।

সূর্য্যোদয়ের কাব্য

ওডীসি সূর্য্যোদয়ের কাব্য। প্রাতঃসূর্য্য তাহার কিরণাঙ্গুলি সঞ্চালনে অন্ধকারের কালো মলাটখানা খুলিয়া যেমন আলোকের শুভ্র পত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, ওডীসি কাব্যের প্রত্যেক সর্গ তেমনি সূর্য্যোদয়ের দ্বারা উদ্ঘাটিত। সূর্য্যো-দয়ের সোনার চাবি ঘুরাইয়া এই কাব্যের প্রত্যেকটি সর্গ উন্মুক্ত। এত সূর্য্যোদয়ের বর্ণনা আর কোন কাব্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। নৈসর্গিক প্রভাতের শুচিশুভ্রতা, তরুণ সুকুমারভাব ইহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। সাধ্বী পেনি-লোপির শুভ্রপবিত্রতা এই সূর্য্যোদয়শুভ্রতারই একটি রূপান্তর। তাহার পাণি-প্রার্থীদের অসঙ্গত দাবী হইতে নিজের মনকে আগলাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ করিয়া সে তন্তুবয়ন কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। শুভ্র তন্তুজাল সমবায়ে যে অফুরন্ত বসনখণ্ড সে বুনিয়া তুলিতেছে—তাহাতেও প্রভাতের কিরণবসন বয়নের মহিমা যেন নিক্ষিপ্ত। তাহার বসনখণ্ড সূর্য্যোদয়ের কিরণবসনেরই যেন প্রতীক।

আবার রাজকুমারী সখীসহচারিণী নসিকা প্রাতঃকালে সমুদ্রতীরে বসিয়া মলিন বসন ধৌত করিতেছে তাহাতেও কি প্রকারান্তরে সূর্য্যোদয়ের লীলাই দৃষ্ট হইতেছে

না? সূর্য্য যেমন উদয়সিন্ধুর উপকূলে অন্ধকারের বসনকে ধৌতনির্মল করিয়া দিঙ্‌মণ্ডলে প্রসারিত করিয়া দেয়—নসিকাও কি ঠিক তাহাই করিতেছে না? পেনিলোপির একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যে এবং নসিকার পিতৃনিষ্ঠ শুচিতায় যে শুভ্রতা আছে—তাহার মিল ওই সূর্য্যোদয়ের শুভ্রতার সহিত।

আর নবোদিত সূর্য্যের তারুণ্য দেখিতে পাই তরুণ রাজকুমার টেলিমেকাসের জীবনে। তাহার পিতা ইথাকারাজ ওডীসিয়ুস এই কাব্যের নায়ক হইলেও সমগ্র কাব্যখানি রাজপুত্র টেলিমেকাসের তরুণ জীবনের ফ্রেমে আঁটা। তরুণ পুত্রের হাত ধরিয়াই যেন প্রবীণ পিতা এই কাব্যের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াছে। আবার প্রবীণ ওডীসিয়ুসের জীবন হইতেও সূর্য্যোদয়ের নবীন মহিমা যেন সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয় নাই। ইথাকারাজের নূতন ও অভাবিত দর্শনের বিরাট কৌতূহল, প্রবীণের বাহুতে নবীনের উদ্যম, বিপদের মুখে উপায় আবিষ্কার করিবার উৎসাহ, সমস্তই স্মরণ করাইয়া দেয়—তাহার হৃদয়ের মধ্যে চাপা-পড়া সূর্য্যোদয় মেঘ কাটিয়া যাইবার আশায় দিন-ক্ষণ গণিতেছে। বাস্তবিক—ওডীসি সূর্য্যোদয়ের কাব্য ছাড়া আর কি? ওডীসিয়ুসের ভ্রমণবৃত্তান্তকে উপলক্ষ্য করিয়া সূর্য্যের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণনাই কি হোমারের উদ্দেশ্য ছিল না? সূর্য্যদেবই কি অডীসিয়ুস নয়? যে সূর্য্য নিত্য নিয়ত 'মহাব্যোম নীল সিন্ধু প্রতিদিন পারাপার' করিতেছে সেই সূর্য্যই কি 'সুরানীল সিন্ধুর' উদ্‌ভ্রান্ত নাবিক ওডীসিয়ুস নয়? সমুদ্রপথে ওডীসিয়ুসকে যেমন সাইক্লপস, Scylla ও Charybdis প্রভৃতি বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে—আকাশের সূর্য্যকেও কি তেমনি ঝড়ঝঞ্ঝা, মেঘজাল ও রাহুর দ্বারা তেমনি আক্রান্ত হইতে হয় না? ইথাকারাজকে যেমন অন্ধকার মৃত্যুপুরে অবতরণ করিতে হইয়াছিল, দিনমণিকেও কি তেমনি প্রতিসন্ধ্যায় একবার করিয়া তমসা পরপারবর্ত্তী রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় না? চতুর্বিংশ সর্গে রচিত এই মহাকাব্যের একাদশ ও দ্বাদশ সর্গ দুইটি অন্ধকারের ঘন মসীময়—মৃত্যুপুর এবং Scylla ও Charybdisএর কাহিনী। সূর্য্যকে যদি অডীসিয়ুস কল্পনা করা যায়, নীল আকাশ যদি নীল ভূমধ্যসাগর হয়—সূর্য্যের উদয়াস্তের পথ যদি ওডীসিয়ুসের সিন্ধু পরিভ্রমণবর্ত্ম হয়—তবে তাহার ঠিক মধ্যখানে, মধ্যদিনে, একবারের জন্য আকাশ যেন ঘন মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। তারপরেই আবার সূর্য্যের জ্যোতির্ময় প্রকাশ। পূর্বাচলের যে ঘাটে কামনারূপিণী হেলেন সর্বনাশের আহ্বানে গ্রীক চমূকে আহ্বান করিয়াছিল ওডীসিয়ুসের যাত্রা সেই ঘাট

হইতে—তাহার লক্ষ্য পশ্চিম দিগন্তের সেই ইথাকার ঘাটে যেখানে বাসনা-বিজয়িনী প্রোষিত-ভর্তৃকা সাধ্বী পেনিলোপি অপেক্ষা করিয়া আছে। ওডীসি কি সূর্য্য-দেবেরই ওডীসি নয়? এই কাব্যের চব্বিশ সর্গ কি দিবারাত্রির চব্বিশ দণ্ড নয়? তারপরে যখন মনে পড়ে হোমার অন্ধ ছিলেন—সূর্য্যদেবের ওডীসি দেখিবার তাঁহার কিছুমাত্র আশা ছিল না, তখন এই ধারণা আরও দৃঢ় হইয়া ওঠে। যাহাকে চোখে দেখিবার আশা নাই—তাহাকেই মনে মনে দেখা। ওডীসি রোমান্টিক কবিতার আদি।

মধ্যযুগের ওডীসি দান্তের ডিভাইন কমেডি। ভার্জিল সনাথ দান্তে স্বর্গমর্ত্ত্য নরক পরিভ্রমণ করিয়াছেন এই কাব্যে। তাঁহার ভ্রমণপথের উপান্তে বিয়াত্রিচে কবির জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল—পেনিলোপির মতো সে পার্থিব সাধ্বী নয়—সে আধ্যাত্মিক সাধ্বী। কিন্তু তবু এই দুই কাব্যে কত প্রভেদ। ওডীসিতে যেমন সূর্য্যোদয় ও প্রভাত, ডিভাইন কমেডিতে তেমনি সূর্য্যাস্ত ও তারকিত অন্ধকার! ডিভাইন কমেডি অন্ধকারের কাব্য। ওডীসির সূর্য্যোদয় গেল কোথায়? গ্রীসের সে আদি যুগের সূর্য্যোদয়ের ক্ষণ গ্রীকসভ্যতার ধ্বংসস্তূপের তলে সমাহিত—ইতিমধ্যে ইউরোপের চিত্তে একটা ঘন রাত্রির মতো নামিয়া আসিয়াছে। সেই আধ্যাত্মিক রাত্রির মহাকাব্য ডিভাইন কমেডি, যেমন আধ্যাত্মিক সূর্য্যোদয়ের মহাকাব্য ওডীসি।

পুরাতন বই

পুরাতন পুস্তকের এমন একটি ব্যক্তিত্ব আছে যা নূতন বইয়ে নাই। অবশ্য হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিরও একটি ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু তাহা মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থাকার ধারণ করিবামাত্র সেই মৌলিক ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যায়—তখন সব পুস্তকই সমান। মুদ্রিত সব বই যে সমান, এমন কথা বলি না। রাজার ঘরের সদ্যোজাত সন্তান আর দরিদ্রের সদ্যোজাত সন্তানের মধ্যে ভবিষ্যতের একটি বিরাট প্রভেদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমানের প্রভেদ অতি নগণ্য। ব্যক্তিত্বলাভের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভেদটা ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। পুস্তক-রাজ্যেও এমনি একটা প্রক্রিয়ার ভেদ দেখা দিতে থাকে।

পুরাতন বইয়ের দোকানে যাও, দেখিতে পাইবে, আলমারির থাকে থাকে দীর্ঘকালের ব্যবহারলব্ধ ব্যক্তিত্বে-বিশিষ্ট পুস্তকগুলি সজ্জিত। ঈষৎ মলিন,

দাগপড়া, ছেঁড়া-ছাড়া পুস্তকের মলাটগুলি—ভিতরটাও অনুরূপ। উপমা দিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়—কাশীর দশাশ্বমেধের ক্রমনিম্ন সোপানাবলীর উপরে বিকাল বেলা উপবিষ্ট পেন্সনপ্রাপ্ত মুমূর্ষু বৃদ্ধদের সহিত-ই ইহাদের অর্থাৎ পুরাতন পুস্তকগুলির একমাত্র তুলনা। এই সব বৃদ্ধের দল সংসারের ঘাটে ঘাটে আঘাত খাইয়া সর্বাঙ্গে টোল খাইয়াছে, বিচিত্র অদৃষ্টের হাতে হাতে ফিরিয়া দেহে মনে নানা রকম লাঞ্ছনা ধারণ করিয়াছে; ছেঁড়া-ছাড়া কাটা-কুটির দাগ তাহাদের ললাটে, মুখমণ্ডলে ও সর্ব দেহে। এখন তাহারা অতীতের দিগন্তের দিকে নিস্পৃহচিত্তে চাহিয়া থাকিয়া পরকালের খদ্দেরের দ্বারা ক্রীত হইবার জন্যই যেন অপেক্ষা করিয়া আছে। মূলে তাহাদের যে মূল্য ছিল—এখন আর তাহা নাই, কাহারো কমিয়াছে, কাহারো বাড়িয়াছে, কেহ কেহ বা দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের মতো অত্যন্ত মলিন হইয়াও চড়াদাম হাঁকিয়া বসিয়া আছে। ইহারা মানব-সমাজের পুরাতন পুস্তকমালা।

আবার নূতন বইয়েব দোকানে যাও, দেখিতে পাইবে সোনার জলে নাম লেখা, মরক্কো বাঁধাই, ঝক্‌ঝকে, ঝলমলে বইগুলি, সর্বাঙ্গে অভিজ্ঞতার অভাব সূচিত করিয়া সংসারের ঘাটে অবতীর্ণ হইবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আবার উপমা দিবার প্রয়োজন হইলে বলিতে হয়, যেন পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের শিক্ষার্থী তরুণ-তরুণীর দল, এই পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি।

একখানা পুরাতন পুস্তক লইয়া মলাট ওলটাও। আদি ক্রেতার নাম ও ঠিকানা কাটিয়া পরবর্তী ক্রেতার নাম-ঠিকানা লিখিত। হয় তো পর পর পাঁচ সাতজন মালিক তাহার ছিল। কেহ হয় তো মার্জিনে নোট করিয়া পড়িয়াছে; কাহারো পড়া নিশ্চিহ্ন, আবার কেহ হয় তো না পড়িয়াই বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি প্রাচীন সহরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে যেমন একাধিক স্তরের চিহ্ন বিদ্যমান—পুস্তকখানিতেও তেমনি বহু মালিকের মনোযোগের এবং মনোযোগের অভাবের চিহ্ন দৃষ্ট হইবে।

কোলরীজের বইয়ের মার্জিন অমূল্য সমালোচনায় ঠাসা। চেষ্টারটনের বইয়ের মার্জিন বিচিত্র জাতির পশুপক্ষীতে জীবন্ত, যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক জগতের চিড়িয়াখানা! আবার বার্ণাড শ'র বইয়ের মার্জিন শর্টহ্যাণ্ড অক্ষরের দ্বারা চিহ্নিত। ইহাদের কলমের স্পর্শে বইয়ের মুদ্রিতাংশের চেয়ে শূন্য মার্জিন অধিকতর মূল্যবান্ হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব মার্জিনে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন।

অনেক সৌখিন ব্যক্তি, যাঁহারা গৃহসজ্জারূপেই পুস্তক কিনিয়া থাকেন—তাঁহারা পুরাতন পুস্তককে অবাঞ্ছিত মনে করেন। সজ্জার বিচারে নূতন বইয়ের চেয়ে পুরানো বইয়ের যোগ্যতা যে অল্প, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু পুস্তক তো গৃহসজ্জা নয়, মনঃসজ্জা। সে দিক্ দিয়া দেখিলে পুরাতন পুস্তকের তুলনা নাই। পুরাতন পুস্তক একাধারে মুদ্রিত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি। মার্জিন-লিপি প্রাচীনকালের পাণ্ডুলিপির অভিনব রূপ। মার্জিন-লিপি ও মুদ্রিত লিপি মিলিয়া পুস্তকের দ্বিজত্ব। বই যতক্ষণ না দ্বিজত্বলাভ করে—ততক্ষণ পাঠকের জ্ঞান-লাভের প্রকৃত সহায় হইতে পারে না। পুরানো বইয়ের রজত মূল্যের গৌরব কম হইলেও আসল গুরুত্ব কম নয়। তাই জ্ঞানবানেরা পাইবামাত্র পুরাতন বই কেনেন, কিন্তু ধনবানেরা নূতন পুস্তকের চেয়ে উচ্চতর অন্য কিছুর সন্ধান আর রাখেন না।

গদ্য কবিতা

নীচে পৃথিবী—উপরে স্বর্গ, মাঝখানে আকাশমণ্ডল বা অন্তরীক্ষ। এই অন্তরীক্ষ স্বর্গ ও মর্ত্যের 'নোম্যান্স ল্যাণ্ড।' এখানে স্বর্গের বিদ্যুৎ ও বজ্র এবং পৃথিবীর ধূলিকণা ও জলের শীকর মিলিত হইয়াছে। এখানে স্বর্গের হাত ও পৃথিবীর হাত মিলিত হইয়া নিরন্তর করমর্দন চলিতেছে। অন্তরীক্ষমণ্ডল স্বর্গ ও নয়, মর্ত্যও নয়—কিন্তু তবুও যেন উভয়েরই। এই জগতের অধিবাসী ত্রিশঙ্কুরাজ—সে স্বর্গ মর্ত্যের মধ্যে অক্ষয় 'হাইফেনের' মতো বিরাজমান—নিজের দুরাকাঙ্ক্ষার দ্বারা সে স্বর্গ-মর্ত্যকে নিত্যসংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

মর্ত্যকে যদি বলা যায় গদ্য আর স্বর্গকে যদি বলা যায় পদ্য—তবে এই অন্তরীক্ষ-মণ্ডল হইতেছে গদ্য কবিতার জগৎ—আর রাজা ত্রিশঙ্কু গদ্য কবিতার জগতের আদিমতম অধিবাসী।

স্বর্গ অনাদ্যন্ত কাল হইতে আছে, পৃথিবীও বহুকালের, স্বর্গ স্বসৃষ্ট, পৃথিবী কালের গতিকে সৃষ্ট হইয়াছে। পদ্য সৃষ্টিপূর্বকাল হইতেই আছে; বেদ অপৌরুষেয়—সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যই এক হিসাবে অপৌরুষেয়। গদ্য যে শুধু অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের তাহা নয়, তাহা মানবের সৃষ্টি, এবং মানবের প্রধান অবলম্বন। তবে গদ্য কবিতার জগৎ কি? তাহার প্রকৃতি কি? অন্তরীক্ষমণ্ডল অপেক্ষাকৃত হালের সৃষ্টি, তাহার নিঃসপত্ন অধিবাসী ত্রিশঙ্কু তো পৌরাণিক আমলের ব্যক্তি।

গদ্য কবিতা হালের সৃষ্টি। হোমার পদ্য লিখিয়াছেন—গদ্য লিখিবার কল্পনাও মহাকাল্পনিক কবিগুরুর মাথায় ছিল না। দান্তে গদ্য ও পদ্য দুই-ই লিখিয়াছেন। গ্যয়টে গদ্য ও পদ্য দুইই লিখিয়াছেন—কিন্তু গদ্যের পরিমাণই যেন অধিক। তাঁহাকে গদ্য কবিতা লিখিবার প্রস্তাব করিলে কথাটা তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন না, একবার অন্তত ভাবিয়া দেখিতেন। গ্যয়টে আধুনিক মানুষ ছিলেন।

হোমারের কাব্য-স্বর্গের অধিবাসী কে? চিরপ্রফুল্ল কৌতুকময় অমরবৃন্দ। তাঁহার কাব্যে অবশ্য মানুষও আছে—কিন্তু আমাদের মতো দিনমজুর-খাটা মানবকের চেয়ে দেবতাদের সঙ্গেই যেন তাহাদের অধিকতর ঐক্য। সুরানীল সিন্ধুর উপকূলে তাহাদের বাস; স্বর্ণপাত্রে অগ্নিবর্ণ মদিরা তাহাদের পানীয়; গুরুভার লৌহচক্র অনায়াসে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের ক্রীড়া; কমল-উন্মীল উষাকালে রাজকুমারী নীল সমুদ্রের কূলে বসিয়া বস্ত্র ধৌত করিলেও তাহাকে মানবী বলিয়া মনে হয় না; হোমারের উদার হাসি স্বর্গীয় জ্যোতির ন্যায় সমস্ত কাব্যখানিকে প্রোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা কি মানব? ইহারা দেবতা-ই। আবার দান্তে-র De Monarchia-র গদ্য-জগৎ অবশ্যই মানবের দ্বারা অধ্যুষিত। কিন্তু তাহার সঙ্গে আধুনিক মানবের মূলগত একটা পার্থক্য আছে। দান্তের মানুষ লক্ষ্য-সচেতন—যদিচ সে লক্ষ্য মধ্যযুগের মঠ-মন্দিরের অভিমুখী। তাহার লক্ষ্য সঙ্কীর্ণ হইতে পারে—কিন্তু তবুও তাহার অস্তিত্ব আছে। আধুনিকের মতো সে বিভ্রান্ত নয়।

গ্যয়টে গদ্য কবিতা লিখিলে লিখিতে পারিতেন বলিয়াছি। তাঁহার ফাউস্ট প্রথম আধুনিক মানব; সে মহাশক্তিমান কিন্তু মহাবিভ্রান্ত; যদিচ সে পদ্য জগতে বিরাজ করিতেছে কিন্তু তাহাকে গদ্য কবিতার জগতে বেমানান হইত না। তাহার অন্তরের সংশয়-কুয়াসার উপাদানেই যে গদ্য কবিতার জগৎ প্রস্তুত। আগেই বলিয়াছি, অন্তরীক্ষমণ্ডল গদ্য কবিতার জগৎ; ইহার অধিবাসী ত্রিশঙ্কু; আধুনিক মানব গদ্য কবিতার জগতের অধিবাসী; আমরা সকলেই ত্রিশঙ্কু—ত্রিশঙ্কু আর একটিমাত্র নয়—দুইশত কোটি ত্রিশঙ্কু অর্দ্ধ বিশ্বাসের সংশয়-কুয়াসা-বিজড়িত অন্তরীক্ষে পরস্পরের নিঃশ্বাস রোধ করিয়া দোদুল্যমান্। তাহারা না স্বর্গের, না মর্ত্যের; পায়ের তলায় তাহাদের কঠিন মৃত্তিকাও নাই, আবার স্বর্গের অমৃতপাত্রও তাহাদের স্বায়ত্ত হইল না—তাহারা মর্ত্যের কৃপার পাত্র আর স্বর্গের

কৌতুক। গদ্য কবিতার জগৎস্বরূপ শ্রেষ্ঠ গদ্য কাব্য-স্রষ্টার রচনাতেই প্রসঙ্গান্তবে বর্ণিত হইয়াছে—

"নিখিলেব অশ্রু যেন কবেছে সৃজন
বাষ্প হ'য়ে এই মহা অন্ধকার লোক—
সূর্য্যচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক
নিঃশব্দে রয়েছে চাপি দুঃস্বপ্নমতন
নভস্তল— * * *
স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদ লোক,
এ নরকপুরী।"

আধুনিক জগতের আমরা এখান হইতে কি দেখিতেছি?

"নিত্য নন্দন আলোক
দূর হ'তে দেখা যায়, স্বর্গযাত্রিগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্র স্বনে
নিদ্রাতন্দ্রা দূর করি ঈর্ষাজর্জবিত
আমাদের নেত্র হ'তে।"

হোমারের কাব্যের অধিবাসীদেব দেখিয়া, কালিদাসেব কাব্যের অধিবাসীদের দেখিয়া—ঠিক এই ভাবটিই কি আমাদের মনে জাগ্রত হয় না? 'সুরা-নীল' সিন্ধুতীরের মানবদের স্বর্ণপাত্রে মদিরাপান কি আমাদেব মনে অসূয়া জাগাইয়া দেয় না? আধুনিকী শকুন্তলাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, কাঁটায় আঁচলখানা বাঁধিয়া যাইবার সুযোগ পর্য্যন্ত নাই, পথ যে পীচ দিয়া বাঁধানো, বাগানের কাঁটা মালীর সতর্ক হস্তে উৎপাটিত। রাজচিত্রশালে চতুরিকার কৌশলে আবদ্ধ হইবাব অবসর কোথায়? সেখানে যে টিকিট কিনিয়া ঢুকিতে হয়। একালের দুষ্যন্তগণ 'আনাকরথবর্ত্মণ' নয়—বিরহের প্রচণ্ডতম ধাক্কাও তাহাকে প্রথম শ্রেণীর বিলাতি হোটেলের চেয়ে দূরতর স্থানে লইয়া যাইতে অক্ষম। তাই আমরা হোমার-কালি-দাসের জগতের দিকে 'ঈর্ষা-জর্জরিত নেত্রে' তাকাইয়া থাকি আর মনের ক্ষোভে বলি ওসব 'রিয়াল' নয় ওসব 'এস্কেপিজম', যেন একমাত্র আমরাই সত্যের সংবার্দ অবগত। বাস্তব ঘাড়ের উপরে বাঘের মতো আসিয়া পড়িয়াছে কাজেই এখন লড়াইয়ের ভান না করিয়া আর উপায় কি?

আর গদ্য কবিতার জগৎ হইতে মর্ত্যের গদ্যলোকের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি—

"নিম্নে মর্মরিত
ধরণীর বনভূমি,—সপ্ত পারাবার
চিরদিন করে গান—কলধ্বনি তার
হেথা হ'তে শুনা যায়।"

মর্ত্যের প্রাত্যহিক জগতের সংবাদ আছে ছড়ায়, পাঁচালীতে, লোক-সঙ্গীতে, লোকসাহিত্যে, ময়মনসিংহ গীতিকায়—আধুনিকগণ যাহাকে বলে গণ-সাহিত্য। এই মর্ত্যজীবন হইতেও আমরা নির্বাসিত, তাই গণ-সাহিত্যের কোন প্রতিনিধিকে দেখিলেই আমাদের মন প্রবাসীর ব্যাকুলতায় বলিয়া ওঠে—

"ক্ষণকাল থামো
আমাদের মাঝখানে। ক্ষুদ্র এ প্রার্থনা
হতভাগ্যদের। পৃথিবীর অশ্রুকণা
এখনো জড়ায়ে আছে তোমাব শরীর,
সদ্যচ্ছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির।
মাটির, তৃণের, গন্ধ ফুলের, পাতার,
শিশুর, নারীর, হায়, বন্ধুর, ভ্রাতার
বহিয়া এনেছ তুমি। ছয়টি ঋতুর
বহুদিন রজনীব বিচিত্র মধুর
সুখের সৌরভ বাশি।"

কালিদাসের কাব্যজগৎ হইতে যেমন আমরা নির্বাসিত, ময়মনসিংহ গীতিকার লোকসঙ্গীতের বাজ্য হইতেও আমরা তেমনি নির্বাসিত। আমাদের কাছে দুই-ই সমান 'আনরিয়াল'—লোকসঙ্গীতের প্রতি আসক্তি এস্কেপিজম্-এর এক নূতন প্রকারের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। কালিদাসেব কাব্যের প্রতি আসক্তি যদি সূক্ষ্ম বিলাস হয়—গণসাহিত্যের আসক্তি স্থূল বিলাস ছাড়া আর কি? কারণ আমরা এই দুই জগৎ হইতেই সমানভাবে বিচ্ছিন্ন!

আমরা যে জগতের অধিবাসী তাহার নাম বায়ুমণ্ডল। সন্দেহ, অবিশ্বাস, অর্দ্ধ বিশ্বাস, খণ্ড-দৃষ্টি এবং নাস্তিক্যের উপাদানে ইহা রচিত। নাস্তিকতার এই জগতের যথার্থ নকীব গদ্য কবিতা। পদ্যের অসংশয় ছন্দ এবং গদ্যের নিশ্চিত

প্রাঞ্জলতা, পদ্যের ঊর্দ্ধাশয়তা এবং গদ্যের স্বপ্রতিষ্ঠ স্থাণুতা কিছুই ইহাতে নাই। সংশয় সাগরোত্থিত মেঘমালার মতো এই গদ্য কবিতা কোন্ নিরুদ্দিষ্ট শৈলমালার অভিমুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। বৃষ্টিতে ইহার পরিণাম, না ঝটিকায় ইহার অবসান, না, নূতন উষার ব্রাহ্মমুহূর্তের অনেক আগেই ইহার নিঃশেষ অবলুপ্তি! এই তো গদ্য কবিতা। কিন্তু শুধু গদ্য কবিতাই বা বলি কেন? এ যুগের সব কবিতাই কি গদ্যকবিতা নয়?

ডিটেকটিভ উপন্যাস

ট্রামে বাসে কাহাকেও পাঠমগ্ন দেখিলে বুঝিয়া লইতে হইবে—বইখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস। এ আমার অনুমান মাত্র নয়—প্রমাণলব্ধ অভিজ্ঞতা। বিকাল বেলায় আফিস-ফেরত ট্রামের অদূরবর্তী আসনে পলিতকেশ বৃদ্ধকে একাগ্র-মনে পাঠনিরত লক্ষ্য করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া লইয়াছি বইখানা গীতা বা রামকৃষ্ণ কথামৃত নয়—রোমাঞ্চক সিরিজের ডিটেকটিভ গল্প। ট্রামে, বাসে, হোটেলে, রেঁস্তোরায়, স্টেশনে, ট্রেণে, ইস্কুলে, কলেজে, ব্যাঙ্কে, আফিসে সর্বত্র ডিটেকটিভ গল্পের প্রাদুর্ভাব। ডিটেকটিভ গল্পের কচুরিপানা সরস্বতীর মানস সরোবরকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাদের প্রকোপে শুষ্কপ্রায় সাহিত্যের শতদল পরিত্যাগ করিয়া বীণাপাণি অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন আর 'বাণী-বনের হংসমিথুন' 'ওয়াটসন' সনাথ শার্লকহোমসের' মতো সন্ধানী নেত্রে ডুব দিয়া চোর, ডাকাত, খুনীর গবেষণা করিয়া ফিরিতেছে। সংক্ষেপে ইহাই আজকার দিনের প্রধান সাহিত্যিক সংবাদ।

এ যুগের মুখ্য সাহিত্য ডিটেকটিভ সাহিত্য। অধিকাংশ পুস্তকই রকম-ফেরে ডিটেকটিভ পুস্তক—ডিটেকটিভ বা ভৌতিক বা রোমাঞ্চক অর্থাৎ থ্রিলার জাতীয় কিছু। স্বাভাবিক মানুষের কথায় মানুষের যেন আর তেমন আগ্রহ নাই। চোর, ডাকাত, খুনে, বাটপাড় বা ভৌতিক কিছু না হইলে মানুষের মুখে আর রোচে না। এমন হইবার কারণ কি? মাতালের রসনায় স্বাভাবিক মৃদু রস তেমন সাড়া জোগায় কি? কড়া ঝাল, কড়া টক, কড়া লবণাক্ত না হইলে মাতালের অসাড় জিহ্বা আর সাড়া দেয় না। তাহার শিরাগ্রন্থি নির্দয়ভাবে প্রহৃত না হইলে উত্তেজিত হয় না। অস্বাভাবিক অভ্যাসের ইহাই স্বাভাবিক পরিণাম। এ

যুগের মানুষ তীব্র জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। অকস্মাৎ সে গোরুর গাড়ির মন্থরতা হইতে এরোপ্লেনের দ্রুতিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বেতারের বৈদ্যুতিক গতিও তাহার কাছে যথেষ্ট সত্বর মনে হয় না। যান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় জীবিকা-সংগ্রহ এমন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে যে, অন্নচেষ্টাতেই তাহার জীবনশক্তির পনেরো আনা রস চলিয়া যায়। উপার্জনের যে উদ্বৃত্ত সময়টুকু তাহার হাতে থাকে—তাহা লইয়া তাহার স্বস্তি নাই। ওই অবসরটুকু তাহার শত্রু, অন্ন প্রচেষ্টা ছাড়া সময়ের আর সব ব্যবহার সে ভুলিয়া গিয়াছে। ওই সময়টুকু কিভাবে ব্যবহার করিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে হয় মদ খায়, নয় জুয়া খেলে, নয় ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে। ডিটেকটিভ উপন্যাস কাগজের বোতলে সঞ্চিত উগ্র মদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

কলেজ ষ্ট্রীট, ধর্মতলা, চৌরঙ্গির দুই পাশে এমন অজস্র মদের দোকান। ভালমন্দ, ছোটবড়, দেশী-বিদেশী, নূতন-পুরাতন, সস্তা-দামী নানারকম মদ কাগজের বোতলে সঞ্চিত আছে, দু' আনা, আট আনা, পাঁচ সিকা ফেলিয়া দিয়া কিনিয়া আনো, পড়িয়া অসাড় শিরাজালকে খাদ্য জোগাও যতক্ষণ না ঘুম আসে। ঘুমাইয়াও যে নিস্তার আছে এমন মনে হয় না, জাগরণে যে এরোপ্লেনের সঙ্গে পাল্লা দেয়—স্বপ্নে বোধ করি সে এরোপ্লেন চালায়। মদের বোতল খালি হয় কিন্তু এ মদের বোতল অর্জুনের অক্ষয় তূণীর। কোনও রকমে এক ভাঁড় কিনিতে পারিলে বাড়িসুদ্ধ, পাড়াসুদ্ধ সকলে পান করিতে পারে। বস্তুতন্ত্রবাদী সমালোচকরা বলিয়া থাকেন যে, সাহিত্য যুগধর্ম উদ্ভূত। বর্তমানের যুগধর্ম হুজুগধর্ম। হুজুগ মানে অবান্তর উপলক্ষ্য। মানুষের অসাড় চিত্তকে কোন-না-কোন হুজুগের ধাক্কা দিয়া সজাগ করিয়া রাখিতে হয়। ডিটেকটিভ উপন্যাস এই রকম একটা হুজুগের ধাক্কা। রোমাঞ্চক-সাহিত্য মানুষের উদ্বৃত্ত এক আনা সময়ের পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দেওয়া ছাড়া আর কি, এডগার অ্যালেন পো এই সাহিত্যের 'কিট্‌ মারলো' —আর কনানডয়েল হইতেছেন 'শেক্সপীয়র।'

শেক্সপীয়রের কথায় মনে পড়িয়া গেল—যে হ্যামলেট নাটকখানা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ কাহিনী বা থ্রিলার। ভূত, খুন, লড়াই, হত্যা, উন্মাদ প্রভৃতি থ্রিলারের সমস্ত উপজীব্যই এই নাটকে বিদ্যমান। বর্তমান যুগে লিখিত হইলে 'হ্যামলেট' থ্রিলার মাত্র হইত—কিন্তু শেক্সপীয়রের হাতে পড়িয়া ইহা চিরবরেণ্য জীবনবেদে পরিণত হইয়াছে কনানডয়েল ইচ্ছা করিলে হ্যামলেটের কাহিনীকে ডিটেকটিভ উপন্যাসে পরিণত করিতে পারিতেন। ডেনমার্কের রাজা অকস্মাৎ

নিহত হইয়াছেন—কে তাঁহাকে নিহত করিল? ইহাই কাহিনীর প্রধান সমস্যা। এই কাহিনীর শার্লকহোমস হইতেছেন প্রিন্স হ্যামলেট আর ওয়াটসন তাঁহার বন্ধু হোরেশিও। আমার তো কেমন মনে হয়, শার্লকহোমস ও ওয়াটসন্ হ্যামলেট হোরেশিও-র ছাঁচে রচিত। হ্যামলেট দার্শনিক হইলেও কাজের পটুতা তাহার আছে—কিন্তু কাজে মন তাহার নাই—নিতান্ত বাধ্য হইয়াই কাজে নামিয়াছে। হোমসের মন দার্শনিক মন; তাহার দর্শনক্ষমতা এত তীব্র যে তাহাতে গভীর তত্ত্ব ও চোর, ডাকাত খুনে সবই ধরা পড়িয়া যায়। তত্ত্বলোকের অলস নিষ্ক্রিয়তার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই হোমস মাঝে মাঝে রিভলভার ভরিয়া লইয়া চোর, ডাকাতের সন্ধানে বাহির হয়। হোমস ও হ্যামলেট দু'জনেরই মনটা দার্শনিক কিন্তু প্রকৃতিটা নিতান্ত পার্থিব অর্থাৎ তাহারা যেন সাত্ত্বিক ও রাজসিকের বিপরীত ধাতুতে গঠিত। এই জন্যই তাহাদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব রহিয়াছে—কাহারো মনে শান্তি নাই। বিশুদ্ধ দার্শনিক শান্তি পায়, বিশুদ্ধ পার্থিব ব্যক্তিও শান্তি পায়—কিন্তু দার্শনিক-পার্থিবের জরাসন্ধের শান্তি কোথায়? আর সর্বোপরি হ্যামলেট ও হোমস দুজনেরই চরিত্রে আছে পাঠকের ভালবাসা আদায় করিয়া লইবার একটা অদ্ভুত শক্তি।

হোরেশিও এবং ওয়াটসন দু'জনেই যেন পাঠকের প্রতিনিধি; পাঠকের দৃষ্টিকেই যেন তাহারা প্রকাশ করিতেছে। পাঠকের যতটুকু জানা ও দেখা দরকার তাহারা কেবল ততটুকু মাত্র জানিতেছে ও দেখিতেছে—এবং শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের মতোই কখনো বিস্ময়, কখনো আনন্দ, কখনো বা শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছে। দু'জনেই হ্যামলেট ও হোমসকে ভালবাসে। তাহাদের মতো আমরাও হ্যামলেট ও হোমসকে ভাল না বাসিয়া পারি না। তাহারাই আমরা। আমরাই "Good old Watson" এবং "Good Horatio".

তৎসত্ত্বেও হ্যামলেট নাটক তো ডিটেকটিভ উপন্যাস নয়। কনানডয়েলের হাতে পড়িলে যাহা খুনীর অনুসন্ধান মাত্র হইত, শেক্সপীয়রের হাতে পড়িয়া তাহা উপলক্ষ্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

খুনের অনুসন্ধান হ্যামলেট নাটকে উপলক্ষ্য মাত্র, আসল লক্ষ্য একটি তত্ত্বানুসন্ধান। হত্যার দ্বারা হত্যার প্রতিকার হয় কি না—ইহাই এই নাটকের জিজ্ঞাসা। এমন যে হইয়াছে তার একটা কারণ শেক্সপীয়র ও কনানডয়েলের প্রভেদ—কিন্তু আসল কারণ দুই যুগের প্রভেদ। শেক্সপীয়রের যুগে জীবিকার

চাপ এমন দুর্ভর হইয়া উঠিয়া জীবনের সমস্ত রসকে শোষণ করিয়া লয় নাই। তখনো তত্ত্বজিজ্ঞাসার সময় ও ইচ্ছা মানুষের ছিল। যুগধর্মের প্রভেদে যাহা হইয়াছে 'হ্যামলেট' নাটক কনানডয়েলের হাতে পড়িলে তাহাই হইতে পারিত— 'দি মিস্ট্রি অব প্রিন্স হ্যামলেট।' হ্যামলেট এবং হোরেশিও-ই জন্মান্তরে হইয়াছে হোমস এবং ওয়াটসন। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে কনানডয়েলের হাতে হ্যামলেট নাটকের লক্ষ্যটা ঢাকা পড়িয়া গিয়া উপলক্ষ্যটাই প্রধান হইয়া উঠিত—কারণ ইহাই তো বর্তমানের যুগধর্ম। জীবনের লক্ষ্য আজ যন্ত্রের ধূমে আচ্ছন্ন ; আছে কি নাই সন্দেহ জন্মে। উপলক্ষ্যটাই আজ লক্ষ্যবৎ প্রতীয়মান নয় কি ?

ফুলকপি

'তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল' প্রত্যক্ষ কোথাও যদি একত্র থাকে—তবে ওই ফুলকপি। শুধু একত্র নয়—এক তোড়াতে। একটি ফুলেই একটি তোড়া। হেমন্ত লক্ষ্মী নিজে আসিয়া পৌছিবার আগে বাণী বহন করিয়া এই পুষ্পদূতটিকে পাঠাইয়া দেন। প্রকৃতি নিজের হাতে তোড়াটি বাঁধিয়াছে— এমন কি ফুলের পটভূমি রচনার কয়েকটি সরস সবুজ পাতারও অভাব হয় নাই। পেশীবহুল ফুলকপিটি কেমন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, যেন মেদের স্ফীতি আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। শুভ্র রঙের সঙ্গে সঙ্গে একটু হলদের আভা-মেশানো শ্বেতাঙ্গ আর চীনা দম্পতির সন্তানটি যেন।

ফুলকপি এপর্য্যন্ত কোন কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ইহার প্রতি একটা আভ্যন্তরিক আকর্ষণ সত্ত্বেও বেচারার প্রতি কবিদের কি অবহেলা! কবিরা ইহার ফলত্বের দিক্‌টাই দেখে—অপরদিকে ভোগীরা ইহার ফুলত্বটা দেখিতে পায় না। ফলে বেচারা কোন কালে আর ললিতকলার আসরে স্থান পাইল না। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, এমনভাবে একাধারে ভোগীকে ও কবিকে পরিতৃপ্ত করিবার ক্ষমতা আর কার আছে ? ফুলের সৌন্দর্য্য ও ফলের স্বাদুতা আর কে মিলাইতে পারিয়াছে ?

শেক্সপীয়র যে মাপের কবি সেই মাপের ভোজনরসিক হইলে 'সোয়ালো পাখী ভরসা করিয়া আসিবার আগেই ড্যাফোডিল ফুল বসন্তের আসরে আসিয়া সৌন্দর্য্যের ওড়না উড়াইয়া দেয়'—না বলিয়া বলিতেন শীতের বাজারে হোরেল, সরাল প্রভৃতি

পাখী উঠিবার আগেই ফুলকপি আসিয়া বাজারের একটি কোণ পীতাভ শুভ্রতায় উজ্জ্বল করিয়া তোলে। এখন শেক্সপীয়র নাই—কিন্তু প্র না-বি আছে, কাজেই সে একেবারে অনাদৃত থাকিয়া যাইবে না। কিন্তু তার আগে একটা গল্প বলিয়া লই।

রাধা প্রতি রাত্রে ঘরটি নানা ফুলে সাজাইয়া কৃষ্ণের জন্য বাসকসজ্জিতা হইয়া বসিয়া থাকিতেন। কিন্তু কৃষ্ণ আব আসেন না।. ভোরবেলা রাশি রাশি বাসি ফুলের স্তূপ মলিনা রাধা বাহিরে ফেলিয়া দেন। এমন প্রতি রাত্রি হয়—রাধার রাত্রি জাগরণ, আর ভোরবেলা বাসি ফুল নিক্ষেপ। অবশেষে বিবক্ত হইয়া উঠিয়া রাধা রাত্রে ঘরটি সাজাইলেন সজ্‌নে ফুলে। সে রাত্রেও কৃষ্ণ আসিলেন না—কিন্তু রাধাকে আর ফুল ফেলিয়া দিতে হইল না। তিনি দুপুর বেলা সরষে বাঁটা দিয়া সজ্‌নে ফুলের চচ্চড়ি রাঁধিয়া খাইলেন। সজ্‌নে ফুলও একাধারে ফুল ও ফল অর্থাৎ খাদ্য। (সজ্‌নে ফুলেব বিষয়েও লিখিতে পারিতাম কিন্তু শীতকালে ফুলকপিই প্রশস্ত। বিশেষ ফুলকপি এবারে এমন দুর্মূল্য যে, প্রবন্ধরচনা ছাড়া আর কোন ঘনিষ্ঠ উপায়ে তাহাকে ভোগ করা বডই কঠিন।)

পাঠক, এতক্ষণে বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, ফুলকপিকে উপলক্ষ্য করিয়া একটা তত্ত্বকথা বলিতে বসিয়াছি। (বাস্তবিক কি বুদ্ধি!) ফুলকপি মানুষের জীবনেব পূর্ণতার প্রতীক। ফুল এবং ফল, সৌন্দর্য্য এবং বাস্তব সত্য, আর্ট এবং ক্রাফ্‌ট যুগপৎ যেন প্রতীকিত ফুলকপির মধ্যে। আধুনিক সভ্যতার বিপদ এই যে এই সব আপাতবিরুদ্ধের মধ্যে সমন্বয় করিতে না পারিয়া মানুষে এগুলিকে স্বতন্ত্র কোঠায় ঠেলিয়া দিয়াছে। ফলে শিল্পের পূর্ণতার মধ্যে দ্বৈরাজ্য-নীতি উপস্থিত। ভারতীয় ঋষিদের দৃষ্টিতে (প্রাচীন কালের সব দেশের মনীষীদের চোখেই) শিল্পে ছিল অদ্বৈতবাদ, সব শিল্পই এক, সূক্ষ্মস্থূলের ভিত্তিতে ভেদ ছিল না, কেবল কাজের সুবিধার জন্য চৌষট্টি ভাগ করিয়া দেখা হইত মাত্র। এখন শিল্পে আসিয়াছে দ্বৈতবাদ। আর্ট ও ক্রাফ্‌ট; ললিতকলা ও রূঢ় শিল্প। এই ভাগের ফলে একদল বাস্তববিরহিত আর্টিষ্ট হইয়াছেন, আর একদল সৌন্দর্য্যবিরহিত ক্রাফ্‌টস-ম্যান। সৌন্দর্য্য ও বাস্তব বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে; ফুল আর কপি জরাসন্ধের মতো ভিন্ন হইয়া গিয়াছে; দুইয়ে সন্ধি করিয়া কিছুতেই আর ফুলকপি হইতে পারিতেছে না। (ফুলকপির মধ্যে এত তত্ত্ব আছে জানিলে আর কি নিশ্চিন্তভাবে ফুলকপির শিঙাড়া খাইতে পারিবে?)

শিল্পে দ্বৈতবাদের ফলে কবিরা এখন শিল্পের জন্য কবিতা লেখে, ক্ষুধার খাদ্য সংগ্রহের জন্য লেখে না। চিত্রকরের যে ছবি আঁকা উচিত ছিল মাটির হাঁড়িতে, কলসীর উপরে, মন্দিরের গায়ে, এখন তা সে আঁকে ঘরে বসিয়া কাগজের টুকরায়, মাসিকে ছাপায়, মাসান্তে কেহ চাহিয়াও দেখে না। ভাস্করের যে মূর্তি খোদাই করা উচিত ছিল মন্দিরের প্রাচীরে, দেবতার উদ্দেশ্যে, সেই মূর্তি খোদিত হয় রাজনীতিকের চেহারা দেখিয়া, অচিরকালের মধ্যে রাজনীতিক ও তাহার স্বরূপ বৈতরণীর জলে তলাইয়া যায়। আগে স্থপতিরা গড়িত মন্দির, চৈত্য, বিহার; এখন গড়ে হাসপাতাল, ব্যারাক, পাগলাগারদ, থাকিবার লোকের অভাব হয় না। সে-সব আশ্রয়ে দেবতা ও মানুষ দুই-ই থাকিত, এখনকার অট্টালিকায় দেবতা যে থাকেন না তাহা নিশ্চয়।

কবিরা কবে আবার ক্ষুধার জন্য কাব্য লিখিবে? হোমারের মতো, চণ্ডীদাসের মতো গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে? নাট্যকারেরা কবে আবার শেক্সপীয়র, মলিয়েরের মতো যাত্রাদলের অধিকারী হইয়া পালা রচনা করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে? শিল্পীর তুলিতে কবে আবার হাঁড়ি, কলসী, ঘর দ্বার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে? ক্ষুধায় ক্ষুধায় মানুষে মানুষে যে আদিতম ও নিশ্চিততম যোগ তারি সার্বভৌম ভিত্তিতে কবে আবার শিল্প আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে? আর্ট ও ক্রাফ্‌টের হেরফের ঘুচিবে! বাস্তব ও সৌন্দর্য্যের বিচ্ছেদ ঘুচিয়া গিয়া অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি প্রকাশিত হইবে। সংক্ষেপে ফুল আর কপি একসঙ্গে মিলিয়া ফুলকপি হইবে। মানুষের সভ্যতা শিল্পের এই পূর্ণতার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। সেই পূর্ণতার প্রতীক ফুলকপি—"তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল'—একদেহে।

কল্পনা ও বাস্তব

বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে কে কাহাকে অনুসরণ করে? সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বাস্তবের তল্পিবহন করিয়াই কল্পনা চলে। বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ হইলে ইহাই স্বাভাবিক—কিন্তু ইহাদের মধ্যে কি ঠিক সেই সম্বন্ধ? বরঞ্চ বলিতে হয় যে বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে বর-বধূর সম্পর্ক। কল্পনার বধূকে বাস্তব বর অনুসরণ করিয়া সপ্তপদী গমন করিতেছে না কি? আমাদের

শাস্ত্রে 'শব্দব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। এই শব্দব্রহ্মই সৃষ্টির আদিতম রূপ—আর আধুনিক ভাষায় শব্দব্রহ্মের অর্থ দাঁড়াইবে—আইডিয়া বা কল্পনা। বিধাতা-পুরুষের কল্পনাকে অনুসরণ করিয়া বাস্তব অবতীর্ণ হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে বলে যে আদিতে ছিল 'Word' এই—'Word'—আইডিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। Word বা আইডিয়া জগৎকে চালিত করিতেছে যেমন ঘোড়া গাড়িখানাকে টানিয়া লইয়া যায়।

ইহা যদি সত্য হয়, আমার বিশ্বাস ইহাই একমাত্র সত্য, তবে আইডিয়া-পরিচালিত ব্রহ্মাণ্ডের মতো সাহিত্যবস্তুটাই আইডিয়াসম্ভূত এবং আইডিয়া পরিচালিত। সাহিত্যে যাহাকে রিয়ালিজম্ বলি, তাহা আইডিয়ার টানে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সব সাহিত্যই মূলতঃ Idealistic বা আদর্শিক। সাহিত্যে নিছক বাস্তব অশ্ব-বিচ্ছিন্ন গাড়িখানার মতো, যতই সুনির্মিত হোক না কেন—তাহার নড়িবার শক্তি নাই। যে নিজেই নড়িতে অসমর্থ মানুষকে তাহা চালিত করিবে কি ভাবে? কিন্তু মানুষ অবোধ শিশুর মতো, সে বাহনহীন গাড়িখানার মধ্যে ঢুকিয়াই গাড়ি-চড়ার সার্থকতা অনুভব করে—মনে করে তাহার গাড়ি চলিতেছে।

সাহিত্যের বাস্তবকে ইন্ধন বলা যাইতে পারে। এই স্তূপীকৃত ইন্ধন একটি মাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আকাশের বৈদ্যুতিক স্পর্শে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অবতীর্ণ হইলে প্রজ্বলিত ইন্ধন তাহার সার্থকতা পায়। এই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গই আইডিয়া। এই আইডিয়া আকাশে আকাশে অদৃশ্যভাবে নিত্য সঞ্চরিত হইয়া পর্বতের শিখরে শিখরে ইন্ধনের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। ইন্ধনকে সঞ্চয় করিতে, সংগ্রহ করিতে হয়, আইডিয়ার করস্পর্শের অনুকূল করিবার নিমিত্ত শুকাইয়া তাহাকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু আইডিয়ার উপরে মানুষের কোন হাত নাই—তাহার জন্য অসহায়ভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই। রত্নাকরের শুষ্ক জীবনেন্ধনের উপর 'বাণীর বিদ্যুৎদীপ্ত ছন্দোবাণ' কবে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

আইডিয়া শাশ্বত, ইন্ধন ক্ষণিক। আইডিয়া শাশ্বত বলিয়াই তন্মধ্যে আভাসে সর্বকাল, সর্বদেশ রহিয়া গিয়াছে—এই কারণেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে prophetic বলা হইয়া থাকে। ইলিয়াডের সংগ্রাম বর্ণনায় ভবিষ্যতের সমস্ত যুদ্ধই বর্ণিত হইয়া গিয়াছে আবার ইউরিপিডিসের 'Trojan women'-এর দুঃখে পৃথিবীর যুদ্ধাভিহত

যাবতীয় নারীর দুঃখ চিত্রিত। আকাশের বিদ্যুৎ-সঞ্চারে যে-কাব্য প্রদীপ্ত, তাহা যে-কালের, যে-দেশেরই হোক না, তাহার শাশ্বত শিখা যেমন অনির্বাণ তেমনি তাহার জ্যোতি মানবজীবনের অন্ধিসন্ধিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে সমর্থ।

রবীন্দ্রসাহিত্য আকাশাগ্নি দীপ্যমান। মুক্তধারা ও রক্তকরবীর দুটি অংশ তুলিয়া দিলে বুঝিতে পারা যাইবে যন্ত্র ও যন্ত্রবাদের পরিণাম কি ভয়াবহ অমরত্ব লাভ করিয়াছে। একটা বাস্তব যন্ত্র দেখিয়া যাহা আমাদের মনে হওয়া উচিত অথচ হয় না—সেই নির্মমের কি মনোরম প্রকাশ।

[দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে · ···।]

পথিক—আকাশে ওটা কি গড়ে তুলেছে ? দেখ্‌তে ভয় লাগে।

নাগরিক—জান না ? বিদেশী বুঝি ? ওটা যন্ত্র।

পথিক—কিসের যন্ত্র ?

নাগরিক—আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধরে' যেটা তৈরি করছিল, সেটা ঐ তো শেষ হ'য়েছে, তাই আজ উৎসব।

পথিক—যন্ত্রের কাজটা কি ?

নাগরিক—মুক্তধারা ঝরণাকে বেঁধেছে।

পথিক—বাবারে! ওটাকে অসুরের মাথার মতো দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রেব কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে ; দিন রাত্তির দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যাবে।

নাগরিক—আমাদের প্রাণপুরুষ মজবুত আছে, ভাবনা ক'রো না।

পথিক—তা হ'তে পারে, কিন্তু অমনতরো সূর্য্যতারার সামনে মেলে রাখবার জিনিষ নয়, ঢাকা দিতে পারলেই ভাল হ'ত। দেখতে পাচ্ছ না যেন দিন রাত্তির সমস্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্ছে। [মুক্তধারা]

ইহা চিরকালীন যন্ত্রের বর্ণনা হইলেও কলিকাতার নাগরিকদের সহিত এই বর্ণনার বিশেষ যোগ আছে। উত্তর-কূটের সর্বত্র হইতে গঙ্গার নূতন শাঁকোটা তেমনি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার উর্দ্ধোত্থিত দুই লৌহভুজ অতিকায় মহিষের উদ্ধত দুই শৃঙ্গের মতো আকাশটাকে যেন সর্বদা ঢুঁ মারিতে উদ্যত। মহিষ-ই বটে—যমরাজার বাহন। যন্ত্রবাহনে চাপিয়া তিনি আসিতেছেন—ওই তাঁহার মহিষের প্রচণ্ড শৃঙ্গ, কলের চিমনির প্রশ্বসিত ধূমে তাহার ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস—কলের

চীৎকারে তাহার গর্জন আর লাল আলোয় তাহার রক্তচক্ষু। কিন্তু কলিকাতার নাগরিকদের প্রাণপুরুষ নাকি খুব মজবুত—তাহারা ভাবনা করে না। কিন্তু একি সাহস না চিত্তের অসাড়তা।

এই তো গেল যন্ত্রের রূপ—যন্ত্রবাদের পরিণামের রূপ আছে—রক্তকরবীতে।

নন্দিনী—সর্দার, সর্দার, ওকি। ও কারা।

নন্দিনী—চেয়ে দেখো, ওকি ভয়ানক দৃশ্য। প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেছে নাকি। ওই কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে? ওই যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কির দরজা দিয়ে?

সর্দার—ওদের বলি আমরা রাজার এঁটো।

নন্দিনী—মানে কি।......কিন্তু এসব কী চেহারা। ওরা কি মানুষ। ওদের মধ্যে মাংসমজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে?

সর্দার—হয় তো নেই।

নন্দিনী—কোন দিন ছিল?

সর্দার—হয় তো ছিল।

নন্দিনী—এখন গেল কোথায় .... হায় রে, আমার ইশারাতে যার রক্ত নেচে উঠ্‌তো, সে আমার ডাকে সাড়াই দিল না। গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল। লোহাটা ক্ষয়ে গেছে, কালো মরচেটাই বাকি। এমন কেন হ'ল। [রক্তকরবী]

প্রেতপুরীর দরজা প্রতিদিন খুলিয়া যায় দশটা পাঁচটায়। দশটায় ইহারা প্রেতপুরীর ভিতরে ঢোকে—রাজার এঁটো হইয়া পাঁচটায় বাহির হয়। যে কোন বড় কারখানা বা আপিস পাড়ায় গিয়া দাঁড়াইলে রাজার এঁটোর এই শবযাত্রা দেখিতে পাওয়া যায়। আমি দেখিয়াছি লালদীঘি পাড়ায় বেলা পাঁচটায় শোকাবহ শবযাত্রা। চোয়াল ভাঙা, গাল বসিয়া যাওয়া, মুখ তোবড়ানো চলমান কঙ্কালের শ্রেণী! ব্লটিং পেপারে কালির মতো ইহাদের জীবন হইতে রূপ রস প্রাণ সৌন্দর্য্য ও শুভেচ্ছা কে যেন নিঃশব্দে শুষিয়া লইয়াছে। আশেপাশে ইহাদের তাকাইবার অবকাশ নাই—টলিতে টলিতে ইহারা চলিয়াছে। স্বয়ং উর্বশীও সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে ইহারা ফিরিয়া চাহিবে না। নন্দিনীকে ইহাদের চোখে পড়িবে কেমন করিয়া! প্রেমের প্রতি, সৌন্দর্য্যের প্রতি, কল্যাণের প্রতি ইহাদের আর বিশ্বাস

নাই। যন্ত্রবাদের সবচেয়ে দুর্দৈব এই যে আইডিয়ার উপরে ভরসা চলিয়া যায়। যে রক্তধারা কলের নির্জীব একচ্ছন্দ হাসফাসানিতে সাড়া দিতে শিখিয়াছে নন্দিনীর ইশারায় তাহা নাচিয়া উঠিবে কেমন করিয়া ?

যন্ত্রের প্রসারকে আমরা সভ্যতার প্রসার বলি—চারদিকে আজ কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য আর 'ইনডাষ্ট্রিয়াল প্ল্যানিং'-এর রব, প্রেতের শোভাযাত্রা বৃদ্ধির ভূমিকা। তখন যন্ত্রের ফুৎকার ও চীৎকার ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে আমার কানে প্রবেশ করিতেছে নন্দিনীর ওই আর্তনাদ 'গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল।' নন্দিনীর কান্নায় কি আসে যায়—তাহার উপরেই যে আমাদের অবিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে।

বার্তাকু

বাল্যকালে একটি গান শুনিয়াছিলাম, এখনো তাহার দুইটি ছত্র মনে আছে—

"এক পাপীর বাড়িতে ছিল
তুলসীবৃন্দাবন
তুলসী কাটিয়া পাপী
লাগাইল বাইগন।"

সঙ্গীত রচয়িতা তুলসীবৃন্দাবন উচ্ছেদকারীকে পাপী বলিয়া নির্দেশ করিয়া তাহার প্রতি যে রায় দিয়াছেন তাহার সঙ্গে একমত হইলেও লোকটির প্রতি কিছুতেই আমি আধ্যাত্মিক উষ্মা টানিয়া আনিতে পারিতেছি না। লোকটার ধর্মজ্ঞান না থাকিতে পারে কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে। তুলসীমঞ্জরীর চেয়ে বার্তাকুর সৌন্দর্য্য কি কম ? তুলসী বৃন্দাবনকে মনে মনে প্রণাম করিয়াও সভয়ে নিবেদন করিতেছি যে, ফলবান বার্তাকু গাছ বড়ই সুন্দর। অত্যুন্নত গাছটিতে শ্যামল চিক্কণ মেঘমেদুর আষাঢ়ের জলভারনত পুঞ্জিত জলদের মতো সরস নধর ফলগুলি ঝুলিয়া আছে—এত সৌন্দর্য্য কবিদের চোখে পড়ে না কেন ? ওই যে উজ্জ্বল নীলমণি সদৃশ পুষ্ট বার্তাকুটি কণ্টকিত বৃন্তে বাতাসে মৃদুমন্দ দুলিতেছে ওটাকে দেখিয়া মনে হইতেছে রাধাকে ভয় দেখাইবার জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণ তমাল শাখায় গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিবার অভিনয় করিতেছেন। রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী লইয়া সহস্র সহস্র পদ লিখিত হইয়াছে, কত হাবভাব, মান-অভিমান, কত সত্য

এবং কত অভিনয়—কিন্তু ঠিক এই কথাটি কাহারো মনে পড়ে নাই কেন? ওই যে নীলাভ ফলের গাত্রে একটুখানি প্রচ্ছন্ন রক্তিমাভাস—কালো মেঘচাপা-পড়া সূর্য্যের রক্তদীপ্তি যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে। আর মুক্তকেশী বেগুনগুলিই বা কি সুন্দর! যেন অদৃশ্য পরীর দল সুদৃশ্য কুন্তলদাম এলাইয়া দিয়া বিরাজ করিতেছে। রঙে, গড়নে, চিক্কণতায় এত সৌন্দর্য্য যাহার, কাব্যরাজ্যে সে প্রবেশাধিকার পাইল না কেন? পরন্তু যদি কোন রসিক তুলসী বন উঠাইয়া বেগুনের চাষ করে তাহাকে পাপী আখ্যা পাইতে হয়—মানুষ এমনি সৌন্দর্য্যের অকৃতজ্ঞ।

বার্তাকু যে কাব্যে স্থান পাইল না তাহার প্রধান কারণ বেগুন অতি উপাদেয় তরকারী। সুস্বাদু ফল হইলেও-বা কাব্য-মালঞ্চে যেমন তেমন একটা আসন পাইত, কিন্তু যে তরকারীকে বঁটিতে ফেলিয়া কুটিতে হয়, নুন ঝাল হলুদ সর্ষে-বাটা দিয়া বিধিমতে হাতা খুন্তী দিয়া তাড়না করিয়া রন্ধন করিতে হয়—কিম্বা ছাঁকা তৈলে ভাজিয়া তুলিতে হয়, তাহাকে লইয়া কাব্যরচনা বোধ করি সম্ভব নয়। হায় বার্তাকু, তুমি যদি নিত্য-ভোজ্য অত্যাবশ্যক সুস্বাদু তরকারী না হইয়া অকিঞ্চিৎকর একটা তেলাকুঁচা মাত্র হইতে, তবে অকৃতজ্ঞ কবির দল তোমাকে সুন্দরীর বিম্বাধরে স্থাপন করিয়া মাতামাতি আরম্ভ করিত। তুমি যদি কোন পর জীবনে বার্তাকুজন্ম ঘুচাইয়া সামান্য একটি ঘাসের ফুল হইয়া জন্মিতে পার, তবু তুমি আদৃত হইবে। কিন্তু বার্তাকু-দেহ থাকিতে কবিতার নন্দনবনে তোমার প্রবেশ নিষেধ।

এমন কেন হয়? রসনার সঙ্গে কাব্যরসের এমন বিবাদ কেন? ফুল লইয়া কবিদের উৎসাহের অন্ত নাই—ফলে তাহারা মন্দোৎসাহ, তরিতরকারীতে একে-বারেই উৎসাহহীন। ধান্য যতদিন ক্ষেতে থাকে, যতদিন তাহা অপক্ব বা আপক্ব—ততদিন কবিদের ব্যগ্রতা। কিন্তু যেমনি ধান্য মাড়াই হইয়া তণ্ডুলাকারে গোলাজাত হইল অমনি কবিদের সমস্ত আগ্রহ নিভিয়া যায় কেন? বস্তুর প্রয়োজনীয়তা যতই বাড়ে তাহার নন্দনসম্বেদ ততই কমিতে থাকে কেন? তবে কি প্রয়োজনের সঙ্গে কাব্যের মৌলিক কোন বিরোধ আছে?

আছে বই কি! জীবনের প্রাত্যহিক স্তরের উর্দ্ধে উঠিতে না পারিলে কোন বস্তু কাব্যের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ফুল প্রয়োজন সম্পর্কের অতীত—

ফুল কবিদের প্রিয়। তরকারী প্রয়োজন সম্পর্কের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত—কাব্যে তাহাকে কোন কবিই স্থান দিতে সম্মত নয়।

শুধু তরিতরকারী বলিয়া নয়, আহারের সঙ্গেও কাব্যের যেন তেমন মৈত্রী নাই। রোমান্টিক কবিদের কাব্য পড়িয়া দেখ বুঝিতেই পাইবে না—সেই সব কাব্যের নায়কগণ কখন খায়, বা কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। মাঝে মাঝে অবশ্য তাহারা পান করে—কিন্তু সে আবার সুরাপান, বা ফুলের মধু (একই কথা)। সুরাপান নেশা, তাহা প্রয়োজনের অংশ নয়। কিন্তু ডাল ভাত বা অন্যবিধ আহার্য্য গ্রহণের সংবাদ কদাচিৎ কবিরা দিয়া থাকেন। কবিরা নায়ক-নায়িকার বাঁচিয়া থাকাটাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহারা কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছে—সে তথ্যের জন্য মোটেই তাঁহারা চিন্তিত নন।

কিন্তু আহার্য্য-গ্রহণের কথা চাপিয়া না গিয়া প্রকাশ করিলে রোমান্টিক কবিতার সত্যই কি কোন ক্ষতি হইত? অন্ততঃ কবিরা তাই মনে করেন। তাঁহাদের ধারণা জীবনের সব কথা কাব্যের সামগ্রী নয়। জীবনবস্তু হইতে বাদসাদ দিয়া ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া কাব্যের সামগ্রী আহরণ করিতে হয়। তাঁহাদের কথানুসারে জীবন ও কাব্য সমায়ত নয়—জীবন ব্যাপকতর, তাহার সবটা কাব্যের কাঠামোতে ধরে না। কোন্ অংশটুকুকে তাঁহারা বাদ দেন? প্রাত্যহিক জীবন, প্রয়োজনের ছোঁয়াচ, আবশ্যকের আবর্জনাকে বাদ দিয়া জীবনকে তাঁহারা গ্রহণ করেন—কলঙ্ক ছাঁটিয়া চন্দ্রকে যেন ধরিবার চেষ্টা। তাই রোমান্টিক কাব্য জীবনের তৃষ্ণাকে মিটাতেই অসমর্থ।

এই অসামর্থ্য হইতেই বাস্তববাদিনী আধুনিকী কবিতার উদ্ভব। সে রোমান্টিক কবিতার ত্রুটি সংশোধন করিবার মানসে আর এক রকমের বৃহত্তর ত্রুটি করিয়া বসিয়াছে। রোমান্টিক কবিতা জীবনের সৌন্দর্য্যচয়ন করিয়া কাব্যরচনা করিয়াছে। বাস্তববাদিনী কবিতা তাহার বিপরীত প্রক্রিয়ায় জীবনের কলঙ্কগুলি বাছিয়া বাছিয়া মালা গাঁথিতেছে—সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার বড়ই বিরাগ! বাস্তব-বাদিনী কবিতাও জীবনের সমায়ত নয়। রোমান্টিক কবিতা যদি চাঁদের উজ্জ্বল অংশের মালা গাঁথিয়া থাকে, বাস্তববাদিনী গাঁথিতেছে কলঙ্কের মালা—কেহই পূর্ণ-চন্দ্রকে ধরিতে সমর্থ নয়। কেহই কি জীবন-তৃষ্ণা সম্পূর্ণভাবে মিটাইতে সমর্থ হইবে? রোমান্টিক কবিতা যদি ফুলের চাষ হয়—বাস্তববাদ কেবলই বেগুনের ক্ষেত।

ফুল ও ফল, সকলঙ্ক চন্দ্রের সন্ধানে তবে কোথায় যাইব? ক্লাসিকাল কাব্যে। কারণ ক্লাসিকাল কাব্যে প্রয়োজন ও প্রয়োজনাতীত মিলিত, জীবনের কোন অংশ সম্বন্ধেই তাহার দ্বিধা নাই—তাহা জীবনের সমায়ত। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডীসির নায়কগণ পানাহারে সঙ্কুচিত নয়; বরঞ্চ আহারেই তাহাদের আসক্তি যেন কিছু বেশী। ভীম তো মূর্তিমতী ক্ষুধা; ওডীসিয়ুস চরম বিপদের মধ্যেও নিয়মিত আহারের কথা কখনো ভুলিয়া যায় নাই। রোমান্টিক নন্দন তত্ত্বের ছাঁকনি দিয়া ছাঁকা জীবন হোমার-বাল্মীকির কাব্যের সামগ্রী নয় বলিয়াই সে কাব্য জীবন তৃষ্ণা মিটাইতে সমর্থ; তিন হাজার বছর ধরিয়া মিটাইতেছে—আরো তিন হাজার বছর মিটাইতে পারিবে। হোমারের কাছে বেগুন ও গোলাপ ফুল, অর্দ্ধ দগ্ধ মৃগমাংস ও কিন্নরকণ্ঠ সার্সি, সুরাপাত্র ও সুরানীল সিন্ধু, কলঙ্ক ও চন্দ্রের সমমূল্য। তাঁহার কাব্যের পরিধিও এতই উদার যে, সে রাজ্যে সকলেরই প্রবেশ আছে—কেহই সেখানে অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। হোমাবের কল্পনা তাঁহার সাইক্লপ্সের বিরাট বাহুর মতো সমগ্র পাহাড়টাকে লোষ্ট্রবৎ নিক্ষেপ করিতে সমর্থ। জীবন মৃত্যুর কোন রহস্যই তাহার অজ্ঞাত নয়। ক্লাসিকাল কাব্যেই কবিকল্পনার পূর্ণতা।

উজ্জয়িনীর গলি

উজ্জয়িনীর সেই গলিটি কি আমাদের পাড়ার এই পথটির চেয়ে অধিকতর মনোরম ছিল? সেই যে গলির মোড়ে দীপশিখাবাহিনী মালবিকা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কবিকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল! কবির কথা বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হয়—এমন সুন্দর পথ আর পৃথিবীতে নাই। সঙ্কীর্ণ বঙ্কিম পথ—দুই দিকে শ্বেত পাথরের বাড়ি; প্রত্যেক বাড়ির দ্বারে শঙ্খচক্রের মুদ্রা, দ্বারের পাশে নীপ তরু; আবার কোন কোন বাড়ির সিংহদ্বারে 'সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভভরে'। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার পূর্বেই গৃহস্বামিনীর পারাবতগুলি ফিরিয়া আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে—এতক্ষণে তাহারা তন্দ্রিত—তন্দ্রার শৈথিল্যে তাহাদের মুখ হইতে তণ্ডুলকণা স্খলিত হইয়া পড়িয়া পড়িয়া অঙ্গনে বিচিত্র রেখার সৃষ্টি করিতেছে। আর ময়ূর দুটি কলাপ সংযত করিয়া এক পায়ের উপর ভর করিয়া পালকে মুখ গুঁজিয়া দণ্ডায়মান। মন্দিরের শঙ্খঘণ্টা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ; অগুরুর গন্ধ ও সূক্ষ্ম ধূম্রজাল সমস্ত অঙ্গন ব্যাপিয়া বাসরের রহস্যময় যবনিকা টানিয়া দিয়াছে

—আর সৌধসঙ্কটের অবকাশে সন্ধ্যার তারাটি দীপ্যমানা। এমন সময়ে সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো সন্ধ্যাতারারূপ দীপশালিনী মালবিকা শুভ্র পাষাণের সোপানে সোপানে রক্তিম চরণের রক্তপদ্ম বিকশিত করিয়া নামিয়া আসিল। এমন সুন্দর আর কী আছে? ইহার চেয়ে সুন্দর আর কী হইতে পারে?

তবু এক-একবার মনে হয় আমাদের পাড়ার এই পথটাও কম সুন্দর নয়। প্রশস্ত পথের দুই দিকে পুষ্পতরু—আকণ্ঠ ফুলের ভারে অবনত। বকুল জারুল গুলমোর এবং ঝুমকো-লতা, আর আছে গোত্রহীন সোনা রঙের সোনাঝুরি ফুল! সন্ধ্যাবেলায় এখানে মহাকালের মন্দিরে আরতি ধ্বনি বাজে না বটে, কালাগুরুর গুরু-গন্ধও আকাশকে নিবিড় নীরন্ধ্রতায় ভরিয়া দেয় না সত্য, আর ভবন শিখী ও সযত্নে লালিত পারাবতের যুগও অনেক কাল গত। এখানকার বাড়িগুলি কলের ছাঁচে গঠিত—সব কেমন যেন অত্যন্ত কাটাছাঁটা—প্রয়োজনসাধনের অতিরিক্ত বাহুল্যবর্জিত। আর পথটাও বঙ্কিম নয়, সঙ্কীর্ণ তো নয়ই। তবু এ পথ অসুন্দর এমন বলি কি করিয়া?

আর হায়, হায়, যত বড় মহাকবিই আসুন না কেন—তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কোন মালবিকা দীপ হাতে করিয়া যে অগ্রসর হইয়া আসিবে তাহার সম্ভাবনা মাত্রও নাই। তবে কি এখানে মালবিকার সগোত্রদেরই অভাব? তাহা নয়। মালবকন্যাদের এখানে দেখা পাওয়া যাইবে কেমন করিয়া? কিন্তু গৌড়কন্যা গৌড়িনীদের অভাব নিশ্চয়ই নাই। কিন্তু কবির প্রতি তাহাদের যে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে—এমন কেহ বলিতে পারে না। বরঞ্চ ফুটবল খেলা শেষ করিয়া বিজয়ী খেলোয়াড়টি ফিরিলে নিশ্চয় কোন-না-কোন গৌড়িনী তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লয়—হাতে তখন তাহার দীপশিখা থাকে না—বৈদ্যুৎ আলোর টর্চের বাতি থাকিলেও থাকিতে পারে। এ কালের গৌড়িনীর পোষাক পরিচ্ছদ এবং প্রসাধনকলা যে সেকালের মালবিকার সঙ্গে মিলিবে এমন আশা করা উচিত হইবে না—তবু যে একালের গৌড়িনী সেকালের মালবিকার চেয়ে কম সুন্দর ইহা ফুটবল খেলোয়াড়টির সাক্ষ্য ছাড়াও বিশ্বাস করা চলিতে পারে।

আমি মোটা কলমে একালের সন্ধ্যার একটি বর্ণনা দিলাম—কবির সূক্ষ্ম কলম চলিলে তাহা আরও না জানি কত সুন্দর হইত! আসল কথা সৌন্দর্য্য বস্তুতে নাই—কবিদের লেখনীর গোমুখীই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কবিরা সৌন্দর্য্যের ভগীরথ।

সত্য কথা বলিতে গেলে বলিব, উজ্জয়িনীর গলিটি অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন, ঈষৎ দুর্গন্ধময়, বাঁকাচোরা একটি নোংরা গলি ছাড়া আর কিছুই নয়—অনেকটা কাশীর বিশ্বনাথের গলির মতো আর কি।

তবে কেন এমন হয়? বস্তুতঃ যাহা অত্যন্ত সাধারণ কাব্যে তাহা অসাধারণ বলিয়া প্রতিভাত হয় কেন? কাব্যের বিশেষ গুণেই বস্তুর অসুন্দর কাব্যে সুন্দর হইয়া ওঠে। শুধু কাব্যশিল্পে নয়—শিল্পমাত্রেরই ইহা বিশেষ গুণ। সেই বিশেষ গুণটির স্বরূপ কি—যাহার ফলে জীবনের অসুন্দর কাব্যে সুন্দরত্ব লাভ করিতেছে। ইহাকে পূর্ণতা বলা যাইতে পারে। শিল্প ও জীবনের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব কল্পনা করিয়া লইয়া পণ্ডিতজনেরা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিতণ্ডা চালাইয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাহার হেত্বভাব। শিল্প ও জীবন পরস্পর প্রতিযোগী নয়—পরস্পর পরিপূরক। জীবন-সেতুর ছায়া জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াই সেতুচক্রকে পূর্ণতা দিতেছে। মানুষের কল্পনা ও অনুভূতি সেই জলাশয়—জীবনসেতু সেই জলাশয়ে প্রতিফলিত না হওয়া অবধি জীবন অসম্পূর্ণ। কল্পনা ও অনুভূতির মানস-সরোবর বাস্তব-সেতুর পরিপূরকভাবে আর একটি শিল্পসেতু রচনা করিয়া সেতুচক্রকে সম্পূর্ণতা দান করিতেছে। একমাত্র শিল্পে বা একমাত্র জীবনে পূর্ণতা নাই। উজ্জয়িনীর গলি বাস্তবে অসম্পূর্ণ—তাহার উপরে শিল্পের মহিমা প্রতিফলিত হওয়াতে তাহাকে পূর্ণ অর্থাৎ সুন্দর মনে হইতেছে। আমাদের পাড়ার পথটাও বাস্তবে অসম্পূর্ণ—কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার উপরে কবিদৃষ্টির পুষ্পবৃষ্টি না হওয়াতে তাহা পূর্ণ হইয়া ওঠে নাই—অর্থাৎ এখনো শিল্পের সৌন্দর্য্য লাভ করে নাই। তবে কি পূর্ণতা আর সৌন্দর্য্য অভিন্ন? পূর্ণতাই সুন্দর। কিন্তু সে আবার কেমন কথা? পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র সুন্দর বলিয়া কি চতুর্থীর চন্দ্রকলা সুন্দর নয়? চতুর্থীর চন্দ্রকলাও অবশ্য সুন্দর—কিন্তু একটা আসন্ন পরিপূর্ণতার পটভূমিতেই তাহার খণ্ডতা সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই পূর্ণতার পটভূমিচ্যুত হইলে অতিশয় সুন্দরও আর সুন্দর নয়। রামচন্দ্রের নীলোৎপল নেত্র অবশ্যই সুন্দর ছিল—কিন্তু সেই নেত্র ছিন্ন করিয়া দেবী পদতলে উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্পমাত্রেই দেবী কেন অপহৃত পদ্মফুলটি ফিরাইয়া দিলেন তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছে কি? উৎপাটিত নীলোৎপল নেত্র আর সুন্দর নহে—অসুন্দরের উপহার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই দেবী পদ্মটি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

জীবনে যাহা অসুন্দর মানুষকে তাহা গ্লানি দেয়—কারণ তাহাতে পূর্ণতার

আভাস নাই। কিন্তু সেই অসুন্দর যখন শিল্পসত্তা লাভ করে তখন তাহার দিক্‌ হইতে দৃষ্টি ফিরিতে চাহে না। বাস্তবে যে-অভাব তাহার ছিল, শিল্পের মাধ্যমে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। বাস্তবে যে-দৃশ্য দেখিয়া বলি—কি কুৎসিত, শিল্পে তাহাকে দেখিয়া বলি—কি সুন্দর কুৎসিত। এমনি ভাবে প্রতিনিয়ত বাস্তব শিল্পে দ্বিজত্ব লাভ করিতেছে এবং শিল্প বাস্তবে দ্বিজত্বলাভ করিতেছে। কাহাকেও ছাড়িয়া কাহারো বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। উজ্জয়িনীর গলি বস্তুতঃ যেমনি হোক কবি-কল্পনার ত্রিশিরা কাচের মাধ্যমে পরিদৃষ্ট বলিয়া তাহা সুন্দর; আর আমাদের পাড়ার পথটির উপরে সেই দৃষ্টি এখনো পড়ে নাই বলিয়া তাহা বাস্তব মাত্র—তদধিক কিছু নহে।

সুখের প্রকৃতি

পাঠক, সংসারে সুখী হইবার উপায় কি? আমি জানি না বলিয়াই তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমি যে তোমাদের আর দশজনের চেয়ে বেশি অসুখী, এমন মিথ্যা স্বীকারোক্তি করিতে চাই না। তোমাদের আর দশজনের মতোই আমার জীবন সুখদুঃখের ছক-কাটা সতরঞ্চের ছাঁচ। আমার মাথা দশজনকে ছাড়াইয়াও ওঠে নাই—আবার ভিড়ের মধ্যে তলাইয়া যাইবার মতোও নয়। যে-ছাঁচে বিধাতাপুরুষ সহস্রকে গড়িয়াছেন, আমিও সেই সাধারণ ছাঁচেই গঠিত। তুমি শুধাইতে পার—তা-ই যদি হয়, তবে আবার অপরকে প্রশ্ন করিবার কারণটা কি? এখানেই তো যত সমস্যা।

সংসারে সুখী আমরা অনেকেই। কিম্বা বলা উচিত যে, হরিণের চিত্রবর্ণ চর্মখানির মতো দুঃখের পটে সুখের ছিটেফোঁটা আমাদের অনেকেরই জীবনে পড়িয়াছে। আমরা সুখী না হইলেও কখনো কখনো সুখের স্বাদ পাইয়াছি। কিন্তু সে সবই যেন আকস্মিক! কেমন করিয়া হইল, কেমন করিয়া পাইলাম জানি না। সত্য কথা বলিতে কি, ব্যাপারটা যেন আমাদের আয়ত্তের বাহিরে। যদি তুমি পণ করিয়া বস যে, আজ তুমি সুখী হইবে—হইতে পারিবে কি? খুব সম্ভব না। হয়তো তোমার ওই প্রতিজ্ঞাই তোমার দুঃখের কারণ হইবে। জীবন-ধনুককে বাঁকাইয়া সুখের গুণ পরাইতে চেষ্টা করিলে দেখিবে—ধনুকখানাই ভাঙিয়া গেল—নয়তো ধনুকের দণ্ড ছিটকাইয়া উঠিয়া কণ্ঠবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ

করিলে। দুঃখ ইচ্ছা করিলেও মেলে, না করিলেও মেলে—কিন্তু সুখের প্রকৃতি তেমন নয়। ইচ্ছা করিলেই সুখ পাওয়া যায় না। তবে কখনো কখনো যে পাওয়া যায়—তাহা নিতান্তই আকস্মিক।

অথচ সুখের সাধনাই মানুষের মৌলিক সাধনা। দুঃখের আত্যন্তিক প্রভাবের ফলেই সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন—দুঃখের অবসান ঘটাইতে হইবে। কিন্তু পারিয়াছেন কি? দুঃখের প্রকৃতির পরিবর্তন সম্ভব নহে দেখিয়া তিনি মানুষকে নিজের প্রকৃতিটা বদল করিতে উপদেশ দিয়াছেন! বাসনার নিবৃত্তি ঘটিলেই নাকি দুঃখেরও নিবৃত্তি ঘটে। তোমার গোয়ালে গরু আছে দেখিয়া রাত্রে বাঘ আসে। তিনি বলিতেছেন, গোয়ালটাকে শূন্য করিয়া দাও, বাঘ আর আসিবে না। কিন্তু গোয়ালটাকে শূন্য করিয়া ফেলিলে গো রস পাইব কোথায়? গৌতম বলিলেন গো-রসের সুখ আর বাঘের দুঃখ দুটায় তৌল করিয়া দেখ—দুঃখের পাল্লাটাই ভারি—এ রকম ক্ষেত্রে গো-পালন বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। কিন্তু বাঘের হাত হইতে বাঁচিবার ইহাই কি একমাত্র সমাধান? গোয়ালটাকে লোহার শিক দিয়া রক্ষা করিলে বাঘের হাত হইতে কি পরিত্রাণ পাওয়া যায় না? গৌতম আর যাই হোন না হোন, তিনি রিয়ালিস্ট ছিলেন। তিনি সুখের কথা বলেন নাই, দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের সংবাদই দিয়াছেন। দুঃখ হইতে মুক্তি এবং সুখ কি এক বস্তু? হয়তো নয়। সংসারে খুব বেশি পাওয়া যায় তো ওই দুঃখ হইতে মুক্তিই সম্ভব। সুখ? কি জানি? অন্ততঃ গৌতম জানিতেন না।

উপনিষদের ঋষিরা আনন্দের আশ্বাস দিয়াছেন। আনন্দ ও সুখ কি এক পদার্থ? বোধ করি নয়। সক্রেটিস বিষপাত্র হাতে লইয়া সুখ পান নাই নিশ্চয়—অথচ তিনি ইচ্ছা করিলেই পালাইয়া গিয়া দুঃখের হাত এড়াইতে পারিতেন। তৎসত্ত্বেও তিনি পালাইলেন না কেন? বিষপান করিতে গেলেন কেন? তিনি যেভাব অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাকেই কি তবে আনন্দ বলে? উপনিষদের আনন্দ, বৌদ্ধদের দুঃখমুক্তি আর সংসারের সুখ—তবে কি একই বস্তুর প্রকার-ভেদ, না তিন ভিন্ন প্রকৃতির বস্তু? দর্শনের এই জটিল গ্রন্থিমোচনের ক্ষমতা আমার নাই—তবে ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে, এই তিনের মধ্যে অধিকাংশ সাংসারিক জীব সুখ চায়—এবং অধিকাংশ জীব সেই সুখ পায় না। অর্থাৎ সুখটাই একাধারে গণতান্ত্রিক কামনা এবং গণতান্ত্রিক ব্যর্থতা!

সুখ ও দুঃখের প্রকৃতি সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জোর করিয়া বলা চলে যে, দুঃখই জীবনের নিয়ম, আর সুখ তাহার ব্যতিক্রম; দুঃখই অভ্যস্ত, সুখ আকস্মিক, দুঃখ কর্ণের কবচের মতো সহজাত আর সুখ অর্জুনের পাশুপাত-অস্ত্র লাভের মতো ব্যক্তিগত সৌভাগ্য—দুঃখের কালো আকাশে সুখ—তারার ছিটেফোঁটা। সুখের কপোত অতর্কিতে তোমার এক জানলা দিয়া প্রবেশ করিয়া পরমুহূর্তে আর আর এক জানলা দিয়া প্রস্থান করিবে। ইচ্ছা করিলেও সে যেমন আসিবে না, ইচ্ছা করিলেও সে তেমনি থাকিবে না!

এমন চঞ্চল, অনিত্য বস্তুর জন্য মানুষের কেন যে আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারি না —অথচ মানুষ নাকি 'র‍্যাশনাল' অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন জীব!

সুখ মানুষের জীবন পরিধিকে তির্য্যকভাবে স্পর্শ করিয়া করিয়া চলিয়া যায়। পিছলিয়া চলিয়া যাওয়াই তাহার ধর্ম। দুঃখের বনস্পতির শিরোদেশে সুখের ফুলটি—ট্রেণ ছাড়িবার আগের শেষ পাঁচ মিনিটের মতো হয়তো ফুটিয়া আছে ' যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি ক্ষণিক! সুখের আকস্মিক তূলি প্রচণ্ড দ্বিপ্রহরের রৌদ্রকে চন্দ্র কিরণে পরিণত করিয়া দিতে পারে, কলিকাতার মলিন রাজপথে ধাবমান ফিটন গাড়িখানিকে কুসুমপুরের রাজস্যন্দনে পরিণত করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়! আবার বহুযত্নে সংগৃহীত ফুলের বহু যত্নে গ্রথিত মালা লৌহ ফাঁসির দার্ঢ্য লাভ করিয়া প্রাণটাকে কণ্ঠগত করিয়া তুলিতেও তাহার এক মুহূর্তের অধিক সময় লাগে না! ইহাই সুখের পরিহাস। সুখ যদি জীবনের নিয়ম হইত তবে দুঃখকে বলিতাম তাহার বিকার—যেমন দুগ্ধের বিকার দধি। কিন্তু তাহা তো নয়। দুঃখের অঙ্গুরীয়ে প্রদীপ্ত চূণির মতো সুখের কণা দীপ্যমান। সেই কণাটির প্রতিই মানুষের এত লোভ! সেটুকু পাইলে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যই বা সে কী প্রয়াস! কিন্তু পিচ্ছিল রত্ন কখন যে অতল জলে স্খলিত হইয়া পড়ে! মানুষ একাধারে শকুন্তলা ও দুষ্যন্ত—এক অর্দ্ধ অপরার্দ্ধেব হাতে সুখের অঙ্গুরীয় তুলিয়া দিতেছে—অপরার্দ্ধ তাহা হারাইয়া ফেলে—তখন দুই অর্দ্ধের পরস্পরের জন্য সে কী রোদন! সুখের অঙ্গুরী যত যত্নেই রক্ষা কর না কেন—সফলতার সম্ভাবনা নাই—দুঃখের দুর্বাসা দেশ-কাল-পাত্রের সর্ববাধাবিজয়ী।

শিব ও দক্ষ

আমাদের পুরাণে শিব কর্তৃক দক্ষযজ্ঞ নাশের একটি উপাখ্যান আছে। শিব ধ্বংসের দেবতা আর দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে যাঁরা বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। এই কাহিনীটিকে নিছক কাহিনীমাত্র মনে করিবার কারণ নাই। বস্তুতঃ পুরাণের কোন কাহিনীই নিরর্থক গল্পমাত্র নহে। প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি করিয়া গূঢ়ার্থ আছে; এই গূঢ়ার্থ না জানা অবধি পুরাণের ইঙ্গিত বুঝিতে পারা যাইবে না। তা ছাড়া এই কাহিনীগুলি এমন কৌশলে রচিত যে প্রত্যেক যুগ তার বিশেষ সমস্যাকেও এই কাহিনীগুলিতে খুঁজিলে পাইতে পারে। এমন যে হয় তাহার কারণ সমস্যা যতই অভিনব হোক না কেন, বিশেষ কালের গ্রন্থিতে যুক্ত হোক না কেন, তাহার বাহ্য প্রভেদের অন্তরে কোথাও একটা চিরন্তন সঙ্কেত আছে। জ্ঞানের বিচিত্র শতদলগুলি যেমন একটিমাত্র বৃন্তে গ্রথিত, সমস্যার বৈচিত্র্যের তলেও তেমন একটিমাত্র বৃন্ত আছে।

এখন শিব কর্তৃক দক্ষযজ্ঞ নাশের কাহিনীটির মর্মার্থ কি? শিব শব্দের অর্থ The good আর দক্ষ শব্দের অর্থ The efficient—অর্থাৎ শিব সাধু আর দক্ষ নিপুণ। নিপুণ বলিয়াই দক্ষ এমন বিশ্বসৃষ্টির কর্তা, আর শিব সাধু বা কামনা-রহিত বলিয়াই সেই বিশ্বকে অনায়াসে ধ্বংস করিতে পারেন। সৃষ্টি ও বিনাশের মধ্যে যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব নিহিত—তাহারই আভাস শিব কর্তৃক দক্ষ প্রজাপতির বিনাশে।

কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটি সমস্যার ইঙ্গিত এই কাহিনীতে আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সে সমস্যা বিশেষ করিয়া বর্তমান যুগেরই বস্তু। এ যুগে আমরা কি দেখিতেছি? দেখিতেছি এই যে, নানা কার্য্যকারণের ফলে The good and The efficient-এর মধ্যে একটা ক্রমবর্দ্ধমান পার্থক্য বাড়িয়া যাইতেছে—আর তাহার ফাঁক দিয়া মানবসমাজ ক্রমশঃ নীচের দিকে তলাইতে সুরু করিয়াছে। মানুষের সমাজে সাধু লোক আছে এবং নিপুণ লোকেরও অভাব নাই—এমন সব সময়েই ছিল। কিন্তু এ যুগের বিপদ এই যে, সাধুত্বের চেয়ে নিপুণতার দিকেই মানুষের যেন বেশি ঝোঁক এবং তারই ফলে সমাজের ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে নিপুণ ব্যক্তির হাতে গিয়া পড়িতেছে। আর নিপুণতা বা efficiency-ই যেন জীবনের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে।

একটা ঘরোয়া দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সাধু ব্যক্তির হাতে টাকা কল্যাণকর শক্তি, কিন্তু সেই টাকা কেবলমাত্র কর্মদক্ষ ব্যক্তির হাতে গিয়া পড়িলে তাহা বিষাক্ত হইয়া ওঠে। শুনিতে পাই যুদ্ধের বাজারে কর্মকুশলী ব্যক্তিরা চোরা বাজারে কারবার করিয়া লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা ঘরে তুলিয়াছে। সাধু ব্যক্তিরা এই সংবাদ কানাঘুষায় শুনিয়াছে মাত্র। টাকা করিবার রীতিই এমন যে সাধু ব্যক্তি স্বভাবতঃই সে পথে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হয়। চোরাবাজারে টাকা করিবার কথা তো সাধু ব্যক্তির কল্পনাতীত। এখন টাকা যে প্রকাণ্ড একটি শক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই শক্তি নিপুণ ব্যক্তির হাতে সঞ্চিত হইলে সাধারণের যে কি অমঙ্গল হইতে পারে—তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

আর টাকাই বা কেন? রাষ্ট্রশাসনের পথটাও সাধু ব্যক্তির পক্ষে সুগম নয়। কোনকালেই ছিল না—এখন তো রীতিমত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। যে পথে সাধু ব্যক্তি যাইতে দ্বিধাবোধ করেন, সোল্লাসে এবং সোৎসাহে নিপুণ ব্যক্তি সেই পথে অগ্রসর হইয়া যায়। ফলে তাহারাই এখন রাষ্ট্রের কর্ণধার।

তারপরে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তোলা যাইতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যেও মহত্ত্বের আদর্শ বিরাজিত থাকা উচিত। ব্রাহ্মণের জ্ঞানযোগ, ক্ষত্রিয়ের আর্তত্রাণের মতো ব্যবসা কর্মযোগ ছাড়া আর কিছু নয়; ব্যবসা সমাজসেবার একটা অঙ্গ মাত্র। সেইজন্যই ব্যবসাকেও চতুরাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল —নতুবা ব্যবসায়ে লক্ষ্মীর বাস এমন অদ্ভুত কথা বলা হইত না। কিন্তু এখনকার কোন ব্যবসায়ীকে এসব কথা বলিলে সে বক্তার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিবে। ব্যবসা-বাণিজ্যও সাধু ব্যক্তির নিশ্চয় এক সময়ে সুগম ছিল। কিন্তু এখন কি অবস্থায় তাহা আসিয়া পড়িয়াছে। সাধুবণিক বা নিষ্কামবণিক— নিতান্ত ব্যঙ্গ রসিক ছাড়া আর কাহারো পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়।

সমাজের যে দিকেই তাকাই না কেন, সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বত্র একটা অকল্যাণকর দ্বৈতনীতি বিরাজমান। সাধুত্ব ও নিপুণত্ব সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া জীবনের দুই বিপরীত পারে গিয়া পড়িয়াছে। সাধুত্ব পরাজিত, নিপুণত্ব বিজয়ী।

এমন যে হইয়াছে, তার কারণ মানবসমাজে Intellect ও Faith-এর মধ্যে একটা বিরাট্ পার্থক্য দেখা দিয়াছে। বুদ্ধি ও বিশ্বাস দুটিই মানুষের সহায় এবং কল্যাণকর, যদি এ-দুটি পরস্পরের সমন্বয়ে চালিত হয়। কিন্তু অবস্থা এমন

দাঁড়াইয়াছে যে, বুদ্ধি ও বিশ্বাস যেন পরস্পর-বিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বাসবর্জিত বুদ্ধি un-moral, তাহার শুভাশুভ জ্ঞান নাই, হাতের কাজটি সে সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করে; নিপুণভাবে সম্পন্ন হইল কিনা তাহাই একমাত্র তাহার বিচার্য্য। আবার বুদ্ধিরহিত বিশ্বাস অস্ত্রহীন যোদ্ধার মতো তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে মাত্র—কাজটি সুসম্পন্ন করিবার শক্তি তাহার লোপ পাইয়াছে। তা ছাড়া লক্ষ্য ও পন্থার মধ্যে ভেদবিচারও তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। পন্থার বিচার করিয়া চলিতে গেলে চলা স্বভাবতঃই মন্থর হয়—তাই সাধুত্ব মন্থর, দ্বিধাগ্রস্ত ও সংশয়াকুল। কিন্তু বুদ্ধির ওসব বালাই নাই বলিয়া সে অনায়াসে অগ্রসর হইয়া যায়—ফলে সংসারের সব কাম্যফল তাহার হস্তগত হইতে বিলম্ব হয় না।

ইউরোপে বুদ্ধি ও বিশ্বাসের এই ভেদের সূচনা রেনেসাঁসের যুগে। মধ্যযুগ এ দুই বিপরীতকে মিলাইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছিল—সেইজন্য মধ্যযুগ আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু সে যুগ আবার এমন অকল্যাণের বিষেও পূর্ণ হইয়া ওঠে নাই। এযুগে যাহাকে আমরা প্রগতি বলি, তাহা প্রেমের প্রগতি নয়, তাহা প্রেমবহিত জ্ঞান এবং বিচাররহিত বুদ্ধির প্রগতি। সেইজন্যই এযুগে Knowledge is Power. মধ্যযুগে নিশ্চয় লোকে বলিত Knowledge is Love. ইউরোপীয় আদর্শের এই আবহাওয়া আমাদের দেশে আসিয়া পৌঁছিয়া আমাদের মনকেও লুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে—আমরা শিবকে বর্জন করিয়া দক্ষের নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছি।

কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, আমাদের দেশ কোন কালেই দক্ষতাকে, বিচারহীন বুদ্ধিকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করে নাই—এ দুটাকে মিলাইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছে। আর এ দুটোর কোনটাকে পরিত্যাগের প্রশ্ন উঠিলে বুদ্ধিকে পরিহার করিয়া বিশ্বাসকে যে রাখিতে হইবে—সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র দ্বিধা কখনো ঘটে নাই। বরঞ্চ, সাধুত্বের কাছে দক্ষতা পরাজিত হোক, এই ছিল তাহার জীবনাদর্শ। সেই আদর্শেরই পৌরাণিক রূপ শিবের হাতে দক্ষের বিনাশ। শিব The good আর দক্ষ The efficient। শিব সাধু ও দক্ষ কর্মনিপুণ, শিব বিশ্বাস, দক্ষ বুদ্ধিমাত্রসহায়। এ দুইয়ের সমন্বয়ই যে প্রাচীন জীবনাদর্শ ছিল তাহার ইঙ্গিত আছে দক্ষের কন্যার সহিত শিবের পরিণয়-বন্ধন-প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু সে সমন্বয় যদি কোন কারণে ছিন্ন হইয়া যায়—তবে যে শিবের হাতে দক্ষের পরাজয় হইবে, পুরাণকার ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ছায়ামূর্তি

হিরোশিমার দগ্ধ প্রান্তরে ছায়ামূর্তি দেখা দিতেছে। সেই যে বিদ্যালয়গামিনী বালিকাটি—বিদ্যালয়ে পৌছানো আর যাহার হইয়া উঠিল না। একটি গোরুর গাড়ি চলিয়াছে, মন্থর গোরুর গাড়ির চলার আর শেষ নাই। আর নদীর সাঁকোর উপরে একজন শ্রমিক, যাহার পায়ের প্রত্যেকটি আঙুল স্পষ্ট দৃশ্যমান! বাস্তবে সে কি এমন প্রত্যক্ষ ছিল? যেদিন হিরোশিমার আকস্মিক প্রলয় বিস্মিত জগতের উপরে আধ্যাত্মিক আণবিক বোমার মতো নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেদিন তো এমন করিয়া মনটাকে নাড়া দেয় নাই। লোকে কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল —এই মাত্র! কিন্তু তারপরে আজ যখন ছায়ামূর্তি আবির্ভাবের সংবাদ আসিল— তখন মনটা এমন আলোড়িত হইয়া উঠিল কেন? জীবনের চেয়ে জীবনোত্তর জগৎ, মৃত্যুর চেয়ে প্রেতরাজ্য, বাস্তবের চেয়ে ছায়ামূর্তির আকর্ষণ কি তবে অধিক? কেন, অধিক? তাহা জানি না। তবে মৃত হিরোশিমার একমাত্র প্রতিনিধিরূপে ওই ছায়ামূর্তি মনের সমগ্র করুণার দাবী লইয়া আজ সমুপস্থিত।

কিছুকাল আগেও হিরোশিমা শহরের নাম পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই জানিত না। আর জানিলেই বা কি! পৃথিবীর অগণ্য শহরের তালিকায় একটি নামরূপে মাত্র তাহার অস্তিত্ব ছিল। একটি নাম, একটি সংখ্যা আর কিছু নয়। কিন্তু আজ ওই নাম ও সংখ্যার একমাত্র অবশিষ্ট ওই ছায়া-বালিকাটি! তাহার দাবী আজ হৃদয় মিটাইতে পারিতেছে না কেন?

হৃদয়ের উপরে সমষ্টির কোন দাবী নাই। ব্যক্তি ছাড়া হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। ধ্বংসের দুঃখের তাপে সমষ্টি-হিরোশিমা নির্য্যাসিত হইয়া একটি ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছে, তাই হিরোশিমার ছায়া আজ কায়ার চেয়েও অধিকতর বাস্তব।

পৃথিবীতে মানুষ দুই শ্রেণীর, নির্গুণ ও সগুণ। তোমার আমার কাছে নির্গুণ মানুষের অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে, কিম্বা নামে-মাত্র আছে, সংসারের অদৃশ্যপ্রায় দূরগত পটভূমিরূপেমাত্র আছে। সেই পটভূমির উপরে যে কয়টি স্বল্পসংখ্যক লোকের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় কেবল তাহারাই তোমার আমার কাছে সত্য, তাহাদেরই বলি সগুণ মানুষ। নির্গুণ মানুষের বাসস্থান বুদ্ধির জগতে আর সগুণ মানুষের বাস হৃদয়ে। বুদ্ধি নিজেই তো নির্গুণ, হৃৎবৃত্তি সগুণ। বুদ্ধি বলে—'মানুষ মরে', তাহাতে কি দুঃখ হয়? কিন্তু মৃত্যু যেদিন অতর্কিত ব্যাধের মতো আমাদের গৃহে প্রবেশ করিয়া অব্যর্থ

শরসন্ধান করে—সেদিন 'মানুষ মরে' এই নিগুর্ণ বৌদ্ধিক সত্য সগুণ হার্দিক সত্যরূপে দেখা দেয়, সেদিন চোখের জলের আর অন্ত থাকে না। শুধু তুমি আমি নই, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কাছেই স্বল্পসংখ্যক কয়েকটি পরিচিত ব্যক্তি ছাড়া বৃহৎ মনুষ্য-সমাজ একটি নামমাত্র, একটি ধূসর যবনিকা মাত্র, একটি দূরগত পটভূমি ছাড়া আর কিছু নয়।

মানুষের বুদ্ধি আর হৃদয়ের চৌহদ্দি সমান মাপের নয়। বুদ্ধি বিস্তৃত, হৃদয় সঙ্কীর্ণ। কিন্তু সঙ্কীর্ণ বলিয়া নিন্দনীয় নয়। এ সঙ্কীর্ণতা ঘটের সঙ্কীর্ণতা। বুদ্ধি যেন সরোবর, হৃদয় যেন ঘট। সরোবরের জলে তৃষ্ণা মেটে, কিন্তু জল আর তৃষ্ণার মধ্যপথে রহিয়াছে ঐ ঘটখানা। ঐ ঘটের ঘটকালি না হইলে তৃষ্ণার পানীয় ঘরে আনিব কি উপায়ে। এখন, বুদ্ধি আর হৃৎবৃত্তিতে এই অসামঞ্জস্য রহিয়া গিয়াছে বলিয়াই পৃথিবীতে দুঃখদুর্দৈবের অন্ত নাই।

বুদ্ধি নূতন নূতন মারণাস্ত্র রচনা করিতেছে, হৃদয় বলে ক্ষতি কি? ওগুলো তো অপর দেশে প্রযুক্ত হইবে। তোমার আমার কাছে নিজের দেশ অপর দেশের চেয়ে সত্য। আমার দেশেও প্রযুক্ত হইতে পারে জানিলে কি মানুষে মারণাস্ত্র এমন নিশ্চিন্ত মনে প্রস্তুত করিতে পারিত? আণবিক বোমা জার্মানীতে নিক্ষিপ্ত না হইয়া যে জাপানে হইল তার কারণ মিত্রপক্ষের নিকটে জার্মানীর অস্তিত্ব জাপানের চেয়ে অধিকতর সত্য। জাপানের সঙ্গে যোগ কেবল বুদ্ধির যোগ, জার্মানীর সঙ্গে যতই শত্রুতা থাক, হৃদয়ের স্পর্শও আছে। হৃদয় আর বুদ্ধিতে মানুষের কিছুতেই খাপ খাইতেছে না—বরঞ্চ দুইয়ে অসঙ্গতি যেন ক্রমেই বাড়িবার দিকে। মানুষের বুদ্ধির জগৎ যতই বৃহত্তর হইতেছে, তাহার হৃদয়ের জগৎ ততই সঙ্কীর্ণতর হইয়া পড়িতেছে। বুদ্ধিতে হৃদয়ে হের-ফের না ঘুচিলে মানুষের আর নিস্তার নাই।

কিন্তু হিরোশিমার ছায়ামূর্তির কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। মিত্রপক্ষ জাপান জয় করিয়া যখন আত্মপ্রসাদের পরিপূর্ণ ভোজে বসিয়াছে—তখন একি অবাঞ্ছিত আবির্ভাব—ম্যাকবেথের ভোজের সভায় Banquo-র প্রেতাত্মার মতো! Banquo-র মতো? তবে কি তাহার উত্তরপুরুষের মতো ওই বালিকাটিরও উত্তরপুরুষ ম্যাকবেথের প্রত্যাশিত সিংহাসন দখল করিয়া বসিবে? অসহায় ও পরাজিতের জন্যই কি পৃথিবীর সিংহাসন অপেক্ষা করিয়া আছে? ওই নিঃসঙ্গিনী বালিকার মূর্তি নীরব বাক্যে খুব সম্ভবতঃ এই কথাই বলিতে প্রয়াস পাইতেছে।

ফুলের আহ্বান

লালদীঘির বাগানে বড় ডাকঘরের ঠিক সম্মুখেই একটি পলাশগাছ ফুলের ভারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাহারো চোখে পড়িয়াছে কি? হাজার হাজার লোক এই অঞ্চলে নিত্য যাতায়াত করে। অফিসে সময় মতো পৌছিবার তাহাদের তাড়া আবার অফিস হইতে ক্লান্ত দেহে বাহির হইয়া ট্রাম ধরিবার তাহাদের তাড়া —এদিকে-ওদিকে তাহাদের তাকাইবার সময় কোথায়? ঠিক এই চোখের লক্ষ্যের উপরেই অথচ তাহাদের অগোচরে ইতিমধ্যে পলাশ-ফুলের গাছটা কোমল অগ্নি-শিখায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এত বড় সংবাদটা কেহ লক্ষ্য করিল না; কোন সাংবাদিকের এদিকে হুঁস মাত্র নাই। মানুষ যদি সভ্য হইত, কেবল সংসারের কল চালাইবার মিস্ত্রী মাত্র না হইত—তবে ঋতু-পুষ্প আগমনের এই বৃহৎ সংবাদটা না লক্ষ্য করিয়া পারিত না। মানুষ আশানুরূপ সভ্য হইলে তাহাব সংবাদপত্রগুলি মোটা মোটা হেড লাইনে ঘোষণা করিত—'লালদীঘিতে পলাশ ফুল ফুটিল।'

কলিকাতায় বসন্তের আগমন কেহ ঘোষণা করে না। একেবারে ঘোষণা কবে না, এমন বলিতে পারি না, কিন্তু সে আর এক বসন্ত। ইতিমধ্যেই কলিকাতার দেয়ালে রক্তাক্ষরে লিখিত দেখিয়াছি—'শহরে বসন্ত দেখা দিয়াছে, টীকা লউন।' কিন্তু আমি তো সে বসন্তের কথা বলিতেছি না। আমি বলিতেছি সেই বসন্তেব কথা, যে-বসন্ত তরুশাখায় আপন আবির্ভাববার্তা পুষ্পাক্ষরে লিখিয়া দেয়। পলাশে, শিমুলে, করবী, কাঞ্চন, নাগ-কেশরের গন্ধে এবং বর্ণে। হাঁ, কলিকাতার জনারণ্যে অট্টালিকার বনস্পতির মধ্যেই ইহাদের সকলের আবির্ভাব হয়। দেবদারুর পাতা ঝরিয়া গিয়া শ্যামল কিশলয় দেখা দিতে থাকে; বাদামের পাতা রক্ত-চন্দনের রঙ ধরিয়া খসিয়া খসিয়া পড়ে; গুলমোরের সারি নূতন পাতায় শাখা সাজাইবাব জন্য একেবারে রিক্ত হইয়া ওঠে। এ সবই চল্লিশ লক্ষ লোকের আশি লক্ষ চোখের সম্মুখে ঘটিতে থাকে—কিন্তু কে দেখে? দেখুক আর নাই দেখুক এই পরিবর্তন ইন্দ্রজালের দ্রুতিতে ঘটিয়া যায়—কেহ দেখে না। ক্ষতি কার? 'লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি' নয় কি?

লালদীঘির গাছটায় পলাশ ফুল চোখে পড়িতেই ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িলাম। সেজন্য সোজা পথ ছাড়িয়া একটু বাঁকিয়া যাইতে হইল—তাহাতে আমার ক্ষতি হয় নাই। বিশেষ মহাকবির সতর্ক অনুরোধ যে কানে রহিয়া গিয়াছে—উজ্জয়িনীর

পথ একটু বাঁকা—কিন্তু না দেখিয়া যাইও না—উজ্জয়িনী না দেখিলে চোখ থাকা বৃথা। আমি কি সামান্য একটু ঘুরিয়া পলাশ ফুলের ঐশ্বর্য্য না দেখিয়া যাইতে পারি! গাছের তলা ঝরাফুলে ভরিয়া গিয়াছে; পথের ধূলায় আর ফুলের ধূলায় মাথামাখি। নীচে ফিরিওয়ালা বসিয়া চীনেবাদাম আর আখের টুকরা বেচিতেছে, পান-ওলা পান বেচিতেছে; লোকজনও আছে, কেহ কিনিতেছে, কেহ ট্রামের জন্য অপেক্ষমান। আমি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। ডালের উপরে স্তরে স্তরে কোমল আগুনের শিখার মতো ফুলের বিন্যাস, ফুলের স্তবকের সঙ্গে কালো কালো বৃন্ত, ধূম এবং শিখা একত্র। মনে পড়িল একটি গাছে যদি এত সৌন্দর্য্য হয়—তবে উত্তর ভারতের পলাশ বনে এতক্ষণ না জানি কি দাবানল লাগিয়া গিয়াছে! খাণ্ডবদাহনের ব্যাপক অগ্নিশিখাকে আকাশচারী কিন্নর মিথুন কি কিংশুকের রাসলীলা বলিয়া ভ্রম করে নাই? আবার সেই খাণ্ডবেরই কিংশুক-বিলাসকে বিহঙ্গদল কি দাবানল বলিয়া ভীত হইয়া ওঠে নাই? উত্তরাপথের বিশাল অরণ্যে যেখানে কিংশুকে শিমুলে, কৃষ্ণচূড়ায় মাতামাতি—সেই রক্তিমা আর শ্যামলিমার এমন অঙ্গাঙ্গী সংযোগ দেখিয়াই কি কবিরা বৃন্দাবনের হোরি খেলার কল্পনা করেন নাই? কিংবা পৌরাণিক জগতের সেই আদিম অরণ্যের কিংশুকে-আবৃত তরুশাখাকে উর্বশীর পরিত্যক্ত রক্তচেলাংশুক মনে করিয়া পুরূরবা কি একবারও চমকিয়া ওঠে নাই? অথবা চৈত্রের প্রসন্ন প্রভাতে রক্তকরবীর গাছটি যখন আপাদমস্তক হাজার ফুলে ভরিয়া যায়—তখন বৈদিক কবির কাছে তাহা কি অকস্মাৎ দেবরাজের নিদ্রোত্থিত সহস্রচক্ষুর প্রভা লইয়া দেখা দেয় নাই?

পাঠক তুমি হয় তো বলিবে, বৃথা কবিত্ব করিও না; ও কেবল দুর্বলতার লক্ষণ; তুমি হয় তো বলিবে ভাবালুতার যুগ গিয়াছে, এ বড় কঠিন সময়, এখন কবিত্ব তুলিয়া রাখ—এখন চাই শক্তি। আমিও শক্তি চাই, তাই ফুলের কথা তুলিলাম। ওই ফুলের শক্তি কত, তাহা কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ? ওই ফুলের মধ্যে যে-শক্তি, সহস্র আণবিক বোমাতেও তাহা নাই। আণবিক বোমা-বিধ্বস্ত নাগাসাকিতে আবার ফুল ফুটিবে; পৃথিবীর ক্ষতচিহ্ন চন্দ্রমল্লীর স্নিগ্ধ প্রলেপে আবার নিরাময় হইয়া যাইবে। পুরাতন পরিত্যক্ত পাষাণ অট্টালিকার কঠিন মুষ্টি ভেদ করিয়া শ্যামল অঙ্কুরের মাথা তোলা কি কখনো দেখ নাই? যে-শক্তিতে পাষাণ ভিন্ন হইয়া যায়, তাহা কি অবহেলার যোগ্য? মারাত্মক যন্ত্রের

নখ-বিদীর্ণ ইউরোপীয় রণক্ষেত্র কি ইতিমধ্যেই শ্যামল তৃণাঙ্কুরে কোমল হইয়া ওঠে নাই? পিরামিডের গুহার ভিতর হইতে হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন যবের দানা পরীক্ষার্থ মাটিতে উপ্ত হইয়া কি নূতন অঙ্কুররূপে উদ্গত হয় নাই? কি প্রচণ্ড শক্তি, কালজয়ী এবং দেশজয়ী। আর কোন জীবের পক্ষে কি ইহা সম্ভবপর হইত? এইতো 'রেজারেকশন!' আদিম প্রাণের পুনরভ্যুদয়।

পাঠক, সৌন্দর্য্যবিলাসী বলিয়া কবিদের অবজ্ঞা করিও না। শক্তি ও সৌন্দর্য্য—একই সত্তার অবস্থান্তর মাত্র। শক্তি অসম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্য শক্তির পূর্ণতা। শক্তি ও সৌন্দর্য্য সহোদর, যেমন বলরাম ও কৃষ্ণ। বলরাম নিছক শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তি অর্থাৎ সৌন্দর্য্য; একজন হলধর, একজন বংশীধর। পরীক্ষার দিনে দেখা গেল হল অক্ষম, আর কৃষ্ণের বাঁশরী মুহূর্তের মধ্যে ভারতযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ বীরের সারথির পাঁচনী যষ্টিতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। শক্তি পূর্ণতার অভিমুখে চলিয়াছে—কিন্তু এখনো লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে নাই। মানুষের শক্তি অসম্পূর্ণ; প্রকৃতির শক্তি সম্পূর্ণ—তাই তাহার নাম সৌন্দর্য্য। মানুষের শক্তি অস্ত্র, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ফুল। ফুলকে অবজ্ঞা করিও না।

প্রচণ্ড শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও রক্তকরবীর রাজা ছিল দুর্বল; যন্ত্রের উপরে ছিল তাহার আস্থা। তাই রাজার ভয় ছিল ঐ সুন্দরী নন্দিনীকে। নন্দিনীই রক্তকরবী। একদিকে যক্ষপুরী আর একদিকে রক্তকরবী; একদিকে রাজা আর একদিকে নন্দিনী; একদিকে শক্তি আর একদিকে সৌন্দর্য্য। জয় হইল কার? রাজাকে কি অবশেষে নন্দিনীর অনুসরণ করিতে হয় নাই? শক্তি সৌন্দর্য্যের অনুসরণ করিয়া পূর্ণতার মুখে যাত্রা করিল—হয়তো একদিন লক্ষ্যে পৌঁছিবে।

ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্য উর্বশীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন—শক্তির তপস্যা হইতে ঋষি যাহাতে 'সুখদুঃখ-বিরহ-মিলনময়' জীবনের পূর্ণতার দিকে যাত্রা করিতে পারেন। বিধাতাপুরুষ ঋতুতে ঋতুতে এত যে অসংখ্য ফুল পাঠাইয়া দেন মানুষের দরজার ঠিক পাশেই—তাহা কি একান্তই নিরর্থক? ফুল হাতছানি দিয়া মানুষকে ডাকে পূর্ণতার দিকে—সৌন্দর্য্য যাহার নামান্তর। মানুষ পৌরুষের অভিমানে শোনে না, শক্তির মত্ততায় দেখে না—কিংবা দেখিয়া শুনিয়াও তাহাকে ভুল বোঝে। কিন্তু বীরেরা বোঝেন, কবিরা বোঝেন। ফুলের মর্য্যাদা তাঁহারা জানেন।

"গুল্‌মোরের থোলো"

ভাবোন্মত্ত নগরকীর্তনীয়াদের উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বাহুর মতো গুল্‌মোরের শাখা দক্ষিণ বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে। সারিবদ্ধ গুল্‌মোরের বৃক্ষ সূর্য্যাস্তের অভ্রআবীরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া রক্তপুষ্পের ফাগ নিক্ষেপে নিযুক্ত। পথে পথে এই পুষ্প কীর্তনীয়ার দল। সুদীর্ঘ পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পুষ্পিত রক্তিম রেখা। অথবা নবীন বৈশাখে বনলক্ষ্মী যেন সীমন্তে সিন্দূর আঁকিয়া স্বচ্ছ সবুজ শাড়ীর গুণ্ঠন টানিয়া অপেক্ষা করিতেছে। কিংবা অপহৃতা জানকীর রক্তিম চীনাংশুকখানা আকাশপথ হইতে স্খলিত হইয়া তরুশিরে আজ সংলগ্ন। অথবা,—আর অধিক উপমায় প্রয়োজন কি? কয়েকদিন হইল কলিকাতায় গুল্‌মোরের ফুল ফুটিতে শুরু করিয়াছে—আর কয়েকদিনের মধ্যে এমন একটিও গুল্‌মোরের গাছ থাকিবে না, ফুলন্ত প্রলাপে যাহা প্রগলভ নয়। এপ্রিল, মে দুই মাস গুল্‌মোরের পালা। এপ্রিলের শেষে এমন হইবে যে ঝরা-ফুলের পাপড়িতে গাছের তলাকার ধূলা পর্য্যন্ত রঞ্জিত হইয়া উঠিবে, অবশেষে ফুলের রক্তিম আভা গাছের গুঁড়ি বেষ্টিত করিয়া একটি রক্তাভ ছায়াগোলক নিক্ষেপ করিবে। তারপরে বর্ষার প্রথম ধারাপাতের সঙ্গে ফুল ঝরিতে শুরু করিবে, শ্রাবণের মাঝামাঝি ঘনসবুজ পল্লব ছাড়া পুষ্প-প্রাচুর্য্যের আর চিহ্নটি পর্য্যন্ত থাকিবে না। ঋতুবিপর্য্যয়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া ঘনসবুজ ক্রমে ঘন শ্যামল, শ্যামল ক্রমে পাণ্ডুর এবং পীতাভ হইবে। তারপরে শীতের প্রারম্ভে পাতা ঝরিতে ঝরিতে শীতের শেষে বৃক্ষগুলির নগ্ন কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। তখন এই নাগা সন্ন্যাসীর দলের শুষ্ক ফলের চিমটার শব্দ নগর পরিভ্রমণের পালা। তারপরে কেমন করিয়া সকলের অগোচরে কঙ্কালে হরিৎরেখা দেখা দিতে থাকে, ক্রমে শীর্ণতা পত্রলেখায় ঢাকিয়া যায়। তারপরে অকস্মাৎ একদিন চোখে পড়ে—

> "প্রভাত বেলায় হেলাভরে করে
> অরুণ কিরণে তুচ্ছ
> উদ্ধত যত শাখার শিখরে
> কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছ।"

বাস্তবিক কোন ফুলে যদি অরুণ কিরণকে তুচ্ছ করিতে পারে তবে এই কৃষ্ণচূড়ার দল। কৃষ্ণচূড়া না গুল্‌মোর? কি এর নাম? গুল্‌মোর নামটিই

আমার পছন্দ। গুল্‌মোর মানে ময়ূরফুল। বাস্তবিক ময়ূরই বটে! ফুলগুলি ময়ূরের মতো পেখম মেলিয়া আছে, আবার পত্র-শ্যামল বৃক্ষটি ফুলের কলাপ বিস্তার করিয়া বাতাসের বেগে যেন নাচিতেছে। এমন করিয়া কোন ফুল আর আমাকে নাড়া দেয় না। ইহাতে যে প্রচণ্ডতা ও প্রাচুর্য্য, যে ঐশ্বর্য্য ও সম্ভোগ-রস আছে তাহা আর কোথায় পাইব। বাস্তবিক ইহার নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক পুষ্পমুষ্টি 'পরাণে ছড়ায় আবীর গুলাল', কিংবা কবি যদি ক্ষমা করেন, তবে

"ওড়না ওড়ায় পুষ্পের রঙে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।"

দিগঙ্গনাদের এপর্য্যন্ত দেখিলাম না, অপ্সরীদের দেখিবার সৌভাগ্যও ঘটিল না, কিন্তু তাহাদের নৃত্যচঞ্চল ওড়নার প্রান্ত দেখি নাই—ইহা কেমন করিয়া বলিব? বায়ুচঞ্চল গুল্‌মোরের ভঙ্গী যে নিপুণতমা নর্ত্তকীর পদক্ষেপকেও পরাজিত করে—ইহার অধিক আর কি দেখিতে পাওয়া যায়? ইহার অধিক কি কালিদাস, রবীন্দ্রনাথও দেখিতে পাইয়াছেন? তাঁহারা ওড়নার প্রান্তটুকু দেখিয়াই ওড়না-ধারিণীকে বুঝিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিক এই মানবসংসারের আসরেই দিগঙ্গনার নৃত্য, এখানেই অপ্সরীদের সঙ্গীত, পৃথিবীতেই স্বর্গ, গৃহের কোণেই বৈকুণ্ঠ এবং প্রিয়ার চোখেই মুক্তি।

মানুষের সংসারের প্রান্ত ঘেঁষিয়া প্রকৃতির সঙ্কীর্ত্তনের শোভাযাত্রা চলিয়াছে, বিশ্বজীবনের চিরন্তন ধূয়া তাহাদের সঙ্গীতে ধ্বনিত। আমরা শুনিয়াও শুনি না, দেখিয়াও দেখি না। কিন্তু একবার যে শুনিয়াছে, একবার যে দেখিয়াছে সে আর ভুলিতে পারে নাই। মানুষ জন্মিয়া অবধি ভালোমন্দ, আবশ্যক অনাবশ্যক, ছোটবড় কত না কাজ করিতেছে, ঠিক সেই সময়েই তাহার কানের কাছে 'তরুর তম্বুরা বাজে'। ঋতুতে ঋতুতে, ফুলে ফুলে, গন্ধেবর্ণে প্রকৃতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু মানুষ নাকি বড় ব্যস্ত, মানুষ নাকি বড় কর্ম্মী, তাহার এসব দেখিবার অবসর নাই। আদিম অরণ্য তাহার বনচ্ছায়ার ডুরে শাড়ীর অঞ্চল বিছাইয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহার পল্লবব্যজনী ক্লান্ত দেহের প্রতীক্ষায় উদ্যত হইয়াই আছে, কেবল মানুষের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা মাত্র। প্রকৃতির সহিত মানুষের বিচ্ছেদই জগতের আদিমতম বিরাটতম বিরহ। এই

বিরহের তাপেই মানবজীবন তপ্ত এবং অভিশপ্ত। এই মৌলিক বিরহই নানা আকারে মানুষের জীবনকে দুঃসহ দুঃখময় করিয়া রাখিয়াছে। জ্ঞানীরা যাঁহাকে প্রকৃতিপুরুষ বলেন, ভক্তেরা যাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ বলেন কবিদের কাছে তাহাই মানব ও প্রকৃতি। না জানি কোন্ দুর্জয় অদৃষ্টের অভিশাপে প্রকৃতি আজ খণ্ডিতা, মানুষ আজ মথুরায় ক্ষণকালের রাজগীতে নিযুক্ত। বিচ্ছেদের এই অভিশাপ কি ঘুচিবে না? আর কাহারো চোখে না হোক কবিদের চোখে অন্ততঃ ঘুচিয়াছে—তাই গুল্‌মোরের পুষ্পমুষ্টি তাঁহাদের

'পরাণে ছড়ায় আবীর গুলাল'

তাঁহারা প্রেমের দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও মানুষের নিত্যলীলা দেখিয়া ধন্য হন। আমরা দেখি আর না দেখি, আমাদেরই অঙ্গনের প্রান্তে নিত্যলীলা চলিতেছে—আমরা দেখি আর না দেখি, আমাদেরই চোখের সম্মুখে—

"অদ্যাপি করয়ে লীলা সেই শ্যামরায়
কোনো কোনো ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।"

কবিরা সেই ভাগ্যবানের অন্যতম।

শরৎ

আবার শরৎকাল আসিয়াছে। তপ্ত রৌদ্রের সোনালি সূতায় ভর করিয়া নীল আকাশের ঘুড়িখানা কোন উর্দ্ধে উধাও। উপরের দিকে চাহিয়া সারাক্ষণ তার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি—করিও তাই। শরৎকাল মানুষের দৃষ্টি আকাশের দিকে টানে—সোনার তবকেমোড়া ঘন নীল আকাশের দিকে। আমাকে যদি কেহ সমস্ত কাজের দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেয়—তবে আমি ওই আকাশের দিকে তাকাইয়া সমস্তটা দিন কাটাইয়া দিতে পারি। বৈষ্ণব কবিরা "আঁখি-পাখীর" কথা বলিয়াছেন, আমার দৃষ্টি একজোড়া চাতকের মতো ওই সূচীভেদ্য নীলিমার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। শরতের আকাশ আমাকে যেমন তন্ময় করিয়া ফেলে এমন আর কিছুই নয়। সমস্ত সংসার এবং সমগ্র বিশ্ব বিস্মৃত হইয়া আমার অস্তিত্ব একাগ্র শরের মতো ওই নীলিমার লক্ষ্য-বিন্দুতে আমূল অভিনিবিষ্ট হইয়া যায়। ইহার একমাত্র তুলনা অর্জুনের অস্ত্রপরীক্ষার সার্থক

তন্ময়তা। আমি বুঝিতে পারি, আমার দ্রোণাচার্য্য গুরু তাঁহার স্নেহময় হাস্যের দ্বারা আমাকে পুরস্কৃত করিতেছেন।

নীল রঙের মধ্যে একটি গভীরতা আছে। এ গভীরতা কোথা হইতে আসিল? আকাশ নীল, সমুদ্র নীল—তাহারই ফলে কি মানুষের মনে নীল রঙে গভীরতার বোধ জন্মিয়াছে। পৃথিবী সবুজ বলিয়াই কি সবুজ রঙের মধ্যে একটি প্রসারের ভাব প্রচ্ছন্ন? এ সমস্ত বর্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যার শক্তি আমার নাই—কেবল জানি শরতের নীল আকাশের গভীরতায় আমার বানচাল-হওয়া দৃষ্টি তলাইয়া যাইতে যাইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়।

কলিকাতার ঋতু শরৎ। বর্ষার সম্পদ্ তার উজ্জীবিত প্রকৃতি, হরিৎ ধরণী এবং অজস্র নদী-খাল-বিলের রজতময়ী জলমেখলা। কলিকাতায় তাহা কোথায়? শীতের সম্পদ্ নির্ঝরিত তাতরসির রৌদ্র, অবাবিত প্রান্তর, পাতা-খসানো বনস্পতি, দিগ্বধূর ঘন কালো দিক্‌চক্রলতার উপরে নীলাভ গুণ্ঠন-টানা মধ্যাহ্ন। কলিকাতায় তাহা কোথায়? আর কোথায়ই বা এখানে গ্রীষ্মের শ্বসিত-প্রশ্বাস কালবৈশাখীর চিত্রার্পিত প্রকৃতি? কলিকাতার বিশেষ ঋতু শরৎ। শরৎ এখানে যেমন অনায়াসে তাহার ঐশ্বর্য্য বিকাশ করিতে পারে—এমন আর কোন ঋতুই নহে। তার কারণ শরতের আসর পৃথিবী নয়, প্রান্তর নয়, অরণ্য নয়, শরতের আসর দ্যুলোক। নীচে পৃথিবী, উপরে আকাশ—মাঝখানে ছোট্ট একখানি ছাদ। এক-বার এই ছাদে উঠিলেই শরতের আসরের ঠিক মধ্যখানে যাইয়া বসিতে পারা যায়। সকাল বেলায় শিশিরের আভাস-মাখানো বাতাস, মধ্যাহ্নের নিজন নীলিমা, মেঘচাপা আতপ্ত অপরাহ্ণ—আর স্বচ্ছ রাত্রির নক্ষত্র-নত আকাশ! তবু কিনা বেরসিকে বলে—কলিকাতায় প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করে না।

কিন্তু এই শরৎ সাঁওতাল পরগনার মাঠে না-জানি কি মূর্তি ধরিয়াছে! সেখানে ঘাসে ঘাসে শিশিরবিন্দু, মাঠে মাঠে তৃণাঞ্জন, গাছে গাছে মৌন মাধুর্য্য, বনে বনে সুগন্ধি আর আকাশে বাতাসে ছুটির কানাকানি। কলিকাতার শরৎ আনন্দময়—কিন্তু 'to be there is very Heaven!'

কিন্তু হায় সশরীরে স্বর্গে যাওয়া সব সময় সম্ভব নয়। তাই কলিকাতার ছাদের উপরে বসিয়া শরতের লীলা দেখিতেছি। দ্যুলোকের দিগন্তবিস্তৃত শুভ্র আসরে হরগৌরীর অর্দ্ধনারীশ্বর লীলা। দেখিতেছি লঘু মেঘ ও লঘুতর কুয়াসা।

দেখিতেছি নীল আকাশ ও স্বর্ণাভ রৌদ্র, দেখিতেছি আকাশের নীলকণ্ঠ গ্রীবা বেষ্টন করিয়া গৌরীর গৌরবর্ণ বাহুলতা তপ্ত রৌদ্রে বিলম্বিত! ইহার চেয়ে মহত্তর দর্শনীয় আর কি থাকিতে পারে?

শকুন্তলার অঙ্গুরী

সাঁওতাল পরগনার একটি ছোট শহর। মাঠের মধ্যে বাড়িগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে বাড়ীগুলি নির্মাণে কোন পরিকল্পনা নাই। বস্তুতঃ তাহা নয়। মাঠ অসমতল, ঢেউ-খেলানো মাঠ দিগন্ত-বিসর্পী, যেন মাটির তরঙ্গ। একটি করিয়া তরঙ্গের চূড়া, তার পরেই খাদ; এমনি করিয়া খাদে-নিখাদে এখানকার জমির বিন্যাস। তরঙ্গের চূড়ায় কতকগুলি বাড়ি, মানুষের যত্নে রোপিত বৃক্ষেব বাগান। আব খাদের অংশে ধানের ক্ষেত, পাথব-চোয়ানো জলেব ছোট একটি ঝরণা, বৃহত্তর ঝবণাব অভিমুখে ধাবিত—সবগুলি ঝরণা বালু-শয্যাশায়িনী জয়ন্তী নদীতে করদান করিতেছে। প্রকৃতির অনায়াস অকৃত্রিম প্রয়াস আর মানুষেব কৃত্রিম চেষ্টা পাশাপাশি, গলাগলি সংস্থিত।

মাঠেব একটি তরঙ্গের চূড়া যেমন বাড়িঘরে ভরিয়া যায়, অমনি পরবর্তী তরঙ্গের চূড়ায় আবার বাড়িঘর উঠিতে থাকে—মাঝখানটার নিখাদ অংশের একান্তে সরু কাঁকর-ঢালা একটি লাল পথের সৃষ্টি হয়—দুইটি অদূরবর্তী পাড়ায় যাতায়াতের একমাত্র সূত্র।

ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের বাড়ি—কিন্তু প্রত্যেক বাড়িতেই একটি করিয়া বাগান। কতকগুলি গাছের এখানকার মৃত্তিকায় জন্মিবার একটি সহজ প্রবণতা আছে—পেয়ারা, আতা, পেঁপে, ইউক্যালিপ্‌টাস। কিন্তু যত্ন করিলে সব গাছই এখানে জন্মিতে পারে। আম, লিচু, কাঁঠাল, শাকসব্জী সবই। কেবল ফলের বাগান নয়—এখানকার মত এমন ফুলের বাগান বড় একটা দেখা যায় না। কলিকাতায় হয় তো আছে—কিন্তু তা এমন প্রত্যক্ষ নয়। মানুষের হাতের চিহ্নে আর উঁচু প্রাচীরের আড়ালে সে সব আচ্ছাদিত। বিলাতী মরসুমী ফুল হইতে আরম্ভ করিয়া জবা, টগর, কৃষ্ণচূড়া, বেল, কুন্দ, চাঁপা, বকুল আর গোলাপ। এখানকার বালু-জমি গোলাপের পক্ষে প্রশস্ত। কলিকাতার বাজারে সৌখিন গোলাপ নাকি এখান হইতেই চালান হইয়া যায়।

একটি পাড়ায় হয় তো কুড়িখানি বাড়ি। সারা বছর অধিকাংশ বাড়ি শূন্য। বাড়ির দরজা জানলা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পূজার ছুটির জনতার ধ্যান করিতে থাকে। শরৎ কালের প্রথম উত্তরে বাতাস উঠিতেই দরজা জানলা খুলিয়া যায়—ক্রমে বাড়িগুলি কলিকাতার আর্ত অধিবাসীদের ভিড়ে ভরিয়া উঠিতে শুরু করে। বস্তুতঃ শরৎ ও শীতই এখানকার ঋতু, জনসমাগমের ঋতু। বাকি কয়েক মাস—অনবচ্ছিন্ন প্রকৃতির রাজত্ব। তখন বাড়ির মালি আর পাড়ার রাখাল ছাড়া আর কেহ থাকে না। শরৎ ও শীত এখানকার মথুরার পালা, বছরের অবশিষ্ট এখানে চলিতে থাকে বৃন্দাবনের লীলা—রাখালের লীলাই তখনকার প্রধান সৌন্দর্য্য ও সম্পদ্।

শরৎকালের অভ্যস্ত-বর্ষণ শেষ হইয়া গেলে, আকাশের শেষ মেঘবিন্দু নিঃশেষে মুছিয়া গেলে অসীম শূন্য যখন অনন্ত নীলে ভরিয়া যায়, সোনার রৌদ্র যখন শূন্যতার উচ্চতম প্রান্ত হইতে গড়াইয়া দিক্‌বলয় অবধি আনমিত হয়, তখনকার প্রত্যেকটি দিন এক একটি অলৌকিক সোনার পিঞ্জর। পিঞ্জরের সোনালি শিকগুলির ঠিক বাহিরেই উচ্চাবচ সুনীল পাহাড়ের সারি, মরুভূমির মধ্যে মরুভূমির উষ্ট্রযূথের মতোই আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া দণ্ডায়মান। সকাল বেলার সূর্য্যরশ্মি ইহাদের মুখে সোনার বল্‌গা কষিয়া দেয়—আবার বিকালবেলা পড়ন্ত রোদ সাড়ম্বরে সেই রশ্মি প্রত্যাহার করে। আর সারাদিন এই মরুভূমির চির পথিকের দল, মরীচিকাপায়ী তৃষাতুরের দল—চঞ্চল মরীচিকা স্রোতের দিকে উন্মুখ হইয়া তাকাইয়া থাকে। উচ্চতম পাহাড়টির শৃঙ্গে কখনো কখনো মেঘ সংলগ্ন হয়, তখন সে মেঘের পতাকা উড়াইয়া দিয়া কাহার উদ্দেশ্যে কি সঙ্কেত বার্তা জ্ঞাপন করে!

নীচু জমিতে ধানের চাষ। কচি ধানের সবুজ শীষ—শ্যামল, গাঢ় শ্যামল, সোনালী-শ্যামলের ধাপ অতিক্রম করিয়া শেষে খাঁটি সোনায় পরিণত হইয়া আনমিত হইয়া পড়ে। প্রতিদিন সকালে সূর্য্যের কিরণ-উত্তরীয় লুটাইয়া পড়িয়া তাহার শীষ হইতে শিশিরবিন্দুটি মুছিয়া লয়। সারা দীর্ঘদিন সোনার ধানে আর সোনার রোদে যে সংলাপ চলিতে থাকে, কবিরা হয় তো তাহার সংবাদ দিতে পারেন।

এইখানে মাঠের মধ্যে আসিয়া আমি দাঁড়াই—বেলা তখন দশটার কাছে। প্রভাত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বাতাসে তখনো আছে প্রভাতের স্নিগ্ধতা। উন্নত সরল ইউক্যালিপ্‌টাসের তরুশাখা হইতে একটি কষায়-মধুর সৌগন্ধ মগজের

শিবায় শিবায় সঞ্চারিত হইয়া যায়। আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া এই সৌগন্ধটি সারা-রাত্রি বিস্তারিত হইয়া থাকে—ভোরের হাওয়া একটু প্রবল হওয়ার সঙ্গেই রাত্রের এই শয্যা-সুবাস গুটাইয়া যায়। আবার সন্ধ্যাবেলার স্তিমিত বাতাসে এই গন্ধের বিছানা প্রসারিত হইতে থাকে, প্রান্তরলক্ষ্মীর অদৃশ্য মলমলের আশ্চর্য বিছানা। এখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে আবহাওয়ার সঙ্গে অস্তিত্বের কেমন করিয়া একটি সমন্বয় ঘটে। কাছেই একপাল গোরু চরিতেছে—তাহাদের ঘাস ছিঁড়িবার সম্মিলিত ঐকতান, অদূরে কোথায় ঘুঘু ডাকিতেছে, তাহার সকরুণ শাশ্বত সঙ্গীত, দূরের সাঁওতাল পল্লীর তরুচ্ছায়া কোমল খোলার চালের বঙ্কিম আভাস—সবশুদ্ধ মিলিয়া কেমন একটা অপার্থিব ভাব। ধীরে ধীরে বহু সংস্কারের গ্রন্থিল অঙ্গুলী হইতে হঠাৎ মনটা শকুন্তলার অঙ্গুরীয়ের মতো স্খলিত হইয়া এই স্বচ্ছ অতল শান্তিনীরের মধ্যে পড়িয়া যায়। মন উদাস হইয়া ওঠে। যে মুহূর্তে শকুন্তলার অঙ্গুরী খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল- সে কি অকারণে উদাসীনতা অনুভব করে নাই? শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের বিরহ নাটিকা আজও অভিনীত হইয়া চলিয়াছে—মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে। মানুষ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সে বিচ্ছেদ এতই সুগভীর যে কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছে না। অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক যে অতলে নিমজ্জিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে দু'জনেরই মন উদাস হইয়া যায়। এইখানে এই মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলে আমি সেই আদিম বিরহ যেন অনুভব করিতে পারি!

প্রাচীন কালের কবিরা নিত্য প্রকৃতির সহবাস করিতেন—তাই তাঁহারা স্বতন্ত্র-ভাবে প্রকৃতির চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। খুব সম্ভবতঃ তাঁহারা প্রকৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনই ছিলেন না। তাহাদের কাব্যে আধুনিক কবিদের মতো প্রকৃতি-চিত্রন যে নাই—ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। যে স্বামী-স্ত্রী চিরকাল একত্র থাকিল—তাহাদের চিঠিপত্র তলব করিয়া প্রণয় বিচারের পরীক্ষা কি বৃথা নয়! দান্তে কাব্যের প্রকৃত উপজীব্য স্বরূপ "ভগবান্, যুদ্ধ ও প্রেমের" উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির উল্লেখ করেন নাই। তাহার স্বতন্ত্র উল্লেখের কথা তাঁহার চিন্তারও অগোচর ছিল।

নাগরিক সভ্যতার উদ্ভব মানুষকে প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—তাই কবিরা এখন প্রকৃতির সম্বন্ধে সচেতন। এই চৈতন্য হইতে প্রাকৃতিক কবিতার সৃষ্টি। জানকী বিচ্ছেদের সেতু রচনা করিয়াছিলেন অঙ্গচ্যুত

রত্নালঙ্কারে ; রামচন্দ্র বিচ্ছেদের সেতু রচনা করিয়াছিলেন শোকের লবণাম্বুধিকে সংবদ্ধ করিয়া ; এখনকার কবিরা প্রকৃতির বিচ্ছেদের সেতু রচনা করে, প্রকৃতির কবিতা লিখিয়া। এই সব কবিতায় মিলনের আভাস আছে, কিন্তু মিলন নাই।

শকুন্তলা ও দুষ্মন্তে অবশেষে মিলন ঘটিয়াছিল ; প্রকৃতি ও মানুষে আর কি মিলন ঘটিবে না ? প্রকৃতি আজও তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে—এক-বেণীধারিণী, তপশ্চারিণী, বিরহ-প্রবর্দ্ধিত সৌন্দর্য্য। কিন্তু মানুষ-দুষ্মন্ত কি তাহার তপস্যায় বসিয়াছে ? কিংবা সে কি এই বিরহ সম্বন্ধে আদৌ সচেতন ? ক্ষণে ক্ষণে তাহার মন উদাস হইয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহার কারণ কি সে বুঝিতে পারিয়াছে ? প্রকৃতি-শকুন্তলার সঙ্গে মিলন না ঘটা অবধি তাহার শান্তি নাই। শান্তির আশায় সে হংসপদিকাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মরিতেছে ; ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ, ব্যবসা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য ! সুখ হয় তো সে পায়, কিন্তু শান্তি পাইয়াছে কি ? শান্তির অভাব আর কিছুতেই পূর্ণ করিতে পারে কি ? এই মিলন না ঘটা অবধি মানুষ অসম্পূর্ণ। শান্তি যে পূর্ণতার নামান্তর ! প্রকৃতি আজও তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে, মানুষ কি তাহার জন্য তপস্যায় বসিবে না ? সময় কি উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই ? প্রয়োজনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়—প্রেমের সময় কখনো অতিক্রান্ত হয় না।

জীবন-দর্শন

আমি অনেক সময়ে ভাবি প্র-না-বি'র শেষজীবন কিভাবে অতিবাহিত হইবে। এখানে এই মাঠের মধ্যেই কি তিনি তাঁহার জীবনের অন্ত্যপর্ব কাটাইয়া দিবেন ? এই প্রান্তর কি সত্য সত্যই তাহার জীবনকে গ্রাস করিবে ? শিকারের বাতিক তাঁহার আছে। সেই বাতিকের তাড়নাতেই এখানে তিনি প্রথম আসেন। তারপর হইতে এখানকার শূন্যপ্রান্তর তাঁহাকে এমন করিয়া পাইয়া বসিল যে, তিনি বেশ কায়েমী হইয়া চাপিয়া বসিলেন, এখন আর নড়িবার নামও করেন না। এ বিষয়ে একবার তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম—তিনি বলিলেন—

কেন বেশ তো আছি, অন্যত্র যাবার তো কারণ দেখছিনে।

আমি বলিলাম—এই মাঠের মধ্যে, বন আর পাহাড়ের ধারে জীবন কাটানোর মধ্যে কি সার্থকতা আছে বুঝতে পারি নে।

তিনি বলিলেন—কেন মানুষ তো বন, পাহাড় আর মাঠের মধ্যেই প্রথম জন্মেছিল, শহর তো সেদিনের মাত্র সৃষ্টি!

—কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হয় না যে মানুষের জীবনের অরণ্যপর্ব কেটে গিয়েছে!

তিনি বলিলেন—আপনি কি এতই নিশ্চিত? মহাভারতের আদিপর্বে একবার বনবাস আছে বটে তবু অন্তিমের স্বর্গারোহণ পর্বের পার্বত্য অভিজ্ঞতার কথা কেন ভুলে যাচ্ছেন? রামায়ণের উত্তরচরিতও কি বনবাসে পরিসমাপ্ত নয়? আদিম প্রকৃতি তাব অবণ্যচ্ছায়ার শ্যামল কোমল অঞ্চল বিছিয়ে মানুষের জন্যে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে, সে জানে তার কোলের ছেলে একদিন না একদিন আবার ফিরে আসবেই।

বুঝিলাম তত্ত্বের জটিল পথে অগ্রসর হইলে পারিয়া উঠিব না, তাই সোজাসুজি শুধাইলাম, আপনি শেষ জীবনটা তাহলে এখানেই কাটিয়ে দিতে সঙ্কল্প করেছেন?

তিনি বলিলেন—ইচ্ছা তো তাই। এখানে গোলাপ ফুলের গাছে সন্ধ্যাবেলা জল দিয়ে, কপির ক্ষেত ক্ষুরপো নিড়িয়ে জীবন শেষ করা কি কলকাতার পার্কের শুকনো কাঠের বেঞ্চে পেন্সনধারীদের সঙ্গে বসে মোহমুদ্গর আলোচনা করবার চেয়ে বাঞ্ছনীয় নয়? বিকাল বেলা আমি যখন গোলাপ গাছের গোড়ায় জল দিতে থাকবো তখন আগামী কালের আধুনিক যুবকের দল সাম্প্রতিক গান গাইতে গাইতে বেড়াতে যাবে। তখন একজনকে শুধোবে—ওই লোকটা কে? উত্তর শুনতে পাবে—এই বাড়ীর মালিক, বয়সকালে লোকটার শিকারের সখ ছিল, তারপরে হঠাৎ মনে প'ড়ে যাওয়াতে বলবে—লোকটা এক সময়ে লিখতো।

তারপর হাসিয়া বলিলেন—এই তো খ্যাতির পরিণাম। জীবন অন্ত হ'বার আগেই খ্যাতির অন্ত হ'য়ে যায়। আসর ভাঙবার পরেও সুরের রেশ দু'চার জন শ্রোতার মনে থাকে—তার তুলনায় সাহিত্য-খ্যাতি কত নশ্বর—অন্ততঃ আমার সাহিত্য-খ্যাতি। যে-খ্যাতির উপরে ভরসা রেখে আপনারা আমাকে শহরে যেতে অনুরোধ করছেন—সেখানে গিয়ে কীর্তির ইন্ধনে যে-শিখা প্রজ্বলিত তাতে বার্দ্ধক্যের হিমে অসাড় হাতপাগুলোকে তাতিয়ে নিই বলে ইচ্ছা করছেন—তার পরিণাম তো স্পষ্ট! হাতপাগুলো সম্পূর্ণ অসাড় হ'বার অনেক আগেই

নিঃশেষিত-ইন্ধন অগ্নি ভস্মস্তূপে মুখ লুকোবে। তখন? 'কী নিদারুণ ধিক্কারই না জীবনকে প্রতি মুহূর্তে ভারাক্রান্ত করতে থাকবে? তার চেয়ে এই অরণ্য-মাতার ক্রোড়ে বিস্মৃতির বিশ্রাম কি শ্রেয়স্কর নয়? আর এক আধটুকু খ্যাতির টুকরো যদি অন্তিমপর্বে থাকেই—তাতেই বা কী সার্থকতা? পাকাচুলে খ্যাতির মালা অদৃষ্টের পরিহাস নয় কি? আসল কথা কি জানেন—জীবনটাই সাধ্য—খ্যাতিটা গৌণ। বন্যার বেগ হচ্ছে জীবন, আর বন্যা যে পলিমাটি ফেলে রেখে যায় খ্যাতি সেই পলি। পলিকে নদীর পক্ষে বাধা বলাই উচিত। জীবন যদি পূর্ণ হয়, তবে আপনিই তা প্রতিভার দুর্গম শিখর থেকে পলি বহন ক'রে আনবে। কিন্তু যে হতভাগ্য পলির জন্যই শুধু সাধনা করে—তার জীবনে বন্যাও আসবে না, পলিও পড়বে না। রবীন্দ্রনাথ বলুন, গ্যয়টে বলুন, তাঁদের জীবন-সাধনার কতটুকু ধরা পড়েছে তাঁদের রচনায়—যদিও তাঁদের রচনাবলীর শ্রেণী কেরোসিন তেল-প্রার্থীদের সারির মতো আদিঅন্তহীন! যেটুকু কোমল উর্বর পলিমাটি ফেলে পড়ে আছে তাঁদের গ্রন্থে তার থেকেই কল্পনা করা যায় কি প্রচণ্ড প্রচুরতা সমুদ্রে গিয়ে অনন্ত জলরাশিতে বিলীন হ'য়ে গিয়েছে।

একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, এবারে তিনি প্রত্যেকটি শব্দের উপরে জোর দিয়া বলিতে শুরু করিলেন—এখানেই মহৎ শিল্পী আর সামান্য শিল্পীর প্রভেদ। মহৎ শিল্পীরা জীবন-সাধক, শিল্প তার একটা উপায় মাত্র, লক্ষ্য নয়। সামান্য শিল্পীদের কাছে শিল্পটাই লক্ষ্য; জীবন-দর্শনের জন্য তাদের ব্যাকুলতা নাই। কুরুক্ষেত্রের জীবনাহবে একমাত্র অর্জুনেরই বিশ্বরূপ দর্শন ঘটেছিল—তার কারণ তাঁর মনে গোড়া থেকেই সেজন্য একটা তৃষ্ণা ছিল। এই তৃষ্ণার প্রভাবেই ছোট হয় বড়, এই তৃষ্ণার অভাবেই ছোট বড়-র স্তরে উঠতে পারে না। রত্নাকরের ছন্দোলাভ এই তৃষ্ণারই ফল। দান্তের এই তৃষ্ণার পানীয় ছিল বিয়াত্রিচের অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সরোবর। নিউটন সমুদ্রের তীরে বসে উপলখণ্ড কুড়িয়ে জীবন ধন্য ক'রেছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ শিল্পীর পক্ষেই দূর থেকে তার কলধ্বনি শুনেই জীবন সার্থক করতে হয়, আর সে সমুদ্রদর্শন যার হ'য়ে ওঠে, সে তো নরদেহে দেবত্ব লাভ করে। সে বনেই থাকুক—আর নগরের কোলাহলের মধ্যে যেখানেই থাকুক না কেন! তবে সাধারণের পক্ষে সে ধ্বনি শুনবার অনুকূল স্থান নিরাবরণ, নিরাভরণ প্রান্তর, অনাবিল আকাশ আর নীল অরণ্যের তুলি-টানা দূরায়ত চক্রবাল।

মাত্রাজ্ঞান

আবার আসিয়াছি প্র-না-বি'র সঙ্গে সাক্ষাতে। এবারে আমার সঙ্গী একজন চীন দেশীয় ভদ্রলোক। প্র-না-বি উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার ভৃত্য আমাকে চিনিত, সে আমাদের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। শুনিলাম বাবু শিকারে গিয়াছেন, এখনো ফেরেন নাই। ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করার চেয়ে বাগানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ানো শ্রেয়ঃ মনে করিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

প্রাচীরের পাশে সারি সারি ফুলের গাছ, জবা, করবী, ঝুমকোলতা—আর আছে কতকগুলি বিদেশী গোত্রের ফুল, এদেশের মাটিতে রস পাইয়াছে, কিন্তু এদেশের ভাষায় এখনো নামটি পায় নাই, এ যেন বাড়ির নবজাত শিশুটি, বিশিষ্ট নামের অভাবে যাহাকে খোকা বলিয়া সবাই ডাকে। আর আছে সারিবদ্ধ গাঁদা ফুলের গাছ—সুডোল স্বর্ণ গাঁদার কুঞ্জ অচঞ্চল মহিমায় স্থির হইয়া আছে।

আমি চীন দেশীয় বন্ধুটিকে বলিলাম যে—বাগানে ফুল প্রচুর, কিন্তু বসন্তের ফুলের শোভার কাছে এ কিছুই নয়।

চীনা বন্ধু হাসিয়া বলিলেন—আমাদের দেশের কবিদের কিন্তু ভিন্ন মত। তাঁহারা বলেন, বসন্তকালে ফুল সংখ্যায় বেশি, কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য্য শীতকালে যেমন প্রকট হয়—এমন আর কোন সময়ে নহে। জনতার মানুষে আর একটি বিশিষ্ট মানুষে যে প্রভেদ, অনেকটা তেমনি। ভিড়ের মধ্যে মানুষ নির্বিশেষ—সে কেবল মানুষমাত্র—ব্যক্তি নয়। বসন্তের ফুলের হাটে বড় বেশি ঠেলাঠেলি, গাদাগাদি—আর আপনি তো জানেন, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে প্রাচুর্য্যের চিরবিরোধ। ফুলের সৌন্দর্য্য কবির চোখে দেখিবার আসল সময় শীতকাল। অনন্ত আকাশ, অবাধ পৃথিবী, অগাধ রৌদ্র—তার মধ্যে একটিমাত্র গাঁদা ফুল—এর কি তুলনা আছে?

আমি শুধাইলাম—সৌন্দর্য্যে আর প্রাচুর্য্যে বিরোধ কি সত্যি?

—সত্যি নয়? অলঙ্কারের দোকানে আছে অজস্র মুক্তা, সেখানে প্রাচুর্য্য। কিন্তু সুন্দরীর কানে আছে একটিমাত্র দুল—সৌন্দর্য্য সেখানে। সোনার খনিতে প্রাচুর্য্য, সৌন্দর্য্য একটিমাত্র সোনার বলয়ে। রাণীর সহস্র সখী, তাদের সৌন্দর্য্য নাই—কিংবা থাকিলেও সহস্রের অন্তরালে তা প্রচ্ছন্ন, আর রাজ্ঞী একাকিনী সিংহাসনে আসীন বলিয়াই তিনি সুন্দর।

আমি শুধাইলাম—এমন কেন হয় ?

চৈনিক বন্ধু বলিলেন—সৌন্দর্য্যের রহস্য মাত্রাজ্ঞানে। মাত্রাচ্যুত হইলেই সৌন্দর্য্য প্রাচুর্য্যে পরিণত হয়। ভোজনবিলাসীর কাছে আহার্য্য সুন্দর, পেটুকের দৃষ্টি শুধু তার প্রাচুর্য্যের দিকে। সৌন্দর্য্যে যা মাত্রাজ্ঞান, ভাষায় তাকেই বলি ছন্দ, আবার জীবনে তারই নাম সংযম। তালের কঠিন বন্ধনে বদ্ধ না হইলে নৃত্য বলুন, সংগীত বলুন কিছুই সার্থক হইত না। বিধাতাপুরুষ জীবনমৃত্যুর অমোঘ গ্রন্থিতে সংসারকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই সংসার চলিতেছে।

এমন সময়ে আমাদের পিছন হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—ঠিক এইজন্যই পুরূরবার গৃহত্যাগ করিয়া উর্বশী পালাইতে বাধ্য হইয়াছিল। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যকে গৃহিণীর পদে অধিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিলে মাত্রাচ্যুতি ঘটা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

আমরা চাহিয়া দেখিলাম—প্র-না-বি। তিনি বলিলেন—আমি বড়ই দুঃখিত যে, আপনাদের অপেক্ষা করিতে হইল। এত দেরি হইবে ভাবি নাই। কিন্তু শিকারের গতি সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া পূর্বাহ্ণে কিছু বলা সম্ভব নয়। শিকারীর ভাগ্য চির-অনিশ্চিত। ওর একটা মোহ আছে—আর মোহ যাতে আছে, তার সম্বন্ধে নিয়ম করা চলে না।

আমি চীনা বন্ধুর সঙ্গে প্র-না-বি'র পরিচয় করাইয়া দিলাম। তারপরে তিনজনে তাঁহার সূর্য্যমুখী বাড়িতে গিয়া বসিলাম।

চীনা বন্ধুটির উপস্থিতিকে সূত্র করিয়া আমাদের কথাবার্তা চীন ও ভারতবর্ষের সভ্যতা সম্বন্ধে আরম্ভ হইল। প্র-না-বি বলিলেন—ওই যে মাত্রাজ্ঞানের কথা বলিতেছিলেন—ওটাই হইতেছে সবচেয়ে বড় কথা। ইউরোপের সভ্যতায় আর সবই আছে, কেবল মাত্রাজ্ঞানের অভাব। সেই জন্যই ইউরোপ বারংবার আদর্শকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে। ওদের সভ্যতার আদর্শ (যদি তাহাকে আদর্শ বলা যায়) প্রাচুর্য্য ছাড়া কিছু নয়। এই প্রাচুর্য্যের সাধনায় ওরা এমনই উন্মত্ত যে, ধর্মবোধ ওদের কাছে তুচ্ছ। প্রাচুর্য্যের সন্ধানে ওরা দেশ-বিদেশে লুঠতরাজ করিয়া ফিরিতেছে। প্রাচুর্য্যের স্বর্ণচূড়াকে অভ্রভেদী করিয়া তুলিবার দিকে বেচারাদের এমনই ঝোঁক যে, অপর দেশের ধনপ্রাণ ওদের কাছে নিতান্ত খেলার বিষয়। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতা ছিল, এখনো আছে চীনে আর ভারতবর্ষে।

চীনা বন্ধুটি হাসিলেন। তিনি বলিলেন—ওরা কি তা স্বীকার করিবে?

—মাতাল কি স্বীকার করে যে, সে প্রকৃতিস্থ নয়? কিংবা অমদ্যপায়ী প্রকৃতিস্থ? তাতে তো সত্য অপ্রমাণ হয় না। আসল কথা কি জানেন, ইউরোপের দস্তুর সভ্যতার মোহ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আমাদের চলিতে হইবে। তা যদি আমরা পারি—তবে এই নেশা-ধরানো অনুকরণ-প্রবণতার দুঃসময়টা কাটিয়া গেলে ওরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে—চীন ও ভারতবর্ষের সভ্যতার তুলনা নাই। এশিয়ার বিশাল জনহীন প্রান্তরের মধ্যে যে বিরাট অপ্রমত্ত পুরুষ চিরধ্যানের শান্তিতে বিরাজমান—তার পায়ের কাছে একদিন ওদের আসিয়া বসিতে হইবে। কেবল ইতিমধ্যে আমরা যেন সেই স্থানচ্যুত না হই।

আমি বলিলাম—কিন্তু ইউরোপ তো বলে যে, সে তার সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে।

প্র-না-বি বলিলেন—কোন সমস্যা? অন্নবস্ত্রের সমস্যার কথা যদি বলেন, তবে সে সমস্যার মীমাংসা তারা কিভাবে করিয়াছে দেখা দরকার। পৃথিবীর আর দশটা দেশকে অস্ত্র ও যন্ত্র দ্বারা বশীভূত করিয়া তবে তারা সেই সমস্যার মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এমন তো চিরদিন থাকিবে না। যখন সে সব দেশ স্বাধীন হইয়া আত্মনির্ভর হইবে—তখন ইউরোপের বর্তমান সমাধান কি বাতিল হইয়া যাইবে না? যে সমাধানের মূলে আছে আর দশজনের দুঃসহ দুরবস্থা, তাকে কি সমাধান বলা উচিত? এখন থেকে পঞ্চাশ বছর পরেকার কথা চিন্তা করুন—যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন আর চীন আত্মনির্ভরশীল—তখন ইউরোপের মাল কোন্ বাজারে বিক্রীত হইবে? আমরা কি তখনো অন্নবস্ত্রের জন্য ইউরোপের মুখাপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব? নিশ্চয়ই নয়, তবে?

আর যদি আত্মিক সমস্যার সমাধানের কথা তোলেন—তবে বলিব, এ দুই সমস্যাই একসূত্রে গ্রথিত। আত্মিক সমস্যার সমাধান হয় নাই বলিয়াই তাহার অন্নবস্ত্রের সমাধানও ঘটিল না। আবার পরঘ্ন অন্নবস্ত্র প্রতি মুহূর্তে ইউরোপের আত্মাকে অধঃপাতের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এখন ভারতবর্ষ ও চীন যদি বিচলিত না হয়—তবে শেষপর্য্যন্ত আমাদের আদর্শকে গ্রহণ করা ছাড়া ওদের গত্যন্তর নাই।

প্র-না-বি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, চীনা বন্ধুটি দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তখন তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আপনার দেশের

লোককে ধৈর্য্যধারণ করিতে অনুরোধ করিবেন। আমরা শাশ্বত আদর্শের বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানে বসিয়াছি—ইউরোপের 'মার' নানা প্রলোভনের মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে—তাহার ছলনায় যেন আমরা প্রতারিত না হই। শেষপর্য্যন্ত আমাদের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। আমাদের সভ্যতার মধ্যে যে স্বাভাবিক মাত্রাবোধ আছে—প্রাচুর্য্যের লোভে তাহার যেন আমরা অমর্য্যাদা না করি। এই সতর্কবাণী রূপ ইষ্টমন্ত্রকে জপ করিয়া দুঃসময়ের রাত্রিটা আমাদের উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

বন্দীর প্রত্যাবর্তন

প্র-না-বি বলিতেছেন—

সেদিন খবরের কাগজে দেখলাম, ইউক্রেন জয় করে জার্মানরা যে সব অশ্ব জার্মানীতে নিয়ে গিয়েছিল এখন তাদের ইউক্রেনে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। ট্রেনে ক'রে তারা আসছে; যখন তারা জন্মভূমির কাছে এসে পড়ছে, তাদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা দেখা দিচ্ছে। ক্রমে এই চঞ্চলতা অধীরতায় পরিণত হ'য়ে উঠল। তাদের পা অস্থির হ'য়ে উঠেছে, নাসারন্ধ্র স্ফীত হচ্ছে, তারা অব্যক্ত হ্রেষাধ্বনিতে কি যেন প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে। আর কিছু নয়, জন্মভূমিতে পৌঁছবার আগেই তারা জন্মভূমির সৌগন্ধ যেন বাতাসে পেয়েছে। সংবাদদাতা বলছেন 'স্টেপি' বা তৃণাচ্ছাদিত জন্মভূমির খবর যেন ইতিমধ্যেই কি ক'রে তাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। ট্রেন যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে, তাদের যখন নামিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে তারা প্রথমে খুব খানিকটে ছুটোছুটি ক'রে নেবে। আর কিছু নয়, বিস্মৃত মাতৃভূমিকে তারা যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে চায়। আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তারা কি করবে। কেশর ফুলিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে, সর্বাঙ্গের মাংস-পেশী তরঙ্গিত ক'রে, হ্রেষাধ্বনির তড়িতে দিগন্ত চমকিয়ে দিয়ে তারা বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো 'স্টেপি'-এর শ্যামল আকাশে ছুটোছুটি ক'রে নেবে। হঠাৎ থামবে, ক্ষুর দিয়ে মাটি উদ্ভিন্ন ক'রে তার সিক্ত তপ্ত সৌগন্ধ স্ফীত নাসারন্ধ্র দিয়ে আকর্ষণ করে নেবে; আবার ছুটবে। এমনি ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে শুয়ে পড়ে ঘাসের মধ্যে খুব খানিকটা গড়াগড়ি ক'রে বললাভ করবে, বলের আধার ঐ প্রাচীন মৃত্তিকা। ছুটতে ছুটতে দু'জনে মুখোমুখী এসে পড়লে—হ্রেষাধ্বনি তুলে বাণী বিনিময় ক'রে

নেবে, কালো চোখে আলো ঝলকে উঠবে ঈষন্মুক্ত বদনের শাদা দন্তের উপরে, করাতের গায়ে যেন, আলো প্রতিফলিত হবে। দিগন্ত-প্রসর্পী 'স্টেপি' অশ্বের গতিতে সারাদিন ধ'রে হিল্লোলিত হ'তে থাকবে।

কথা বলিতে বলিতে প্র-না-বি বলিলেন, চলুন বাগানের মধ্যে যাওয়া যাক্। ফাল্গুন মাসে আগের দিন এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মাটি সিক্ত। শুক্‌নো পাতার উপরে বৃষ্টির জল গড়িয়া একপ্রকার সুগন্ধ উঠিতেছে। পাতা-ঝরা গাছের শাখা-প্রশাখার কঙ্কালের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের ধৌত নীলিমা। অনেক গাছের কঙ্কাল আবার ইতিমধ্যেই কচি কিশলয়ে হরিতাভ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা একটা গুল্‌মোরের গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। গাছটা শীর্ণ কঙ্কালের বিচিত্র ত্রিশূলে আকাশটাকে যেন বিদীর্ণ করিতে উদ্যত। প্র-না-বি গাছটির কাণ্ড স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

আমি পৃথিবীর ধমনীকে স্পর্শ ক'রে আছি। এই নিরেট গুঁড়িটার ভিতরে কি রস-প্রবাহ, কি বুভুক্ষা, কি আদিম তৃষ্ণা—অথচ বুঝতে পারি না। আমরা নিজেদের বলি পৃথিবীর পৌত্র, কি প্রপৌত্র, অথবা বংশাবলীর আরও কয়েক ধাপ নীচে, তাই আজ পৃথিবীর অব্যক্ত ভাব আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় না। পশুরাই সত্যি পৃথিবীর সন্তান—ওরা পৃথিবীর বড় কাছাকাছি আছে। পৃথিবীর বার্ত্তাকে ওরা যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারে—আমরা কি তেমন পারি! অনেক কল্পনা, অনেক অনুমান, অনেক গবেষণা করলে তবে খানিকটা যেন বোধ-গম্য হয়। আর ঐ ইউক্রেনের অশ্বগুলো!

তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন—আগামী জন্মে আমার যদি কিছু কাম্য থাকে তবে বিধাতাকে বলবো—প্রভু আমাকে জন্তু জানোয়ার ক'রে জন্ম দাও। ঐ যে দূরে গোরুটা মুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওই মোহ কেন আমার হয় না। ওই মোহটুকু প্রকাশ করবার জন্যেই তো পৃথিবীর সমস্ত কবি, সমস্ত শিল্পী, সমস্ত 'মিষ্টিক' সাধকগণ চেষ্টা করছেন! কিন্তু অমন নিঃসংশয়ে প্রকাশ করতে পেরে-ছেন কি? মাঠের মধ্যে যখন গোরু চরে তখন আমি অনেকবার তাদের মূঢ় তন্ময় ভাব লক্ষ্য করেছি। স্তব্ধ হ'য়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে, বড় বড় শূন্যদর্শী চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, যন্ত্রবৎ মুখ নড়ছে—কিন্তু আহারে মন নেই বেশ বুঝতে পারা যায়—অর্দ্ধভুক্ত তৃণ গ'লে পড়ে যাচ্ছে, লেজটি নিঃসাড়, পিঠের মাছি তাড়াবার কোন উদ্যম নেই। ওই দিগন্তের কাছাকাছি ও যেন ধরিত্রীর আদিম গোষ্ঠ

গৃহটিকে দেখতে পাচ্ছে। ওর মোহের তুলনায় পৃথিবীর সমস্ত শিল্প-সাধনা অকিঞ্চিৎকর।

দেখুন, লোকে যাই বলুক কবিরা, মিষ্টিক সাধকগণ অতিমানব নন। তাঁরা নিম্নতর স্তরের মানুষ। সাধারণ মানুষের চেয়ে জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে তাঁদের প্রভেদ অনেক কম। কবি যত বড় এই প্রভেদ তত কম। হোমারে আর একটা পশুতে প্রভেদ নেই বললেই হয়। কবিরাও ভিন্নার্থে 'সোঽহম্' মন্ত্রেরই সাধনা করছেন। এখানে 'সঃ' বলতে পশু, যার মধ্যে মৌলিক প্রাণের আদিম প্রকাশ। কবিদের মধ্যে আদিম প্রাণের স্ফূর্তি বলেই অনেক সময়ে তাঁদের মধ্যে ইন্দ্রিয়গত বর্বরতা দৃষ্ট হয়—ওটা যে পশুর গুণ, তাইতো তাকে পাশবিক বলা হয়।

তারপরে তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়াই যেন বলিতে লাগিলেন—ইউক্রেনের বন্দী অশ্বের জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনের খবর প'ড়ে আমার নিজের কথা মনে পড়ে গেল। আমি মাঝে মাঝে নিজের জন্মগ্রামে যাই। তখন আমার অবস্থা ঠিক ঐ অশ্বগুলোর মতোই হয়—তবে কিনা আমি সভ্য ভব্য ব'লে ওবকম ক'রে প্রকাশ করতে সাহস করি না। ভোরবেলা স্টেশনে নেমে গাড়ি ক'রে যতই এগোতে থাকি—একটির পরে একটি পরিচিত গন্ধ অভ্যর্থনা জানাতে থাকে। শিশিরপড়া পথের ধূলো, চষা ক্ষেত, শটিভাটির গাছ, অর্দ্ধসিক্ত ঘাস, নদীর তীর, খেয়া নৌকো, প্রত্যেকের গন্ধের ইঙ্গিত স্বতন্ত্র। বেশ বুঝতে পারি আমার মধ্যেকার শিল্পীপশুটা নাসারন্ধ্র স্ফীত ক'রে গন্ধ গ্রহণ করছে, দেহটা যখন কায়দা-দুরস্ত হ'য়ে ব'সে আছে, আদিম পশুটা বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটোছুটি করছে, ধূলোয় প'ড়ে লুটোপুটি করছে, প্রাচীনতম খেলুড়েদের সঙ্গে হুটোপুটি করছে, সোঽহম্' মন্ত্রের সাধনা করছে। এ মন্ত্রের সিদ্ধির জন্য জন্মজন্মান্তরের প্রয়োজন। সিদ্ধির দিকে এগোনো মানেই ধাপে ধাপে নামতে নামতে পৃথিবীর গোষ্ঠগৃহের দিকে ফিরে যাওয়া। এর নাম দিতে পারেন—প্রত্যাবর্তনবাদ, এ হচ্ছে গিয়ে বিবর্তনবাদের ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া। ধরণী আমাদের দূর হ'তে দূরতরে নিক্ষেপ ক'রে দেখছেন আমরা ফিরে আসি কিনা। ফিরে না এলে মুক্তি নেই, আদিম প্রাণে ফিরে না আসা অবধি সিদ্ধি নেই, যে-আদিম প্রাণের অবিকল-প্রায় প্রকাশ পশুদের মধ্যে। এই অর্থে শিল্পীরা 'সোঽহম্' মন্ত্রের সাধক।

ঘুঘুর ডাক

অনেক দিন পরে ঘুঘুর ডাক শুনিলাম। নির্জন মাঠের মধ্যে নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে অবিশ্রাম ঘুঘুর ডাক। ঘনীভূত নিস্তব্ধের দ্রবীভূত সুধা বিন্দু বিন্দু ক্ষরিতেছে। ওই একটিমাত্র শব্দ ধ্বনিত না হইলে নিস্তব্ধতাকে যেন সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতেই পারিতাম না। ওই ডাকটি যেন নিস্তব্ধতার বাণীরূপ। ঘুঘুর ডাক শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, এতদিন আমার চিত্ত ওই ডাকটির জন্যই উৎকর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় ঘুঘুর ডাক শুনিবার সুযোগ কোথায়?

বিকালবেলা মাঠের পথে বাহির হইবামাত্র দুই দিকের ধান ক্ষেত হইতে ধরিত্রীর উদ্ভিজ্জ-দেহ-সৌরভ নাসায় প্রবেশ করিল। আর রাত্রি নামিতে না নামিতে ঝিল্লীর ঝঙ্কার উঠিল। আবার গভীর রাত্রিতে যখন ঘুম ভাঙিয়া গেল, শুনিলাম মাঠের মধ্যে শিয়ালেব ডাক। জলের মধ্যে লোষ্ট্রপাত হইলে ক্রম বিস্তীর্যমান তরঙ্গবলয় যেমন প্রসারিত হইয়া যায়, তেমনি শিবা ধ্বনি মাঠ হইতে দূরতর মাঠে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল—যেন একখানি মাঠজোড়া শিবা-ধ্বনির জাল ফেলিয়া নিশীথের অন্ধকার সমুদ্র হইতে রহস্য-সিন্দুক উত্তোলনের চেষ্টা।

এখানে আসিবামাত্র প্রান্তর-লক্ষ্মী আমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। এখানকার স্থলপদ্মের প্রহরে প্রহরে রঙ-বদলানো, এখানকার তৃণপুঞ্জে শিশিরের ঝলমলানি, এখানকার দিগ্বধূর নীলাভগুণ্ঠনখানির খুলি-না-খুলি সঙ্কোচ, এখানকার শিবাধ্বনি, ঝিল্লি-ঝঙ্কার, ধরিত্রীর উদ্ভিজ্জ-সৌরভ—আর সবচেয়ে বেশি নিস্তব্ধের জটা-নিঃস্যন্দী ঘুঘুর ডাকের ওই বিন্দু বিন্দু ক্ষরণ।

বুদ্ধি বুঝিতেই পারে না, ইহারা আমার এত প্রিয় কেন? কাজেই সে বেচারা ইন্দ্রিয়গ্রামের উপরে মনের ভার ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। আমার আজন্মের সংস্কার, জন্মপূর্বের সংস্কার, জননান্তর সৌহৃদানি অহল্যার মত পাষাণী নিদ্রা ভাঙিয়া সহসা জাগিয়া ওঠে! সে তখন হয় অন্তরের গেহিনী।

বুদ্ধি প্রবল বটে—অস্বীকার করিবার উপায় কি? তাহাকে না হইলে জীবন-যাত্রা অচলপ্রায়, লোকালয়ে, কলিকাতায় তাহাকে ছাড়িয়া এক পা চলি এমন সাধ্য কি? কিন্তু লোকালয় হইতে দূরে, এই মাঠে আসিলে সে স্বেচ্ছায় তাহার রাজ-সিংহাসন হইতে নামিয়া বসে কেন? সেই শূন্য সিংহাসনে আচম্বিতে কেমন করিয়া সংস্কারের আবির্ভাব হয়। আসল কথা শহর মানুষের সৃষ্টি, আর প্রান্তর, অরণ্য,

পর্বত—প্রকৃতির সৃষ্টি! এখানকার ভাষা অতি পুরাতন, এত পুরাতন যে মানুষে প্রথমে তাহার ভাষা হইতেই আপন ভাষা পাইয়াছিল। বহুজন্মার্জিত এই সংস্কার, আরণ্য প্রকৃতির এই সংস্কার মানুষের রক্তের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া আছে। লোকালয়ে সে সংস্কার চাপা পড়িয়া থাকে, কিন্তু যখনি মানুষ প্রহরীর সীমা অতিক্রম করিয়া আদিম প্রকৃতির মধ্যে উপস্থিত হয়, অমনি আদিকালের সেই রাজকন্যা সোনার স্পর্শ লভিয়া জাগিয়া উঠিয়া শূন্য সিংহাসনখানি দখল করিয়া বসে। সেই রাজকন্যার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—'তার আঁখির তারায় যেন গান গায়—অরণ্য পর্বত'। সে রাজকন্যা আরণ্যিকী, সে পার্বতী! কিন্তু শুধু কি সেই রাজকন্যাই? আমরা যাহাকে ভালোবাসি—তাহার আঁখির তারাতেও কি অরণ্য পর্বতের আভাস নাই? কেন এমন হয়? তার কারণ কিছুই নয়—প্রেম বুদ্ধির ধর্ম নয়, সংস্কারের ধর্ম! প্রেম ঔচিত্য-প্রসূত নয়, সংস্কার-প্রসূত। ভালো না বাসিয়া পারে না বলিয়া মানুষ ভালোবাসে—অধিকাংশ সময়েই বুদ্ধির শাসনের প্রতিকূলেই সে ভালোবাসিয়া ফেলে। যে মানুষ ভালোবাসিতেছে, সে আদিম মানুষ। সেই জন্যই প্রণয়ী-যুগলের মন হইতে বুদ্ধির অলঙ্কার, শাস্ত্রের বসন আপনি খসিয়া পড়ে। তাহারা তখন আদিম; আরণ্যক ও পার্বতিক।

বুদ্ধির অনুশাসন না হইলে মানুষের চলে না বটে—কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার শাসন হইতে মুক্ত না হইলেও তাহার চলে না—অন্ততঃ চলা উচিত নয়। কিন্তু আমরা এমনি সর্বতোভাবে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছি—তদতিরিক্ত যে কিছু আছে—তাহা ভাবিতেও পারি না। স্বর যেমন শমে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ণতা পায়, নূতন উদ্যমে চলিবার শক্তি লাভ করে, মানুষও তেমনি পূর্ণতা পায়, নবশক্তির দ্যোতনা পায় আদিম সংস্কারের মধ্যে একবার আত্মনিমজ্জন করিয়া লইলে। বুদ্ধির স্বৈরশাসন হইতে মুক্তির উপায় সংস্কারের সমুদ্রে অবগাহন।

আমি বুদ্ধির অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে এখানকার মাঠে আসি। অবশ্য বুদ্ধিমানেরা উপহাস করে। খাঁচার পাখীর কাছে খাঁচার বাহিরে কোন জগৎ নাই।

কিন্তু এ সব তর্কে কি লাভ? তর্ক করিয়া কেহ কাহাকেও সম্মত করিতে পারিয়াছে এমন তো জানি না! তার চেয়ে ওই ঘুঘুর ডাকের অনেক বেশি শক্তি! ওই করুণ রব আমার চিত্তকে অতি দূর অতীতের দিকে নিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়—আমার মন পাখনা-পরানো শরের মতো ছুটিয়া চলে। দেখিতে দেখিতে অতিস্পষ্ট

বর্তমান অস্পষ্ট অতীতের মতো ঝাপসা হইয়া যায়। আর এতদিন যাহা ছায়াসম ছিল, তাহারা মায়াময় কায়াধারণ করিয়া আমাকে একে একে অভ্যর্থনা করিতে থাকে। তখন পর্বত আর পাষাণ-স্তূপ মাত্র থাকে না, অরণ্য তখন অপ্সরীদের লীলা স্থল, নদনদী তখন সত্যই কলধ্বনি করে, প্রত্যেক হ্রদ তখন মানস সরোবর। আকাশ আবার নীল, পৃথিবী আবার হরিৎ, তৃণপুঞ্জ আবার শ্যামল হইয়া ওঠে—আর যাহাকে ভালোবাসি, সে সামান্য মানবীমাত্র নয়—তার আঁখির তারায় অরণ্য পর্বত যে গান গাহিতেছে—নির্জন প্রান্তরের ওই ঘুঘুর বিলাপ তাহারই পূর্বসূত্র।

প্র-না-বি'র খ্যাতি

পাঠক, প্র না-বি'র পাতা বন্ধ করিবার সময় আসিয়া পড়িল। তোমার ও আমার মধ্যে এই সাপ্তাহিক পত্রযোগ রহিত হইতে চলিল। তখন তুমি নিশ্চয় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। আর আমার! না, আমার মুক্তি এত সহজে আসিবার নয়। কিছুকাল লিখিলে লেখাটা লেখকের পক্ষে একপ্রকার মুদ্রাদোষ (নানা অর্থে) হইয়া দাঁড়ায়। ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, ভালো হোক (কখনো কি হয়?) আর ভালো নাই হোক (কখনো কি হয় না?) লিখিয়া যাইতেই হয়। তখন আমি হয়তো আর এক পত্রে আর এক নামে নূতন একটা পর্যায় শুরু করিয়া দিব। প্র না বি'র একটিমাত্র ছদ্মনাম মনে করিও না।

কিন্তু সেকথা বলিবার জন্য আজ কলম ধরি নাই। এই এক বৎসরে প্র না বি র পত্র প্রচারের ফলে তাহার খ্যাতি কি রকম প্রসারিত হইয়াছে, সেই আভাস তোমাকে দিবার ইচ্ছা। প্র না-বি'র পাতার স্নিগ্ধ বীজন অনেক পাঠকের মনেই আশ্বাসবায়ু বুলাইয়া থাকিবে, নতুবা মাঝে মাঝে এমন সব চিঠিপত্র পাই কেন? অনেকেই পোস্টকার্ডে সারেন কিন্তু যাঁহাদের বক্তব্য কার্ডের নির্দিষ্ট মাপে কুলাইবার নয়, তাঁহারা খাম ব্যবহার করেন। এক বৎসরে আমার যেটুকু পরিচয় পাইয়াছ, পাঠক, তাহাতে বুঝিতে পারা উচিত যে, প্র-না-বি'র পিঠের চামড়া সাধারণের চেয়ে পুরু। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এমন সাহস নাই, যাহাতে এইসব চিঠির বক্তব্য তোমাকে জানাইতে পারি। পত্রলেখকগণ প্র-না-বি সম্বন্ধে এমন একটি সম্বোধন করিয়া থাকেন, যাহা সেই সম্বন্ধীকে বলিলেও সে প্রসন্ন না

হইতে পারে। এতদবিক আর কিছু বলিবার প্রয়োজন আছে কি? কিন্তু সবশেষে যে পত্রখানি পাইয়াছি, তাহার বিস্তৃত পরিচয় না দিলে তোমার কৌতূহল বৃত্তির প্রতি অবিচার করা হইবে। কিন্তু তার আগে আর একটা ঘটনা বলিয়া লই।

কয়েকদিন মাত্র আগে হাইকোর্টপাড়ায় এক এটর্নির অফিসে গিয়াছিলাম। একটি জীর্ণ কক্ষে (বাড়িটি জব চার্নকের আমলের বলিয়া বোধ হয়) ধূলি-সঞ্চয়ী আসবাবপত্রের মধ্যে একটি জীর্ণতর চেহারার পুরুষ উপবিষ্ট। ভদ্রলোকটি যেন একখানি অতি পুরাতন কীটদষ্ট দলিল, ভয় হয় একটু চাপ দিলেই কুর কুর করিয়া ভাঙিয়া প্রাচীন ধূলিরাশিতে পরিণত হইবেন।

আমার নামটি শুনিবামাত্র মুখে চোখে পরিচয়ের বিদ্যুৎ বিকাশ করিয়া বলিলেন—বুঝিয়াছি, আর বলিতে হইবে না, হাওড়া পুলের কাছে আপনার লোহার দোকান আছে—

আমি বলিলাম—আজ্ঞে, লোহার দোকান তো—

তিনি বলিলেন—আমারই ভুল হইয়াছিল, কাটা কাপড়ের দোকান—

আমাকে পুনরায় প্রতিবাদ করিতে হইল—আজ্ঞে, ওসব কিছুই নয়।

—তবে কি করেন?

—বই লিখি।

চকিতে তাঁহার মুখের বিদ্যুৎটা বিলুপ্ত হইল। কেবল বই লেখে! তবে তাহার এ পাড়ায় আগমন কেন? এই রকম তাহার ভাবটা। কিন্তু এটর্নি হইয়া তিনি তো আগন্তুকের সহিত অভদ্র ব্যবহার করিতে পারেন না, তাই সান্ত্বনার ছলে বলিলেন—ছেলেদের বই বুঝি?

তিনি শুনিয়া থাকিবেন ছেলেদের বই কাটে বেশি। নিজের নাতিকেও হয়তো পড়িতে দেখিয়া থাকিবেন। আর বড়দের বই? হাঁ, রবিঠাকুরের মতো কোন কোন ধনী ব্যক্তি সখের খাতিরে লিখিয়া থাকেন বটে! কিন্তু বিক্রয়? কই, তিনি তো কখনো কেনেন নাই বা সমব্যবসায়ীদের বাড়িতেও দেখেন নাই।

আমি বলিলাম—না, আমি বুড়োদের জন্য লিখিয়া থাকি—কিন্তু তাহারা পড়ে না।

স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, তাহার মুখমণ্ডলে প্রসন্ন দৃষ্টির যে প্রশংসা-সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা অকস্মাৎ হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িল। তিনি এক ডুবে হাতের

নথিখানার অতল জলে তলাইয়া গেলেন—আর তাঁহার সাড়া পাওয়া গেল না। আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বুঝিলাম হাইকোর্টপাড়ায় এখনো প্র-না-বি'র খ্যাতি প্রবেশ করে নাই। তবে বাঙলা সাহিত্যসম্বন্ধে তাঁহাদের একেবারে উদাসীন বলা চলে না, এতদিনে তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিয়াছেন।

পাঠক, বন্ধুরা যখন সগৌরবে অপরিচিতের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিয়া বলে যে, ইনিই বিখ্যাত প্র-না-বি, তখন সেই ব্যক্তির মুখেচোখে এমন একটা ঝাপসা ভাব লক্ষ্য করিয়া থাকি—সে যেন একটা কোথাও থই পাইবার চেষ্টা করিতেছে, সন্তরন-অপটু যেমন পায়ের তলাকার মাটি খুঁজিয়া থাকে।

অপ্রস্তুত বন্ধু বলে—বিখ্যাত সাহিত্যিক—

লোকটি খানিকটা আশ্বস্ত হইয়া ভাবে—তবু ভালো যে, ইঁহাকে বিমানচালনা পটুত্বের জন্য অভিনন্দন করিয়া বসি নাই।

বন্ধু আবার বলে—অমুক বিখ্যাত বই ইঁহার রচনা।

এবারে লোকটি মুখে চোখে এক গাল হাসি ঢালিয়া বলে—নিশ্চয়, নিশ্চয়, খুব বুঝিয়াছি।

মনে মনে বলি আমিও বুঝিয়াছি, তুমি অতিশয় ভদ্র, কিন্তু তোমার মনের ভূমণ্ডলে প্র-না বি'র দেশ এখনও অনাবিষ্কৃত।

পাঠক, এইসব ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিতেছ প্র-না বি'র খ্যাতি কিরূপ দুরবিসর্পী। এবারে তোমাকে সেই চিঠিখানার কাহিনী বলিব। একদিন একখানা খামের চিঠি আসিল—একেবারে রেজিস্ট্রিকরা মর্মরিত খাম। খুলিয়া দেখিলাম, পড়িয়া দেখিলাম, আমার একজন অনুরাগী পাঠক লিখিয়াছে। তাহার বক্তব্য এই যে, আমার মতো একজন প্রতিভাশালী লেখক যে সামান্য কয়েকটি মুদ্রার লোভে (সে যে অঙ্কের উল্লেখ করিয়াছে, তাহার চেয়ে বেশী পাই) সপ্তাহে সপ্তাহে প্র-না-বি'র পাতা লিখি, ইহা তাহার পক্ষে পীড়াদায়ক। কাজেই আমার লিপি-বিরতির আনুকূল্য করিবার উদ্দেশ্যে পরবর্তী পত্রে কুড়ি হাজার টাকার একখানি চেক পাঠাইতেছে। অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিলে সে বাধিত হইবে।

অনুগ্রহ! কে বলিল বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে কৃষ্ণচন্দ্র বিদায় লইয়াছেন, তিনিই যে আজ পূর্ণচন্দ্ররূপে আমার আশার সমুদ্রতীরে উদীয়মান, আর আমার উদ্বাহু তরঙ্গদল উর্দ্ধোত্থিত বাহুতে তাঁহারই জয়ধ্বনি করিতেছে। কিন্তু দিনটা আর কাটিতে চায় না, কোনরূপে দুই হাত দিয়া দিনটাকে

ঠেলিয়া পার করিয়া দিলাম। হাঁ, পরের দিন যথাসময়ে সেই খাম আসিল—সেই হস্তাক্ষর। খুলিয়া ফেলিলাম। চেকের মতই যেন একটা কি বটে? কুড়ি হাজার টাকাই! কিন্তু এ কী! ভগবান্! আশার অঙ্কুর এমনিভাবেই বিনষ্ট করিতে হয়? কোন বিখ্যাত সাপ্তাহিকের 'cross-word'-এর পুরস্কারস্বরূপ কুড়ি হাজার টাকার একখানি বিজ্ঞাপন। সেখানা পাঠাইয়া আমার অনুরাগী পাঠক লিখিতেছে—ইহাকে চেক বলিয়াই মনে করিবেন। সামান্য একটুখানি বুদ্ধিব্যয় করিয়া 'cross-word'-এর সমাধান করিলেই নগদ কুড়ি হাজার টাকা পাইবেন। আপনার যেরূপ বুদ্ধি, আর যেরূপ অধ্যবসায়, তাহাতে এ কাজ আপনার কাছে মহাবীরের পক্ষে গোষ্পদ লঙ্ঘনের তুল্য। কেবল একটি অনুবোধ কুড়ি হাজার টাকা পাইলে প্র-না-বি'র পাতা বন্ধ করিয়া দিবেন, তাহাতে লেখক ও পাঠক সকলেরই মঙ্গল। পাঠক, আমার কথা বিশ্বাস করো, আমি সে কুড়ি হাজার টাকা পাই নাই, কাজেই ধর্মতঃ প্র-না-বি'র পাতা বন্ধ করিতে বাধ্য নই। কিন্তু জগতে যেমন ধর্ম আছে, তেমনি কাণ্ডজ্ঞানও তো আছে। এমন ইঙ্গিতের পরে প্র-না-বি'র পাতা চালাইলে প্র-না-বি'র মাথা বাঁচানো ভার হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

দেয়াল পঞ্জিকা

কলিকাতার মতো বিশাল জনপদের মনোভাব জানিবার প্রশস্ত স্থান কলিকাতার দেয়ালগুলা। এই শাদা চূণকামের যবনিকায় ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনের কথা ঝলক দিয়া উঠিতেছে;—আজ যাহা আছে কাল তাহা নাই; কাল যাহা ছিল পরশু তাহার চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। বিচিত্র অক্ষরে, চিত্রিত বর্ণে কত রকমের ছবিতে কলিকাতার মনের ভাব প্রকাশিত হইতেছে। চলমান জনস্রোত নির্বারবেগে বহিয়া চলিয়াছে আর দুই তীরের দুই দেয়ালের পটে কত রকম কথা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টায় রত।

এই মনোভাবের পরিভাষা বিজ্ঞাপন! কত রকমের বিজ্ঞাপন! বিজ্ঞাপন আর কিছুই নয় আত্মজ্ঞাপন। প্রত্যেকে জনতার মনোহরণের চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টায় সিনেমা বোধ করি সকলের অগ্রণী। নূতন ছবি আসিয়া পৌছিবার আগেই নূতন ছবির আভাস আসিয়া পৌছায়। যাঁহারা নিয়মিত ছবি দেখেন তাঁহাদের

লাভ তো বটেই কিন্তু যাঁহারা ছবি দেখিবার সুযোগ পান না, তাঁহাদের লাভও কম নয়। তাঁহারা দেয়ালের শুভ্র পটে নিশ্চল চলচ্চিত্র দেখিবার সুযোগ পান। সিনেমা থিয়েটারের পরেই বোধ হয় ঔষধ। কলিকাতার দেয়াল কলিকাতার অধিবাসীর বিনা ভিজিটের চিকিৎসক—এই দেয়ালগুলা কলিকাতার একপ্রকার দাতব্য চিকিৎসালয়। প্লীহা, লীভার, চর্মরোগ, মাথার ব্যামো, ছুলি, ধবল সব ব্যারামের ব্যবস্থাপত্র দেয়ালে লটকিয়া আছে। এখন দোকানে গিয়া বাছিয়া লইবার অপেক্ষামাত্র।

যুদ্ধের দরুণ কলিকাতায় জনতার রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় একটা বিজ্ঞাপন প্রায় লোপ পাইয়াছে। আগেকার মতো বাড়ি ভাড়ার 'টু লে-টের' তক্তা আর বাতাসে দুলিতে দেখা যায় না। সে সব কি চিরকালের মতোই লোপ পাইল। কিন্তু সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দেখা দিয়াছে যুদ্ধকালীন বোমার হাত হইতে বাঁচিবার দুর্গম দুর্গগুলি। এগুলির ভিতরে কখনো ঢুকি নাই, কেহ ঢুকিয়াছে কি? আর যে ঢুকিয়াছে তাহার কি বাহিরে আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছে?

আলোর অক্ষরের বিজ্ঞাপন একসময়ে এস্প্লানেড অঞ্চল উজ্জ্বল করিয়া রাখিত। তারপরে বোমার ভয়ে সেগুলা একদিন নিভিয়া গেল। দীর্ঘ চার বছর পরে সেই সহস্র চক্ষু একে একে খুলিতেছে।

বিজ্ঞ লোকে যে বিজ্ঞাপনগুলাকে পছন্দ করে না তার কারণ তাহারা বিজ্ঞ—অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। এমনি তাহাদের দুর্ভাগ্য যে এমন সুন্দর চিত্রগুলিতে তাহারা কাজের কথা ছাড়া আর কিছু দেখিতে পায় না। ধরুন, তাহারা যদি লেখাপড়া না জানিত তবে ওই ছবি, ওই অক্ষর, ওই আলোকমালা কি অসামান্য বলিয়া মনে হইত না। মিশরের যে চিত্রাক্ষরগুলি দেখিয়াও এখন আমাদের তৃপ্তি হয় না, সে যুগের লোকেও নিশ্চয়ই সেগুলার দিকে ভালো করিয়া দৃষ্টিপাত করিত না! তাহাদের কাছে চিত্রাক্ষর ছিল অক্ষর, আমাদের কাছে ওগুলা চিত্র। মঙ্গলগ্রহের কোনো অধিবাসী যদি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছায় তবে তাহার বিস্মিত আনন্দের অবধি থাকিবে না। সে দেখিবে কলিকাতার দেয়াল কেমন চিত্রিত। ছোট বড নানা রঙের অক্ষরের সারি নারায়ণী সেনার মতো চলিয়াছে। সে দেখিবে আলোর সহস্রচক্ষু জ্বলিয়া নিভিয়া শচীর প্রতি কি ইঙ্গিত করিতেছে। সে দেখিবে মকরধ্বজের জলন্ত বিজ্ঞাপন কোন্ রাজ্যেশ্বরের জন্মোৎসবের উজ্জ্বল হুলুধ্বনি! তাহার চোখে সবই বিচিত্র, সবই অদ্ভুত—কারণ সে অক্ষরজ্ঞানহীন।

হায়! আমরা অক্ষর-বোধের ক্ষুদ্র সুবিধা অর্জন করিয়া বিশ্ববোধ হারাইয়া ফেলিয়াছি! সাক্ষরতার পরিবর্তে যদি বৈচিত্র্যের সেই শৈশব ফিরিয়া পাইতাম—তবে এই পুরাতন পয়সার মতো ঘষা পৃথিবীই এক মুহূর্তে নতুন পয়সার মতো আবার ঝলমল করিয়া উঠিত; যে-বিজ্ঞাপনের দিকে আজ ফিরিয়াও চাহি না, তাহার দিকে চাহিয়া তৃপ্তি হইত না, দেয়ালগুলার দেয়ালির আর অন্ত থাকিত না, কলিকাতাকে সত্য সত্যই স্বর্গের রাজধানীর উপকণ্ঠ বলিয়া মনে হইত।

আসমান ভিলা

কলিকাতায় জমি কিনিবার আমার সামর্থ্য নাই—তাই একখণ্ড আকাশ কিনিয়াছি। এই আকাশটুকুর উপরে একখানি বাড়ী তৈরি করিয়া লইয়াছি—নাম দিয়াছি 'আসমান ভিলা।'

বাড়ীখানি বড নয়, কিন্তু পরিশ্রমে কৃপণতা করি নাই। দেশ-বিদেশের নামকরা উপাদান জোগাড করিয়াছি; পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ উর্দ্ধ অধঃ, কোন দিক্ বাদ দিই নাই। প্রচুর খরচ হইবার কথা, কিন্তু কি আশ্চর্য, আমার একটি পয়সাও খরচ হয় নাই। এ কেমন করিয়া সম্ভব? চেষ্টায় কি না হয়!

'আসমান ভিলার' প্রকৃতিই যে স্বতন্ত্র। শরৎকালের সাদা মেঘের মার্বেল পাথরে তার মেঝে পাতা; রামধনুকখানা আরও একটু বাঁকাইয়া দিয়া তার তোরণ তৈরী; বুনো হাতার স্তরীভূত মাংসপেশীর মতো ধূসর মৌসুমী মেঘে তাব দেয়াল গাঁথা; বিদ্যুতের গরাদ বসানো তার প্রত্যেকটি জানালায়; বকের সারির ঝালর আঁকা তার কার্নিসের নীচে, আর তারার যে অক্ষরগুলির পাঠোদ্ধার এখনো পণ্ডিতেরা করিতে পারেন নাই, সেই তারার অক্ষরে দেয়ালে দেয়ালে স্বাগতভাষণ লিখিত। আর সর্বোপরি চাঁদের আলোর সুধাময় প্রলেপে স্নিগ্ধ সৌম্য এই আসমান ভিলার সৌধ।

বাড়ীটার আকার কত বড়? কোন্ দেশের শিল্পরীতিতে বাড়ীটা গঠিত? আকার সব সময়ে এক রকম থাকে না; শিল্পরীতিও বিচিত্র। কোনদিন বা আসমান ভিলা মোগল-রীতিতে গঠিত, ফতেপুরসিক্রির লাল পাথরে গড়া, যেন একখানি একঘরে প্রাসাদ; কোন দিন বা গড়ি তাকে দাক্ষিণাত্যের গোপুরমের অনুকরণে; —থাকে থাকে বলিষ্ঠ কালো পাথরের স্তর আকাশের দিকে উদ্ধত; আবার কোন দিন বা আসমান ভিলা বৌদ্ধযুগের বিহার; বাইরেটা তার বৈশিষ্ট্যহীন, কিন্তু

ভিতরে অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য , দেয়ালে দেয়ালে রামধনুকেব তূলিতে আঁকা তথাগতেব বহুজন্মেব কথা। আবাব যেদিন ইচ্ছা কবে আসমান ভিলাকে গড়ি বাংলা খ'ড়ো ঘবেব ছাদে—গোবর-লেপা দেয়ালে একজোড়া ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীব ছবি।

কলিকাতাব কোথায় এই বাড়ীটা? সব সময়ে এক স্থানে তো থাকে না। কখনো বড়বাজাবেব উপবে নীচে দেখি নানা বঙেব পাগড়ীর ভিড়; কখনো লালদীঘির অঞ্চলে, নীচে দেখি টুপি আব টাক, কখনো আনি বালিগঞ্জ পাড়ায় নীচে শাড়ী, সীঁথি, ট্রাউসাব, লুঙি—সে এক সঙ্কব সভ্যতাব মূর্তি! আবাব কখনো বা দেখি বহুনিম্নে গুলমোবেব দাবানল-লাগা ঘনবনেব পুঞ্জীভূত নীলিমা। আব এক একদিন ভাঁটাব টানে যখন গঙ্গাব হাজাব হাজাব নৌকাব হাজাব হাজাব কাছিতে আর্তরব ওঠে, আসমান ভিলাব নোঙ্গর তুলিয়া ফেলি—আকাশ গঙ্গাব ভাঁটাব টানে ভাসিয়া যায় আমাব প্রাসাদ—মহাসমুদ্রেব অভিমুখে। দেখিতে পাই গঙ্গা ক্রমেই দুই বাহু বিস্তৃততব কবিতেছে—বনেব বেখা ক্রমেই দূবে সবিয়া যাইতেছে—অস্পষ্ট অনির্বচনীয় একটা ধ্বনি ক্রমে ক্রমে আসিয়া পৌঁছায়। গঙ্গা-সমুদ্রেব সঙ্গমে আকাশ-গঙ্গা আকাশ-সমুদ্রেব সঙ্গমে আসমান ভিলাব সেদিন স্থান।

লোকে বলে আসমান ভিলা তোমাব সত্য নয়—ও কেবল মনে মনে চিনি খাওয়া, ও তোমাব পলায়নী মনোবৃত্তির প্রতীক। বস্তুব মুখোমুখী দাঁড়াইবাব সাহস তোমাব নাই—তুমি নিজেও যেমন বস্তুস্পর্শ-ভীরু, তোমাব কল্পনাও তেমনি অবাস্তব! আমি কিন্তু সমালোচকদেব কথাব মর্ম পুরোপুরি বুঝিতে অক্ষম। বস্তু কি? মাটিই একমাত্র বস্তু? বায়ু কি বস্তু নয়? তবে বায়ুচাবী আসমান ভিলা অবাস্তব কেন? মেঘ কি বস্তু নয়? তবে মেঘলোকের প্রাসাদ অবাস্তব কেন? মোট চাল খাদ্য বলিয়া কি মিহি বাঁশফুল চাল গ্রাহ্য নয়? নিউ-ইয়র্কেব আকাশস্পর্দ্ধীগুলা বাস্তব, বাঙলাব কুঁড়েঘব বাস্তব, কেবল আসমান ভিলাই অবাস্তব? তবে তো বোধকবি তোমবা বলিবে কামধেনু, পারিজাত, অমৃত সবই অবাস্তব। আসল কথা বাস্তবেরও শ্রেণীভেদ আছে—আসমান ভিলা অবাস্তব নয়—শুধু সূক্ষ্মতব শ্রেণীর বাস্তব!

'বিফল' প্রাচীরের সফলতা

'বিফল' প্রাচীবেব জন্ম যেন নিতান্তই বিফল হইল! জাপানী বোমার টুক্‌রার অববোধেব জন্য এই প্রাচীরখণ্ডগুলি দেখিতে দেখিতে অল্পদিনে গজাইয়া

উঠিয়াছিল—বাড়ীর দরজা-জানালার সুমুখে দ্বিতীয় একটা আবরণ। কিন্তু হায়, জাপানী বোমা জাপানী খেলনার মতই ক্ষণভঙ্গুর! ঘরবাড়ী ভাঙা দূরে থাকুক—এই সদ্যোজাত প্রাচীরগুলাকেও ভাঙিতে পারিল না। মাঝে হইতে শহরের বাড়ীগুলি ইষ্টক-প্রাকারের অন্তরালে দুর্গম দুর্গের আকার লাভ করিল।

প্রত্যেকটি বাড়ী একটি ছোটখাটো দুর্গ! একি কলিকাতার পথ—না রাজপুতানার গিরিদুর্গের কোন নগর! একি মধ্যবিত্ত বাঙালীর বাড়ী, না রাজপুতানার বীরযোদ্ধাদের গৃহদুর্গ! একি বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন, না ষোড়শ শতকের প্রভাত! সে এক সময় ছিল বটে গিরিবন্ধুর রাজপুতানায় অতর্কিতে নগর-প্রাচীরে নাকাড়া বাজিয়া উঠিত, অমনি সিংহদ্বারের বিরাট কপাট আর্তনাদ করিয়া বন্ধ হইয়া যাইত, ঘরে ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করিবার শব্দ উঠিত, দেখিতে দেখিতে পথ নির্জন, পুরী নিস্তব্ধ, কেবল পথের একান্তে চালকহীন পণ্যবাহী অশ্বতরের হ্রেষা; পরিত্যক্ত একাব অশ্বকণ্ঠের ঘুণ্টির ধ্বনি, আর ওই নগরপ্রাকারে নাকাড়ার কড়কড় আওয়াজ। মুহূর্তের মধ্যে পুরীর প্রত্যেক গৃহ দুর্গের দুর্গমতা লাভ করিয়াছে। ঘুলঘুলির ফাঁকে তীরধনুক হাতে যোদ্ধা; ছাদের আলিসার আড়ালে বল্লম হাতে যোদ্ধা, রুদ্ধ দরজার পিছনে ঢাল তলোয়ার হাতে যোদ্ধা; প্রত্যেকে চরম সুযোগের অপেক্ষায় নিঃশ্বাস গুণিতেছে। রাজপুতানার গিরিদুর্গের বিপন্ন মুহূর্তের এই গেল একখানি চিত্র।

কিন্তু কলিকাতার 'বিফল' প্রাচীরে অবরুদ্ধ বাড়ীগুলি দেখিয়া গিরিদুর্গের কথা মনে পড়িল কেন? এ দুইয়ের মধ্যে কোথায় মিল? শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে আজ যদি কোন জাতির মিল থাকে তবে তা ওই রাজপুতদের! বীরত্বে নয়, ত্যাগে নয়, সহিষ্ণুতায় নয়, আদর্শবাদে নয়, রাজপুতদের বহু গুণের মধ্যে একটি মাত্র দোষ ছিল—আত্মস্বাতন্ত্র্য, নিজের উপশ্রেণীর আত্মস্বাতন্ত্র্য। তাদের ক্ষুদ্র দুর্গটি যেন ওই সঙ্কীর্ণ আত্মস্বাতন্ত্র্যের প্রতীক। আমাদের এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিনব রাজপুতেরও সেই একই দশা। আমাদেরও বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি। আমাদের প্রত্যেকটি পরিবার স্বনির্ভর, স্ব-তন্ত্র; পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী যেন কোন 'বুয়োনোজএয়ারেসের' অধিবাসী। কারো সঙ্গে কারো অনিবার্য্য যোগ নাই। গায়ে গায়ে লগ্ন হইয়া আমরা মনে মনে অনধিগম্য। প্রত্যেকের দিকে প্রত্যেকে আমরা শত্রুর সন্দিগ্ধতায় পূর্ণ। একের গৃহ আজ অপরের পক্ষে শত্রুর দুর্গ। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর এই মনোভাবের প্রতীক

যেন ওই 'বিফল' প্রাচীরে ঘেরা বাড়ীগুলি। জাপানী বোমায় এই বাড়ীগুলি ধ্বংস হইলে সেই সঙ্গে এই মনোভাবেরও কি ধ্বংস হইত না। গৃহদুর্গের অবরোধ হইতে কি আমরা মুক্তি পাইতাম না! বোমার এক গাঁট্টার আঘাতে ষোড়শ শতক হইতে বিংশ শতকের ফাঁকা মাঠের মধ্যে কি আসিয়া পড়িতাম না! তবে তো মরিয়া বাঁচিয়া যাইতাম। কিন্তু হায়, হায়, কপালে যার দুঃখ আছে, বোমাও তাকে আঘাত করে না। জাপানী বোমা আমাদের বাঁচাইয়া রাখিয়া মারিয়া গেল। প্রত্যেকের গৃহকে গৃহদুর্গ করিয়া, প্রত্যেককে নিজের ব্যক্তিত্বে বন্দী করিয়া, প্রত্যেককে মুমূর্ষুতায় অমর করিয়া রাখিয়া গেল—জাপানী বোমা। আর 'বিফল' প্রাচীরে ঘেরা বাঙালীর বাড়ী বাঙালীত্বের আদর্শ হইয়া খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পাঠক, তুমি ভাবিতেছ এ কি আপদ। 'বিফল' প্রাচীরের সফলতা কোথায়? সে বিষয়ে তো কিছু বলিলাম না। বিষয়টা একেবারে ভুলি নাই, কেবল মাঝখানে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিলাম। সফলতাও আছে বই কি! পথে এই প্রাচীরের আড়ালগুলি থাকাতে কত সুবিধা হইয়াছে। আগে ছাত্র শিক্ষক মুখোমুখি হইবার উপক্রম হইলে একজনকে পথের ওপারে যাইতে হইত, এখন কেবল প্রাচীরের আড়ালে গেলেই চলে। মনে কর প্রতিবেশীর কন্যাকে লইয়া একটু বাহির হইয়াছ হঠাৎ তাহার মতো একজনকে অদূরে দেখা গেল—তখন ওই প্রাচীরের কতো উপকারিতা। কিন্তু সবচেয়ে বেশী করিয়া সফলতা—অদূরে পাওনাদারকে দেখিয়া এখন আর যানবাহন-সঙ্কুল পথ পার হইতে হয় না, ডানে বাঁয়ে একটু চাপিয়া চলিলেই 'বিফল' প্রাচীরের আড়ালটুকু সহজলভ্য। এর চেয়ে বড়ো সফলতা আর কি হইতে পারে?

ঘুষ লই কেন?

ঘুষ লই, কেন না ঘুষ দিতে হয়। কিন্তু বরাবর এমন ছিল না। তখন সবে ইস্কুল কলেজ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি সংসারটা আগাগোড়াই বোধোদয়ের পাতা দিয়া মোড়া মনে করিতাম। দ্বিতীয় ভাগের মিথ্যাবাদী রাখালের গোরুর পালে একদিন যে বাঘ পড়িবেই, সে বিষয়ে মনে কোনই সংশয় ছিল না। ঝোপঝাড় দেখিলেই বুঝিতাম ওখানে রাখালদলের জন্য নীতিজীবী হিংস্রজীব সুযোগের

অপেক্ষায় গুঁড়ি মারিয়া অপেক্ষা করিতেছে। নিজে কখনো ঘুষ দিব সে কথা দূরে থাকুক, অপর কেহ ঘুষ দিতেছে কল্পনা করিলেও কানের ডগা দুটি লাল হইয়া উঠিত। হায়, তখন কি জানিতাম সংসার-তরণী ঘুষের লগির ঠেলা না পাইলে এক পাও চলে না।

প্রথম ঘুষ দিবার কথাটা এখনো মনে আছে। কখনো ভুলিতে পারিব কি? তখন বোমার ভয়ে কলিকাতার লোক উন্মাদগ্রস্তের মতো ছুটিতেছে। প্রত্যেকে নিজের জায়গাটাকে সবচেয়ে বিপদের মনে করিয়া অপরের জায়গায় যাইতেছে। এমন কি বালি বেলুড়ও অধিকতর নিরাপদ মনে হয়। যে শহর ছাড়িতে পারিতেছে না, সে শহরের মধ্যেই বাড়ী বদল করে, টালার লোক টালিগঞ্জে আসে; বালিগঞ্জের লোক বাগবাজারে যায়। আর যারা মধুপুর দেওঘর গেল তারা যেন অন্য গ্রহে প্রস্থান করিল।

আমি মধুপুরের যাত্রী। মালপত্র লইয়া হাওড়া ষ্টেশনে গয়া পৌছিলাম। কিন্তু প্লাটফরমের দরজা বন্ধ। দরজা বন্ধ কিন্তু ট্রেন প্রায় ভর্তি। এসব লোক গেল কোথা দিয়া? টিকিট বাবুকে টিকিট দেখাইয়া প্রবেশের অনুমতি চাহিলাম। সে নিরুত্তরে শুধু একবার সিকি মাপের একটি হাসি হাসিল। তখন সে হাসির অর্থ বুঝিতে পারি নাই, পরে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তার টীকা করিয়াছি— অর্বাচীন শুধু টিকিটের বলে তুমি কাজ উদ্ধার করিতে চাও?

কুলি বলিল, বাবু আমার সঙ্গে এসো। অন্য এক দরজা দিয়া যাত্রীর স্রোত ঢুকিতেছে। আমাকে সেখানে লইয়া গেল। বলিল, বাবু একটি সিকি বাহির করো। সিকি! সিকি কেন? সে বলিল—টিকিট বাবুকে দিতে হইবে। ইহাকেইতো ঘুষ বলে। চিন্তা করিতেই কান গরম হইয়া উঠিল। কই দ্বিতীয় ভাগেতো ইহা নাই। হায়, তখন কি তৃতীয় ভাগ পড়িয়াছি! কুলি বলিল, না দিলে ঢুকিতে পারা যাইবে না। এখন কর্তব্য কি? চিন্তাসাগরে যখন থই মিলিতেছে না, তখন অগতির গতি 'গীতা'র কথা মনে পড়িল। দেখা যাক্ তাহাতে কি উপদেশ আছে? গীতার কথা স্মরণ করিতেই মনে পড়িল, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রধারণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়া বিপদের সময়ে রথচক্র ধারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা মনে হইতেই সব সংশয় এক মুহূর্তের মধ্যেই মাকড়সার জালের মতো অপসৃত হইল। পকেটে একটি মেকি চার আনি ছিল। ওইতো আমার রথচক্র। অস্ত্রের কাজ হইল অথচ অস্ত্র নয়—আমার

দেওয়া হইবে অথচ যে লইল তার কাজে লাগিবে না! ঘুষ দিয়াও ঘুষের দোষ বাঁচানো গেল। কিন্তু নিজের হাতে দিতে পারিলাম না। কুলির হাতে দিলাম। তারপরে কোথা দিয়া যে কি ঘটিল বুঝিতে পারিবার আগেই দেখিলাম দ্বার উন্মুক্ত। পরে বুঝিলাম ঘুষের কড়ি পরীক্ষা না করিবার একটা অলিখিত আইন আছে। দাতা ও গ্রহীতা কেহ তাহা চোখে দেখে না, মুখে কোন কথা নাই, চোখে আইনের মর্য্যাদা উছলিয়া পড়িতেছে, শুধু হাতে হাতে একবার স্পর্শমাত্র—অমনি সব বাধা মসৃণ হইয়া যায়। গ্রহীতার আঙুলে একবার সেই রজতস্পর্শ, তারপরে সেই রজতচক্রের পকেটের গভীর অন্ধকারে গিয়া মুদ্রাস্তূপের মধ্যে সে কি পরিনির্বাণ!

তারপর হইতে ঘুষ দিই, প্রয়োজনে এমন কি যেখানে প্রয়োজন নাই, সেখানেও দিয়া অভ্যাসটা জীয়াইয়া রাখি। আর প্রয়োজন নাই বা কোথায়? রূপার চাবি ছাড়া এখন সংসারের কোন্ দরজা খোলে? মফঃস্বল শহরে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়া ছোট হাকিমের সঙ্গে দেখা হইল, ভদ্রতা করিয়া যদি শুধাও কেমন আছেন? তিনি উত্তর দিবেন না। একটি টাকা বাহির করিয়া দাও, তখনি বলিবেন ভাল আছি। বুদ্ধিমান্ পাঠক নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে ব্যক্তিগত ব্যাপারের চেয়ে আদালতঘটিত ব্যাপারে অনেক বেশী মূল্য দিতে হয়। হাজার হোক, আইনের একটা মর্য্যাদা আছে তো?

ঘুষের আবার নানা রকমফের আছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট চৌকিদারদের দিয়া খড়ি ফাড়াইয়া নেয়, পাটের হাকিমকে লোকে লাউ কুমড়া দেয়; সার্কেল অফিসারকে চিনি যোগাইয়া দোকানী দাম নিতে ভুলিয়া যায়; লেখা ছাপিবার জন্য সম্পাদকের কাছে বসিয়া তাঁর পারিবারিক দুঃখকাহিনী শুনিতে হয়; বেশী নম্বর পাইবার জন্যে পরীক্ষকের ছোট ছেলেটিকে বিনা বেতনে পড়াইতে হয়। আবার উচ্চাঙ্গের ঘুষ নাকি চেকে চেকে হয়; চোখে চোখে হয়; তার প্রকৃতিই আলাদা। নিম্নাঙ্গের ঘুষ 'ক্রাফ্‌ট্‌' উচ্চাঙ্গের ঘুষ 'আর্ট'। ফল কথা সমুদ্রের জল যেমন মেঘ, মেঘ যেমন বৃষ্টি, বৃষ্টি যেমন নদী, নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মিশিয়া চক্র সম্পূর্ণ করে, তেমনি ঘুষের চক্র সংসারে নিত্য আবর্তিত হইতেছে। যাঁরা এই চক্রের সবটা দেখিতে পান তাঁরা মহাপুরুষ।

যুদ্ধের বাজারে ঘুষ নাকি এখন চরমে উঠিয়াছে। দ্বিতীয়ভাগমাত্রপড়া লোকেরা বুঝিতে পারিতেছে না কেন এমন হইল? আমি কিছু কিছু বুঝিয়াছি। কলেরা,

বসন্ত, ম্যালেরিয়া সব সময়েই কিছু কিছু থাকে, কিন্তু এক এক সময়ে মহামারী আকারে দেখা দেয়—তখন ডাক্তার হইতে মুর্দাফরাসরা সকলে ব্যস্ত হইয়া ওঠে। তারপরে তারা নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকে পরবর্তী মহামারীর আশায়। কিন্তু আর মহামারী লাগিবে না এমন যদি দুঃসংবাদ তাহারা পায়, তবে? এও অনেকটা সেই রকম। গত মহাযুদ্ধে ঘুষ লইয়া ঘুষর্ষিগণ এই মহাযুদ্ধের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু এবার তাঁরা কি শুনিলেন? শুনিলেন যে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে বিশ্বশান্তির এমন পাকা বন্দোবস্ত হইবে যে পৃথিবীতে আর কখনো যুদ্ধ বাধিতে দেওয়া হইবে না। এ উড়ো খবর নয়। স্বয়ং চার্চিল, ষ্ট্যালিন, রুজভেল্ট বারংবার ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। তবে? তবে তো আর এমন সুযোগ মানবজীবনে আসিবে না, তাই ঘুষর্ষিগণ একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। এইবারেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া 'মহাঘুষর্ষি' হইতে হইবে। তাই এবারে গত যুদ্ধের চেয়ে ঘুষের রেট বেশী। সেবারে ভবিষ্যতের আশা ছিল এবারে যে আর ভবিষ্যতই নাই।

তবে ঘুষের মাত্রা কমাইয়া যদি স্বাভাবিকে আনিতে চাও, আমি তারও পন্থা জানি। চার্চিল, ষ্ট্যালিন, রুজভেল্ট সম্মিলিত ঘোষণায় প্রচার করুন যে, ভয় নাই এই যুদ্ধই শেষ নয়, আবার আমরা কুড়ি বছর পরে যুদ্ধ বাধাইয়া দিব। দেখিতে পাইবে অমনি দু' দিনের মধ্যে ঘুষের রেট কমিয়া আসিবে; ঘুষর্ষিগণ ভবিষ্যতের ভরসায় সাধনার উগ্রতা কমাইয়া দিবেন। তাঁহারাও মানুষ, তাঁহারাও নীতিকথা জানেন, তাঁহাদেরও হৃদয় আছে; কেবল ভবিষ্যতের আশা তাঁহাদের দিতে হইবে। ভবিষ্যৎ নাই জানিলে মানুষ পশু হইয়া পড়ে, কারণ পশুর ভবিষ্যৎ নাই, সে বর্তমানের জীব, দেবতাদের শুধু অতীত কালটা আছে; কেবল মানুষেরই ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কাল আছে; এই অর্থে সে ত্রিকালজ্ঞ। তাহার ভবিষ্যৎ কাড়িয়া লইয়া তাহাকে পশু করিয়া দিয়ো না—তাহার ঘুষের ভবিষ্যৎ।

সাইরেণ

সাইরেণ বাজিয়া উঠিল। বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা আছাড় খাইতে লাগিল। একবারের জন্য সন্দেহ হইল সাইরেণ না হইতেও পারে, হয়তো কোন কারখানার বাঁশী। নাঃ, সাইরেণ না হইয়া যায় না—শব্দের সেই অতি পরিচিত মারাত্মক ঢেউ-খেলানো গতি। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। তক্তপোষের উপরে উঠিয়া

বসিলাম, আবার নামিলাম। জানালা দরজা বন্ধ করিব কি? বিমান আক্রমণের অনুশাসনগুলি ভাল করিয়া পড়িয়াছিলাম—কিন্তু কিছুই মনে পড়িল না। পাশের বাড়ীর দরজা জানালা বন্ধ করিবার শব্দ। আমিও উঠিয়া দরজা জানালা বন্ধ করিলাম। ঘরে পানের জন্য জল রাখার নিয়ম। কিন্তু জল যে বাহিরে। আনিতে যাইব কি? ঘরের বাহির হওয়া যে বিপদ্‌জনক। কোন উচ্চ রাজকর্মচারী বলিয়াছিলেন, সাইরেণ বাজিলে ব্যস্ত হইবেন না, কর্তব্য স্থির করিবার আগে একটি সিগারেট ধরাইবেন। সিগারেট ধরাইব কি? আলো জ্বালিতে হইবে যে, ঘর অন্ধকার করিয়া বসিয়া আছি। বাড়ীতে আর দ্বিতীয় মানুষ নাই, গা কেমন ছম্ ছম্ করে। পৃথিবীতেও আর মানুষ আছে কি? পাড়া নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ট্রাম থামিয়া গিয়াছে। নতুবা শব্দ নাই কেন? ওঃ মোটর গাড়ী-খানা নিশ্চয় খুব জোর ছুটিয়াছে, তার শব্দ অস্পষ্ট হইতে স্পষ্টতার শিখরে উঠিয়া মুহূর্তমধ্যে আবার অস্পষ্ট হইয়া গেল। ও কি রিক্সার টুং টাং? লোকটার দুঃসাহস কম নয় তো? ছাপরা হইতে মরিবার জন্য এখানে আসিয়াছে? কোন ঘরে আশ্রয় নেয় না কেন? ও কিসের হুইসল? এ. আর. পি. কর্মচারীদের? চাকুরী করিতেছে বলিয়া কি সত্য সত্যই এ সময়ে বাহিরে যাইতে হইবে? 'সিক রিপোর্ট' দিলেই তো পারিত? বেলা ক'টা? তিনটা হইবে। সাইরেণ থামিয়া গিয়াছে। সাইরেণ থামিলেই বিপদ কাটে না—কিন্তু তবু কেন জানি মনটা হাল্কা লাগে। সময় আর কাটিতে চায় না, সে যেন চার প্রহরের চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছে। ঘরে যদি আর একটা লোক থাকিত! বাড়ীতে যদি আর একটা লোক থাকিত। পাশের বাড়ী এমন নির্জন কেন? সকলে পালায় নাইতো! এমন সময়ে পাশের বাড়ী হইতে একটি শিশুর ক্রন্দন। মানুষের কণ্ঠস্বর যে মানুষের এত প্রিয় তা আগে কে জানিত? মজ্জমান আমার মন শিশুর ক্রন্দনের ওই কুটাখানা অবলম্বন করিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিল। মানুষ, মানুষ, পাশেই মানুষ আছে। ফ্রাইডে-কে পাইয়া রবিনসন ক্রুশোরও নিশ্চয় এত আনন্দ হয় নাই। ওই! না! হাঁ, নিশ্চয়, ওই যে। অল ক্লিয়ার ধ্বনি। মুহূর্তে সমস্ত পাড়া মুখর হইয়া উঠিল। দরজা জানালা খোলার শব্দ, বাসনের ঝন ঝন, ঝাঁটার খস্ খস্। পাড়ার লোক রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, শ্যামের বাঁশীতে উদ্‌ভ্রান্ত গোপিনীদের মতো। কিন্তু শ্যামের বাঁশী কি সত্যই এত মধুর ছিল? নিশ্চয় একঘণ্টা আবদ্ধ ছিলাম, কিন্তু অপ্রিয়ভাষী ঘড়ি কেবল দশ মিনিটের সাক্ষ্য দিল।

এরপরে অনেকবার সাইরেণ বাজিতে শুনিয়াছি। রাতের বেলায় পাড়ার সাইরেণটা বাজিবার আগেই দক্ষিণ দিকের গুলা বাজিয়া ওঠে। সেটা শুনিয়া আর একটা বাজে, ক্রমে আর একটা। ধ্বনি ক্রমে নিকটতর হইতে হইতে শেষে কানের কাছেরটা চীৎকার করিয়া ওঠে—তখন সবগুলি মিলিয়া সেকি যুগান্তের ঐক্যতান! যেন কালান্তের শিবাদল সর্বনাশের প্রহর হাঁকিয়া মরিতেছে। প্রত্যেক বার সাইরণের সময়ে বাড়ীতে ছিলাম। কিন্তু প্রত্যেক বারই ভাবিয়াছি, যদি একবার পথে ঘাটে ধরা পড়ি! কি করিব? পালাইব, না দাঁড়াইব, না কারো বাড়ীতে ঢুকিব, না পরিখায় আশ্রয় লইব?

অবশেষে সত্য সত্যই গোরুর পালে বাঘ পড়িল। সন্ধ্যাবেলা সাইরেণ বাজিল। তখন আমি পথে, এক মুহূর্ত কিংকর্তব্যজ্ঞানহীন। তারপরে কেমন করিয়া জানি না, নিজেকে একটি পরিখার মধ্যে আবিষ্কার করিলাম। সকলের সঙ্গে ছুটিয়া আসিয়াছি। গর্তর মধ্যে আশে পাশে আরও লোক আছে, নিঃশ্বাসের শব্দ। মাথার উপরে আকাশ ছাড়া আর কিছুই নাই। কে একজন বিড়ি ধরাইবার জন্য দেশলাই জ্বালিতেই আর একজন কে ফুঁ দিয়া নিভাইয়া দিল পাশ হইতে কে আমাকে ঠেলা দিল, শুষ্ক কণ্ঠে পুছিলাম, কে? স্যার আমি? তুমি কে? স্যার, আমি, সেকশন এক্স, রোল নম্বর ইলেভন্‌। কি, চাও? সে একটু দ্বিধা করিয়া কাশিয়া লইয়া বলিল, গোটা কয়েক point। আমি ঠিক না বুঝিতে পারিয়া পুছিলাম—কিসের? রোল ইলেভন্‌ বলিল—Air Raid এর মানে এবার পরীক্ষায় Essay আসতে পারে, কি বলেন? তারপরে একটু থামিয়া বলিল—আজ মাথার উপরে Air Raid পাশে আপনি; point সংগ্রহের এমন সুযোগ আর আসবে না স্যার—kindly……

তার কথাই সত্য, সত্যই এমন সুযোগ আর আসিবে না। এক মুহূর্তের জন্য মৃত্যুকেও লোভনীয় মনে হইল।

রাস্তা পার হওয়া

সংসারে সবচেয়ে কঠিন কাজ পাওনা টাকা আদায় করা আর কলিকাতার রাস্তা পার হওয়া। অথচ প্রতিদিনই আমরা কতবার কলিকাতার রাস্তা পার হইতেছি, কাজটা যে এত কঠিন তা কি কখনো মনে হয়? হঠাৎ মনে হয় না বলিয়াই

লিখিয়া বুঝানো দরকার। একবার বুঝিতে পারিলে রাস্তা পার হইবার আগে ভাবিব—আর ভাবিতে সুরু করিলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

কলিকাতার রাস্তা তো রাস্তা নয়—যেন কীর্তিনাশা নদী। নিরন্তর চলাচলের ঢেউ উঠিতেছে আর তার আঘাতে কত মানুষের চাপড়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। এ-নদীতে কুমীর, হাঙর, মকরের মতো, কত ট্রাম, বাস, লরী। সম্প্রতি আবার খাল কাটিয়া কুমীর ঢুকিয়াছে, ইসারায় যাকে বলা হয় 'বিশেষ ধরণের গাড়ী।' একবার অমনোযোগের অবসরে পাইলে আর রক্ষা নাই। বিশেষ পেট্রল কমতির দিনে পথের বিপদ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। অনবহিত পথিককে পাশ কাটাইয়া যাইতে যেটুকু পেট্রল খরচ হইবে—তাহাই বা কোথা হইতে আসে?

মোটকথা কলিকাতার রাস্তা পার হওয়া চিরকালই কঠিন ছিল, এখন কঠিনতর হইয়াছে। আমি নিজে রাস্তা পার হই না, রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া পথিকের পার হওয়া দেখি! এ কম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নয়! আগে 'থ্রিলার' পড়িতাম; এখন এই 'থ্রিলিং' ব্যাপার দেখিয়া সময় কাটাই। কেহ কেহ রাস্তা পার হয়—অকুতোভয়ে, যেন বৈঠকখানা ঘরের মধ্যেই নিঃশঙ্ক বিচরণ করিতেছে। কেহ কেহ পার হয় নিঃশঙ্কতার ভান করিয়া, যেন নিতান্তই বেপরোয়া, কিন্তু চোখ দুটি কাঠ-বিড়ালির চোখের মতো অত্যন্ত সচকিত। কেহ কেহ বা রাস্তা পার হইবার আগে ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ এদিক্-ওদিকের গাড়ীর হিসাব করিয়া লয়; তাহারা এমন নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, যেন কোন ত্বরা নাই, তাড়া নাই, এখানে দাঁড়াইয়া থাকাই যেন জীবনের উদ্দেশ্য—কিন্তু যেমনি রাস্তা একটু ফাঁক হইয়াছে, অমনি মাছরাঙা যেমন মুহূর্ত মধ্যে ছোঁ মারিয়া মাছটা উঠাইয়া লয়, একছুটে তাহারা ওপারে গিয়া হাজির। আর একদল আছে, যাহারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রাস্তায় নামে, পথের মোড়ে গাড়ীর আভাস দেখিলেই আবার ফিরিয়া আসে। আবার নামে, আবার ফেরে; আবার ফেরে, আবার নামে; বেচারাদের চেষ্টার আর শেষ নাই। তাহারা দৌড়ায় না; গাড়ী চলাচল বিরতির মাহেন্দ্রক্ষণের উপরে তাহাদের ভরসা। এই শেষোক্ত দলের আমি বড় ভক্ত। কারণ তাহাদের চলাচলের একটা 'ফিলজফি' আছে। তাহারা বলিবে জীবনে কোন কাজেই আমাদের ত্বরা নাই, তবে রাস্তা পার হইতেই বা থাকিবে কেন? বিশেষ আধুনিক অসংযত জীবনে এইতো সংযমশিক্ষার একমাত্র অবসর। রাস্তা পার হইবার সুযোগ জীবনে উন্নতির সুযোগের প্রতীক; তারজন্য অপেক্ষা করিতে

হয়, পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, বিচার করিতে হয় এবং নির্বাচন করিতে হয়। অবশেষে সেই বহুবাঞ্ছিত অবসরটি আসিবামাত্র তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু লোকে বোকা বলিবে—এইতো? তা বলিবে বটে। কিন্তু 'স্মার্টলি' রাস্তা পার হইতে গিয়া চাপা পড়িলে—সেই বোকাই বলিবে, অধিকন্তু প্রাণটাও যাইবে। ইহাদের কাছে রাস্তা পার হইবার চরম রহস্য শুনিয়াছি—মেমসাহেব ও গোরুর গাড়ীর পিছনে পিছনে রাস্তা পার হইবে—ইহাদের কেহ কখনো চাপা দিতে সাহস করে না।

কিন্তু এদের চেয়েও বেশী ভক্তি করি সেই ক্ষুদ্র দলটিকে, রাস্তার ধারে গিয়া যাহারা রাস্তা পার হইতে ভুলিয়া যায়। রাস্তা পার হইতে ভুলিয়া গিয়া যাহারা পথের জনতার দিকে তাকাইয়া থাকে। বাস্তবিক এত বিপদ মাথায় লইয়া রাস্তা পার হইবার এমন কি প্রয়োজন? পথের দিকে তাকাইয়া পথ পার হইবার প্রয়োজন অতিক্রম করা কি যায় না? ওই যে ট্রাম, বাস, মোটর, রিক্স, পদাতিক, রথী; হাজার হাজার যানবাহনের হাজার রকম স্বর; আর সবশুদ্ধ মিলিয়া একি দিব্য ঐক্যতান! এমন আর কোন্ সঙ্গীতশালায় আছে? চোখ ভরিয়া, কান ভরিয়া, একি গীতিচিত্রের প্রস্রবণ! আর পথের মোড়ে লালপাগড়ি মাথায় পুলিশটা সেতো এই বিরাট ঐক্যতানের 'ব্যাণ্ডমাষ্টার'। তালে তালে হাত নামাইয়া আর তুলিয়া এই নগরসঙ্গীতকে সেই তো চালনা করিতেছে। ছবির এই সমগ্রতা একবার চোখে পড়িলেই রাস্তা পার হওয়াব কথা আর মনে থাকে কি! রাস্তা পার হওয়া কঠিন—কিন্তু এই সমগ্রতাকে দেখা তার চেয়ে সহজ নয়।

আমি যদি আর কেহ হইতাম

আমি যদি আর কেহ হইতাম তবে আমাকে কেমন দেখিতাম? সেই আর-কেহ-আমি কি এই আমিকে পছন্দ করিত? আমার গুণ (আছে কি?) কি তার ভালো লাগিত? আমার দোষ (অল্প নয়) কি সে ক্ষমা করিত? আমার রসিকতায় (শুনিয়াছি নাকি অনেকের ভালো লাগে) সে কি হাসিত? আমার লেখা (শুনিতে ইচ্ছা করি নাই তবু শুনিতে হইয়াছে) কারো ভালো লাগে না, সেও কি সেই দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত না! মনে করো, রাস্তার এ ফুটপাত দিয়া আমি যাইতেছি, আর ওদিকের ফুটপাত দিয়া সেই আর-কেহ-আমি

যাইতেছে, সে কি মাঝে মাঝে আমার দিকে কটাক্ষ করিয়া ভাবিবে না, লোকটা কি অদ্ভুত। কিম্বা জনতার ভিড়ে আমি এতই নগণ্য যে, হয়তো আমি তার চোখেই পড়িব না!

কিন্তু হঠাৎ এ অদ্ভুত কল্পনা কেন? আর-কেহ হইবার জন্য আর কারো চোখ দিয়া নিজেকে দেখিবার এ বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা কেন? কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা কি কেবল আমারি? এ কি মানুষমাত্রেরই সাধারণ আকাঙ্ক্ষা নয়?

আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলেই মুখ ভেঙাইতে ইচ্ছা করে। তার অর্থ কি? মুখ বিকৃত করিয়া আমার মুখে আর-কেহকে সৃষ্টি। তখন আয়নার মাধ্যমে আমাতে ও আর-কেহ-আমাতে মুখোমুখি হয়, হয়তো মোকাবিলাও চলে।

আবার, ছবি তোলার দোকানে গিয়া বিচিত্র সাজ পরিয়া ছবি তোলাতেও কি এই আর-কেহ সাজিবার প্রয়াস নাই? কেহ কাবুলীওয়ালা সাজে, কেহ চীনাম্যান সাজে, কেহ ভিখারী সাজে, কেহবা রাজা মহারাজা সাজে। সবই ওই আর-কেহ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। ওদের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে আর-কেহ-আমাকে খুঁজিয়া বাহির করাই এই আমার ইচ্ছা।

Fancy Fair বা সঙের মেলাতে দলে দলে উড়ে, নিগ্রো, সাহেব, পুলিশ, ভিখারী, মহাজন ঘুরিয়া বেড়ায়। পরস্পরকে দেখিয়া তারা হাসে, রাগে, কথা-বার্তা বলে, আসলে কিন্তু তারা সকলেই পরিচিত-আমিকে খুঁজিয়া বেড়ায়। পরিচিত-আমি সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে আছে অথচ খুঁজিয়া পাইতেছে না—এতেই সঙের মেলার আনন্দ জমিয়া ওঠে। এই আমি সেই আর-কেহ আমির জনতায় একেবারে অগ্রাহ্য হইয়া হারাইয়া গিয়াছি।

এই জন্যই যমজ চেহারার লোক এমন রহস্য কৌতুকময়। যমজ চেহারার মধ্যে আমি ও আর-কেহ-আমি এমন নিখুঁতভাবে মুখোমুখী, এক চেহারা, এক কণ্ঠস্বর, এক ভাবগতিক, একই ব্যক্তিত্ব, ওরা যেন বস্তুময় ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি।

ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতেও মানুষ যেন আর-কেহকে অন্বেষণ করে। পাহাড়ে জায়গায়, জলের ধারে ছোট ছেলেরা শব্দ করে, প্রতিধ্বনির কণ্ঠে আর-কেহ-র সাড়া ফিরিয়া আসে। গ্রামোফোনের রেকর্ডে নিজের স্বর শোনা ঠিক নিজের স্বর শোনা নয়, আর-কেহ-র কণ্ঠে নিজের স্বর শোনা, তাতে একটু বিশেষ আনন্দ আছে।

মরুক্ গে, তত্ত্বকথা লিখিতে বসিতে নাই। কলিকাতার পথে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন কার্জন পার্কের মধ্যে আমাতে ও আর-কেহ-আমাতে হঠাৎ দেখা

হইয়া যাইবে, সেই আশায় আছি। উৎসুকভাবে দু'জনে কাছাকাছি আসিয়া ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া ফেলিব, দু'জনেই একসঙ্গে বলিব, মশাইকে যেন চেনা-চেনা লাগে, কোথায় যেন দেখিয়াছি। কোথায়, কবে, কখন কারো মনে পড়িবে না। দু'জনে দু'জনের নাম শুনিয়া ভাবিব, যেন জানা-জানা নাম! নাম ধাম, কাজ সবই কেমন যেন পরিচিত, তবু ধরিবার উপায় নাই, যেন কাচের আবরণের ওপারের জিনিষ। "আসুন ডালমুঠ খাওয়া যাক্" বলিয়া দু'জনে ডালমুঠ খাইতে থাকিব আর ভাবিব, লোকটা যেন চেনা-চেনা, একটু পাগলাটে ধরণের কিন্তু মন্দ নয়। তারপরে দু'জনে দু'দিকে রওনা হইব। সারাপথ প্রশ্নটা খোঁচা দিতে থাকিবে, কোথায় যেন দেখিয়াছি। রাত্রের স্বপ্নে লোকটার ব্যক্তিত্ব স্থচ ফুটাইতে থাকিবে। ভোর বেলা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিব। ওইতো আমার সেই আর-কেহ। যাকে সারাজীবন খুঁজিয়া মরিতেছি কাল অজ্ঞাতসারে তার সঙ্গে দেখা হইয়া গিয়াছিল। নূতন উদ্যমে আবার তার খোঁজ সুরু করিব কিন্তু আর তার দেখা মিলিবে না! সেও আমাকে বৃথা খুঁজিয়া মরিতেছে!

টেলিফোন

আমার টেবিলের উপরে ওই যে যন্ত্রটা নতমুখে ভালো মানুষের মতো পড়িয়া আছে, ওটার প্রতাপ বড়ো কম নয়, ইচ্ছা করিলে এখনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া মহাসোরগোল বাধাইয়া দিতে পারে। ওর যে কতখানি প্রভাব তোমার উপরে তুমিও তো জানো না। এখনি ওর কিঙ্কিণী বাজিয়া উঠুক, সাগ্রহে ওকে কানে তুলিয়া লইবে—হ্যালো, হ্যালো। আশা, আনন্দ, ভীতি, নৈরাশ্য, বিরক্তি যে কোন ছাপ তোমার মুখে ও আঁকিয়া দিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম ওর প্রভাব বড কম নয়। কিন্তু দুঃখ করিবার কিছুই নাই, ওর খাতিরে তোমার প্রতাপ কত বাড়িয়া গিয়াছে জানো? এমন কোন্ রাজা মহারাজা আছে যাকে এই মুহূর্তে তুমি বার দুয়েক মাত্র হ্যালো হ্যালো করিয়া চঞ্চল না করিয়া দিতে পারো? বোধ করি লাট-বেলাটও এই ডাকিনীর ডাকে সাড়া না দিয়া পারে না।

বাস্তবিক এই যন্ত্রটার শক্তিকে ডাকিনীর শক্তি ছাড়া আর কি বলিব? কামাখ্যার পাহাড়ে নাকি ডাকিনীদের হেডকোয়ার্টার, তাদের অসীম ক্ষমতা, তারা রাতারাতি শূন্যপথে গাছ চালান করিয়া দেয়, দূরের মানুষ কাছে আনিতে পারে,

উচাটন মারণক্রিয়ায় তারা পারদর্শী, পুরুষমানুষ সেখানে গেলে তাকে ভেড়া বানাইয়া ফেলে; এই ক্ষমতা সেই কামাখ্যার ডাকিনীদের, সেখানে সবাই তারা মেয়েমানুষ। এই টেলিফোন-ডাকিনীর মূলাধার সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীলোকের দ্বারা শাসিত। সেখানে পুরুষের প্রবেশের হুকুম নাই। অবাধ্য পুরুষ প্রবেশ করিলে বোধ করি ভেড়া বনিয়া যায়। টেলিফোন যন্ত্র স্ত্রীলোকের দ্বারা চালিত বলিয়াই কি কতক পরিমাণে স্ত্রীলোকের গুণ পাইয়াছে? স্ত্রীলোকের কিঙ্কিণীর ঝঙ্কার, স্ত্রীলোকের মুখের ভাষণ, স্ত্রীলোকের রহস্যময়তা। কিন্তু সবচেয়ে বেশী করিয়া পাইয়াছে স্ত্রীলোকের মতো হতভাগ্য স্বামীকে ইঙ্গিতমাত্রে কানে ধরিয়া ওঠানো বসানোর ক্ষমতা আর পরস্ত্রীর মতো ক্ষণকালের জন্য Wrong Connection-র ছলনায় মুগ্ধ করিয়া অকস্মাৎ পলায়ন।

ঠিক এই মুহূর্তে টেলিফোনযোগে কত রকম সুখদুঃখের লীলা চলিতেছে কল্পনা করিতে পারো কি? কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কারো বিরক্তি, কারো নৈরাশ্য, আর কেহ বা Wrong Connection এ বিভ্রান্ত হইয়া প্রণয়িনীর অপেক্ষায় কার্জন পার্কের মধ্যে ক্রমাগত পাক খাইয়া মরিতেছে। পৃথিবীর এমন দেশ নাই, এমন শহর নাই যেখানে এই ডাকিনী মায়াজাল না প্রসার করিয়াছে। রাজার প্রাসাদ হইতে মহাত্মাজীর কুটীর সর্বত্র এর সমান প্রসার, বোধ করি এতদিনে তিব্বতের লামার মঠেও এই কুহকিনী প্রবেশ করিয়াছে।

এই দেখ, পাশের বাড়ীতে মায়াবিনী এই মুহূর্তে কি কাণ্ডই না বাধাইয়া দিয়াছে। একবার টেলিফোন ঝঙ্কার দিয়াছিল, নূতন চাকর ধরিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে, তার ফলে দুই ভাই, দুই ভাইয়ের স্ত্রী, এক বোন—পাঁচজনে প্রথমে চাকরের উপর আসিয়া পড়িল এবং শেষে চাকরকে ছাড়িয়া পরস্পরের উপরে পড়িল, কে ডাকিয়াছিল? বড় ভাই ডাক্তার, তার বিশ্বাস "Call", ছোট ভাই কনট্রাক্টর, কেহ অর্ডার দিতে উদ্যত হইয়াছিল; দুই স্ত্রীর প্রত্যেকের বিশ্বাস তাদের বাড়ী হইতে খোঁজ করিয়াছিল, ছোট বোন অব্যক্ত অভিযোগ স্পষ্ট করিয়া বলিতে না পারিলেও আমি বেশ বুঝিতেছি কোন—দাদা সিনেমার টিকিট কিনিয়া সময় জানাইয়াছিল। সে ভাবিতেছে আমার কাছে 'নো রিপ্লাই' পাইয়া এক্ষণে বোধ করি দাদা সি. সি. বোসের কাছে গেল। পাশের বাড়ীর কলহ ক্রমেই বাড়িতেছে, শান্তিভঙ্গের উপক্রম, এমন সময়ে—ক্রিং ক্রিং ক্রিং। পাঁচজনে এক সঙ্গে গিয়া যন্ত্রটার উপর পড়িল! "হ্যালো-হ্যালো—ও আপনিই এখনি ফোন

করেছিলেন? কি চাই? কি? বাড়ীর ভাড়া? পাঁচ মাস বাকি পড়েছে! আচ্ছা আপনি ধরুন দাদাকে দিচ্ছি।" ছোট বোনের গলা। মুহূর্তে বাড়ী নীরব হইয়া গেল। সত্যই 'মায়াবিনী' তোমার অসাধ্য কিছু নাই। তুমিই একাধারে কামিখ্যের ডাকিনী এবং শেক্সপিয়রের চতুর্থতম ডাকিনী।

সোডার বোতল

সংসার যেন ক্রমেই রোমান্স বর্জিত হইয়া পড়িতেছে। দৃষ্টান্তের জন্য বেশী দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই—পাশের পানের দোকানের সোডার বোতলটিই যথেষ্ট। সোডার বোতলটাও সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে রোমান্সহীন পাতলা কাচের একটি আধারে পরিণত হইয়াছে, নিছক প্রয়োজনের বেশী আর কিছু তাহাতে নাই। আগের সেই পুরু কাচের বোতলের সঙ্গে এর তুলনা করো। সে বোতল প্রয়োজনের ছিল আবার প্রয়োজনের অতিরিক্তও ছিল, সেই অতিরিক্তটুকু রোমান্স। কোথায় গেল সেই পুরু কাচেব বোতল—যার গলার কাছে ছুটা খাঁজ-কাটা; রবারের আংটার সঙ্গে একটা কাচের গোলক-আঁটা সোডার বোতল মেদবহুল ধনী গৃহিণীর মতো। সুনিপুণ চাপের ফলে গোলকটা সরিয়া গেলেই বায়ুস্ফীত জলরাশির সেকি উৎসারণ। আর যদি আনাড়ির মতো বেকায়দায় চাপ দাও তবে আর রক্ষা নাই—মোটা কাচের টুকরা তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো আশেপাশের লোকদের দেহ রক্তাক্ত করিয়া দিবে। আবার কল্পনা করো -রাস্তায় দুই দলে বচসা বাধিয়াছে, বাক্যবলের পরে বাহুবল, কিন্তু নিরস্ত্রদের অস্ত্র কোথায়। পাশের পানের দোকানের ওই সোডার বোতলই নিরস্ত্রদের অস্ত্র, নূতন যদুবংশের কাচের মুষল। দেখিতে দেখিতে সোডার বোতলগুলি জনতার হাতে গিয়া উঠিল। তারপরে একটু ঝাঁকানি খাইয়া আকাশে গিয়া উঠিল এবং মুহূর্তের মধ্যে নিরীহ পানীয়ের বোতল উড়ন্ত বোমার মারাত্মকতা লাভ করিল! তারপরে ভাঙা বোতল, আর ফাটা মাথা, তারপরে, দৌড়াদৌড়ি আর রক্তারক্তি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। শূন্য রণক্ষেত্রে এবার ক্যাম্প ফলোয়ারদের আবির্ভাব। এতক্ষণ যে বালকের দল দূরে দাঁড়াইয়া এই যুদ্ধের রস গ্রহণ করিতেছিল এবার তাহারা আসিয়া পড়িল। কাচের গোলক আর রবারের আংটা কুড়াইবার লোভে। তাদের কাছে সোডা পানীয় এবং হানীয় কিছুই নয়—গোলক ও আংটার দুর্লভ আধার।

আমার মনে আছে, আমি যখন বালক মাত্র ছিলাম (এখনও বুদ্ধিতে আছি) সোডার বোতলের তলাকার একটা মোটা কাচ পাইয়াছিলাম। সেটা ছিল আমার কাছে জ্ঞানের দিব্য নেত্র। যার উপরে ওই কাচের খণ্ডটা ধরিতাম সেই বস্তুই রোমান্সের বিরাটত্ব, রোমান্সের অপূর্বত্ব লাভ করিয়া পরিচিত রূপের জীর্ণচীর পরিত্যাগ করিয়া দেখা দিত। অক্ষরগুলি রক্ত খাওয়া জোঁকের মতো ফুলিয়া উঠিত, মানুষের রাবণ রাজার মুখ হইয়া উঠিত—এক মুণ্ডের আয়তনেই দশ মুণ্ডের বস্তু-ঠাসা; দূরের ঘরবাড়ী গাছপালাগুলা রামধনুর জরির চাদর পরা; পৃথিবী রঙীন, আকাশ বিচিত্র, সংসার অভিনব—ওই কাচখানাই ছিল আমার আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ। আর শুধু তাই নয়, ওই কাচখানাই ছিল আমার ভস্মলোচনের রুষ্ট চোখ। রোদের সাহায্যে যেখানে সেখানে ওর আলোক ফেলিয়া আগুন জ্বালানো ছিল সেদিনের বালকের একটা সখ। আজ কোথায় গেল এত রোমান্সে ভরা সেই সোডার বোতল! আজও সোডা আছে, তার বোতলও আছে, কিন্তু সে রোমান্স কোথায়? এ বোতল ভাঙে, কিন্তু কারো মাথা ভাঙার কাজে লাগে না; এ বোতলে তৃষ্ণা মেটায়, কিন্তু রোমান্সের তৃষ্ণা মেটে কি? কোথায় এর গোলক, কোথায় এর আংটা—হায় এর ভাঙা তলা নিতান্তই কাচের টুকরা · তার বেশী আর কিছুই নয়।

আধুনিক যুগের রোমান্স নাকি রেল, টেলিগ্রাফ, রেডিও, এরোপ্লেন। কিন্তু কথাটা কি সত্য? টেলিগ্রাফে রোমান্স আছে বটে কিন্তু তা খবর চলাচলের দ্রুতিতে নয়, একগোছা তার খুঁটির মাথায় মাথায় কত পাহাড়-পর্বত, নদনদী, বনপ্রান্তর পার হইয়া কোন্ রাত্রির অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে—সেই তো টেলিগ্রাফের রোমান্স। নিছক দ্রুতিতে রোমান্স নাই একথা কালিদাস জানিতেন. তাই যক্ষের সংবাদ বহনের ভার বিদ্যুৎকে দেন নাই; মন্থর মেঘকে দিয়াছিলেন। মন্থরতায় রোমান্স। ডিকেন্সের একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে যে রোমান্স আছে, রাজকীয় বিমানবাহিনীর হাজার হাজার এরোপ্লেনে তাহার লেশমাত্র নাই। আবার একখানা গোরুর গাড়ীতে যে রোমান্স আমেরিকার যাবতীয় 'পুলম্যান কারে' তাহা নাই। রোমান্স-বিসর্জী বর্তমান যুগে গোরুর গাড়ীখানা এখনো রোমান্সের শেষ স্মৃতিচিহ্নের মতো পড়িয়া আছে। ওই প্রাচীন, মন্থর, বিফল বস্তুটা যেন আদিম যুগের ম্যামথ, লোমশ হস্তীর সগোত্র। বেশ বুঝিতেছি কিছুকাল পরে ওটাও ওইসব লুপ্ত জন্তুদের লেজ ধরিয়া চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে।

তখন মাঝে মাঝে হঠাৎ আবিষ্কৃত গোরুর গাড়ীর ভগ্নাবশেষের দিকে পুরাকালের জন্তু-জানোয়ারের মতো কি ঔৎসুক্যে লোকে তাকাইয়া থাকিবে!

কিন্তু রোমান্স-বর্জিত জগতে মানুষে বাঁচিতে পারে কি? এমন চিরকাল থাকিতে পারে না। আবার রোমান্সের জগৎ ফিরিয়া আসিবে—কিম্বা জগতের রোমান্স তেমনিই আছে, মানুষ দৃষ্টির নবীনতাই ফিরিয়া পাইবে। সেই তো তাহার পুনর্জন্ম; সদ্যোজাত বালকের অবাক্ দৃষ্টি যখন সে ফিরিয়া পাইবে, সেইতো তাহার সত্যযুগ; যখন সজীব, সক্রিয় জগতে আবার সে চলাচল সুরু করিবে, যখন হঠাৎ সে আবিষ্কার করিয়া বসিবে আকাশ নীল, তৃণ শ্যামল, জল কোমল, বাতাস স্নিগ্ধ, উষাসন্ধ্যা প্রাণের রঙে সিঞ্চিত, মানুষ সুখে দুঃখে ভালয় মন্দয় অপূর্ব, অপার্থিব জীব তখন অবাক্ বিস্ময়ে কবির ভাষায় সে বলিয়া উঠিবে··'অহো উদার রমণীয়া পৃথিবী!' রোমান্স-বর্জিত এযুগে কবিরা সেই চিরকালের সুরটি ধরিয়া আছেন··সেদিন কবির সুরে আর মানুষের কণ্ঠে···একই সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিবে···'অহো উদার রমণীয়া পৃথিবী!' সেইতো মানুষের মুক্তির সুর, সেইতো মানুষের মুক্তি, রিয়ালিজমের নাগপাশ হইতে নবজাগ্রত মানুষের মুক্তি।

জুতার জাতি

কার্লাইল পোষাকের ফিলজফি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উন্নত দৃষ্টি জুতা পর্য্যন্ত নামে নাই। জুতাতত্ত্ব এই নিম্নদৃষ্টি লেখকের অপেক্ষায় এতদিন ছিল।

জুতাতে জাতিভেদ আছে একেবারে রীতিমত চাতুর্বর্ণ্য। চটি জুতা ব্রাহ্মণ; বুটজুতা ক্ষত্রিয়; শু-জুতা বৈশ্য, আর নাগরাই ও কাবুলি শুদ্র। খড়মটাকে বাদ দিলাম কেন? খড়ম চতুর্বর্ণের মধ্যে নয়; খড়ম বর্ণাতীত, খড়ম সন্ন্যাসী, তাহার কোন জাতি নাই, চিহ্ন নাই, এক সময়ে হয়তো সে সংসারী ছিল, এখন দণ্ডকমণ্ডলু ভাসাইয়া দিয়া সে বর্ণাশ্রমের অতীত।

চটিজুতা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে তার যোগ অনিবার্য্য; ব্রাহ্মণের মত তার স্বল্প বেশ, অল্প আড়ম্বর, প্রতি পদক্ষেপে চটপট শব্দ করিয়া ব্রাহ্মণের মতই অনুক্ষণ সে শাস্ত্র আবৃত্তিতে মুখর; আবার নিমন্ত্রণভোজী ব্রাহ্মণের মত আগাগোড়াই তার পেট, এতটুকু জুতার মধ্যে এমন অনায়াসে মস্ত একখানা

পা যে ঢুকিয়া যাইতে পারে, না দেখিলে কি তাহা বিশ্বাস হইত! লাল নরম চামড়ায় তৈয়ারী সৌখীন বিদ্যাসাগরী চটিটাও কি তবে ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণ বই কি! তবে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ নয়, হালের আমদানি 'কাল্‌চারাল', ব্রাহ্মণ, যাহারা ভোজনে শ্বাপদ-দ্বিপদ মানে না, স্পর্শদোষ মানে না, জাতিভেদ মানে না, জার্মানিতে ছাপা সংস্কৃত শাস্ত্রের গ্রন্থ লইয়া যাহারা পড়ে, বিদ্যাসাগরী চটি সেই 'কাল্‌চারাল' ব্রাহ্মণ! আর সাহেবী দোকানের সৌখীন দামী চটি, চটি নামটাতেও যার আপত্তি, স্লিপার নামে যে আত্মপরিচয় দেয়, সেটা তবে কি? এই স্লিপার চটি 'পলিটিক্যাল' ব্রাহ্মণ! 'পলিটিক্যাল' ব্রাহ্মণ সাহেবের হাতেরই তৈয়ারী বটে! ড্রয়িংরুমের কার্পেটের উপরে সে নীরবে সঞ্চরণ করে—কিন্তু দেশাত্ম বক্তৃতায় তাহার চটপটি আসল চটিকে ছাপাইয়া যায়। ব্রাহ্মণের মতই ভিক্ষায় তার আপত্তি নাই; ভোট-ভিক্ষুক এই 'পলিটিক্যাল' ব্রাহ্মণ!

বুটজুতা ক্ষত্রিয়, বুট পরিলেই লাথি মারিতে ইচ্ছা করে। ওই স্থূলকায় লোহার পেরেক বসানো ভারি বুট জোড়া যেন শ্বাপদের পায়ের হিংস্র নখ, মানুষের পায়ে উঠিবামাত্র মানুষ হিংস্র হইয়া ওঠে। তাই সৈনিকের পায়ে বুট জুতা আঁটিয়া দেওয়া হয়, মুহূর্তে নিরীহ দ্বিপদ আস্ত একটা শ্বাপদ হইয়া সঙ্গীনের নখ উঁচাইয়া অকারণ উল্লাসে অপরিচিতের প্রাণ বধ করিতে ছোটে। বুট জুতায় মানুষের শ্বাপদীকরণ। পৃথিবীতে যুদ্ধ বন্ধ করিতে চাও? অস্ত্র হ্রাস করিয়া ফল নাই। বুট জুতা তৈয়ারী বন্ধ কর—যুদ্ধ থামিবে। তখন অস্ত্র থাকিলেও কেহ তাহা স্পর্শ করিবে না। চটি জুতা পায়ে দিয়া কে কবে কামান চালনা করিয়াছে? ঠিক কথা, সৈনিকের পা হইতে বুট খসাইয়া চটি পরাইয়া দাও, শ্বাপদ আবার মানুষ হইবে, ক্ষত্রিয় আবার ব্রাহ্মণ হইবে, বড় জোর তখন দক্ষিণার ভাগ লইয়া লাঠালাঠি হইবে—কিন্তু যুদ্ধের ওখানেই ইতি।

শু-জুতাকে বৈশ্য বলিয়াছি। অফিসের সঙ্গে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। ব্যবসায়ীর মতো ও মোলায়েম, তৈল-চিক্কণ এবং প্রিয়-ভাষী, অবশ্য দরে না বনিলে শেষ পর্য্যন্ত মস্‌মস্‌ করিয়া উঠিতে দ্বিধা বোধ করে না; আর আপাত-কোমলতার তলে তাহার 'সোল'-টা ব্যবসায়ীর মতোই কঠিন। বণিক্‌ ইংরাজের সঙ্গেই ওই ব্যবসায়ীর এদেশে আবির্ভাব।

নাগরাই ও কাবুলি জুতা শূদ্র। মোটা চামড়ায় স্থূল হাতে নাগরাই জুতা প্রস্তুত; সকলের পায়ে সাজে না, মজবুত পা না হইলে কাটিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া

যায়। ওই জুতাকেই দেখিয়াছি বাঁধানো লাঠি হাতে, পুঁটুলি কাঁধে চাকুরি খুঁজিয়া বেড়াইতে; ওই জুতাকেই ডাকঘরের অমল রোগশয্যার জানালা হইতে দেখিয়াছিল, ঝরণার ধারে, ডুমুর গাছের তলায় পুঁটুলি হইতে ছাতু বাহির করিয়া খাইতে; চিরকালের চাকুরি-খোঁজা ওই নাগরাই জুতা। কাবুলি জোড়াও শূদ্র তবে নাম ভাঁড়াইয়া, চেহারা বদলিয়া ড্রয়িংরুমে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ওর স্থূল গঠনে, কর্কশ স্বরে সর্বকার্য্যোপযোগিতায় জাত পরিচয় ধরা পড়িয়া যায়। ওটা সখের শূদ্র! কিন্তু সে জন্য কি ওর সঙ্কোচ আছে? কাবুলির এখন বড়ই আদর, আমরা সবাই এখন কাবুলি ধরিবার মুখে। চটির দিন গত, বুটের দিন গতপ্রায়; এখন শু, নাগরাই ও কাবুলির যুগ; আমরা হয় এখন ব্যবসায়ী নয় বেকার, আর নয় কাবুলিপরিহিত সখের শূদ্র!

চাতুর্বর্ণ্যের অবসান একবর্ণত্বে, যখন জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, চিহ্ন সব খসিয়া পড়িবে। কবে সেই একবর্ণত্ব? কি সে সেই একবর্ণত্ব? খালি পায়ে কি? যখন চটি চটপটি করিবে না; বুট গট্‌গট্‌ করিবে না, শু মস্‌মস্‌ করিবে না, নাগরাই খট্‌মট্‌ করিবে না আর কাবুলি জোড়া ঝুলিঝোলা লইয়া কাবুলিওলার মতই অন্তর্ধান করিবে। আর কবে আসিবে সেই খালি পায়ের খোলা মাটির উপরে পড়িবার দিন, প্রতি পদক্ষেপে যখন মানুষে আর মাটিতে আলিঙ্গন চলিতে থাকিবে? সেই তো বহুপ্রতীক্ষিত সত্যযুগ! জুতার কাঁটা মানুষের পায়ে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ভূতের ভয়

পাঠক, তোমর কি ভূতের ভয় আছে? আচ্ছা, উত্তর দিতে তোমার যদি সঙ্কোচ বোধ হয়, তবে না হয় উত্তর না-ই দিলে। তোমার হইয়া আমিই উত্তর দিতেছি। আমার ভূতের ভয় আছে। শুধু যে আছে তা-ই নয়। ভূতের ভয় করিতে আমি ভালবাসি। দিনের বেলায়, লোকের মধ্যে ভূতের ভয় করি না, কিন্তু রাত্রি যখন অন্ধকার হইয়া আসে, লোকসমাগম বিরল হয়, তখন ভূতের ভয় না করে এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। রাত্রিবেলা, ঘরের মধ্যে কয়েকজনে জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া আছি; বাহিরে ঝুপঝুপ করিয়া বৃষ্টি, দমকা বাতাস দরজা-জানালাগুলা নাড়া দিয়া কঙ্কালের শুষ্ক শব্দ তোলে, বিদ্যুৎ চমকে ঘরের দরজা-জানালা দেয়ালের যতো রন্ধ্র প্রকাশ হইয়া পড়ে, মেঘের সর্দি-জড়িত ভারি

চাপা আওয়াজ, এহেন সময়ে ভূতের গল্পের মত এমন মুখরোচক কি আর আছে? যেন লঙ্কার ঝাল, মুখ জলিয়া যায় তবু ফেলিতে মন সরে না। বিদ্যুৎ চমকিল, মেঘ ডাকিয়া উঠিল। প্রকৃতির কাছে উৎসাহ পাইয়া কথক বলিয়া চলিয়াছে—"আমরা ক'জন চলেছি, প্রকাণ্ড মাঠ, অন্ধকার রাত, পথ যে কখন্ হারিয়ে ফেলেছি।" আমরাও কখন্ বিশ্বাস অবিশ্বাসের সীমানা হারাইয়া ফেলিয়াছি—এখন কেবল সুখকর ভীতিবোধের তেপান্তরের মাঠের মধ্যে দিয়া চলিয়াছি—প্রত্যেকে একা।

পাঠক, এমন অভিজ্ঞতা যদি তোমার কখনো না হইয়া থাকে, তবে তোমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য। ভূতের ভয় মানুষের একরকম বিলাস, মানুষ ইহা সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। ভূত আছে কি নাই জানি না। পৃথিবীতে এত বিচিত্র পদার্থ সম্ভব আর একমাত্র ভূতই অসম্ভব, মনে হয় না। যাই হোক, ভূত না থাকিলেও ভূতের সত্তা মানুষকে সৃষ্টি করিতেই হইত। নতুবা এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইতে সে বঞ্চিত হইত। বালক নেলসন নাকি কখনো ভয় পায় নাই। তাহার ভাগ্যকে ঈর্ষা করি না। মানুষের একটা অভিজ্ঞতা হইতে সে বঞ্চিত। তাহার জগৎ আর দশজনের জগতের চেয়ে সঙ্কীর্ণতর। কিম্বা নেলসনের যে ভূতের ভয় ছিল না ইহা বোধ করি কিম্বদন্তী মাত্র। নতুবা ঠিক মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কেন বলিতে যাইবে—'হার্ডি, আমাকে চুম্বন করো।' জীবনে যে কখনো ভয় পায় নাই, সেই বীর পুরুষও ওই চুম্বনের সূত্র হাতে না ধরিয়া মৃত্যুর গোলকধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস পায় নাই। আসন্ন মৃত্যুর পূর্বে তাহার অতিমানুষিক মুখোসটা খসিয়া পড়িয়াছে; আর অতিমানুষ সাধারণ মানুষ হইয়া উঠিয়া হার্ডির চুম্বন কপালে আঁকিয়া প্রস্থান করিয়াছে। মায়ের হাত ধরিয়া শিশু অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিল। ভাগ্যে নেলসনের জীবনের ওই শেষ ঘটনাটি জানা গিয়াছিল—নতুবা সে কি কখনো মানুষের হৃদয়ে স্থান পাইত! ইতিহাসের সিংহদ্বারে মাত্র থাকিয়া যাইত।

আচ্ছা মানুষে তো ভূতকে ভয় করে কিন্তু ভূতেরও কি মানুষের ভয় নাই? মানুষে মানুষকে ভয় করিয়া চলে—সেই মানুষ যে মরার পরেই জীবনের অভিজ্ঞতা ভুলিয়া যাইবে এমন মনে হয় না। আমাদের সমাজে ভূতের গল্পের মত ভৌতিক সমাজে মানুষের গল্প প্রচলিত। মানুষের নামে তাহাদের গায়ে কাঁটা দেয়; সন্ধ্যার অন্ধকারে আসর জমাইয়া বসিয়া মানুষের গল্প শোনা তাহাদের

এক রকম বিলাস। সেই জন্যই বোধ করি ভূতেরা লোকালয়ে বড় আসে না; তাহারা থাকে পোড়ো বাড়ীতে, বিলে জলায় আর অশথ-শ্যাওড়া-বটে। আমরা যেমন ভূতের ওঝা ডাকি, ওরা তেমনি ডাকে মানুষের ওঝা। তারা মন্ত্র পড়িয়া মানুষ তাড়ায়। কি মন্ত্র? কি জানি! কোন্ কথা শুনিলে মানুষে ভয় পায়? হয়তো মানুষের ওঝা মানুষের পাওনাদারের নামাবলী উচ্চারণ করে—সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সে রাজ্য ছাড়িয়া পালায়। ভূত-সমাজের নিয়ম মানুষের পক্ষে নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত। তবে এইটুকু বলা যায় যে, মানুষের ভূতকে ভয় করিবার চেয়ে ভূতের মানুষকে ভয় করিবার অধিকতর কারণ আছে। আর না থাকিলেই বা কি? ভূতের ভয়ের কথাই আমরা এখন ভাবিতেছি, মানুষের ভয়ের কথা নয়।

ভূতের ভয় মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অন্যতম, ইহা একপ্রকার সুখকর দুঃখ, প্রীতিকর ভয়। ইহা বিশেষভাবে মানুষের গুণ, কারণ দেবতার ভয় নাই। কাজেই ভূতের ভয়ে মনুষ্যত্বের পরিচয়—ইহাতে লজ্জার কিছুই নাই। দু'চারজন বীর পুরুষের যদি ভূতের ভয় না থাকে তো নাই থাক—সংসারে অতিমানুষ আর কয়জন? বিশেষ আমাদের আদর্শ অতিমানুষ নয়, আমাদের আদর্শ পাঠক, তোমার আমার মত সাধারণ মানুষ।

আপনি কি হারাইতেছেন, জানেন না

সম্প্রতি খবরের কাগজে নিয়মিত লিখিতেছি। রবিবারের কাগজের একটি কলম জুড়িয়া আমার লেখা বাহির হয়। শনিবার সন্ধ্যায় কি অধ্যবসায়েই না এই গুম্ভটি গাঁথিয়া তুলি; সারারাত্রি ধরিয়া ছাপাখানার লোকেরা তাহা পাকা করিয়া দেয়; আর ভোরবেলা হকারের দল যখন দিকে দিকে কাগজের পুলিন্দা বাহিয়া ছোটে, সেই সঙ্গে আমার ওই একটি 'কলম' পাঠকের ঘরে গিয়া পৌছায়।

পাঠক, খবরের কাগজ কিভাবে তোমাদের ঘরে গিয়া পৌছায় জানো? না জানাই সম্ভব, তবে তোমাদের মধ্যে কেহ যদি 'ব্লাড প্রেশারের' রুগী থাকে, ডাক্তার যাকে প্রাতর্ভ্রমণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, সে জানিতে পারে; আবার তোমাদের মধ্যে যদি কেহ হাঁপানির রুগী থাকে, সারা রাত্রি যার বিনিদ্র কাটে, সে জানিতে পারে; আবার তোমাদের মধ্যে যদি কেহ আমার মতো রাত্রি জাগরূক 'সাব এডিটার' থাকে, বাড়ী ফিরিবার পথে সে জানিতে পারে। সাধারণ সুস্থ

প্রকৃতিস্থ মানুষের সে রহস্য জানিবার নয়—এত ভোরে আসে কাগজ। তখনো গৃহস্থ জাগে না। তবে কাগজ কি রকমে তার ঘরে প্রবেশ করে? কারো জানালা দিয়া, কারো দরজার নীচের ফাঁকে, কারো বা আবার বদ্ধদ্বারের সম্মুখে পড়িয়া থাকে। কোনো কোনো সদ্যজাগ্রত গৃহস্থ খবরের কাগজ ফেলিবার শব্দে আলস্য ছাড়িয়া সচেতন হইয়া ওঠে। আহা, খবরের কাগজের কি চৈতন্যদায়িনী শক্তি।

কিন্তু তত্ত্বকথা বলিবার জন্য তো লিখিতে বসি নাই, মনোদুঃখ প্রকাশ আমার আকাঙ্ক্ষা। পাঠক, তুমি যদি কিছু মনে না করো তবে একটি স্বীকৃতি করিয়া ফেলি। আমার লেখাটি কেহ পড়ে না। অন্ততঃ আমিতো কাহাকেও পড়িতে দেখি নাই। চোখে যাহা দেখিলাম না, চোখের আড়ালে যে তা ঘটিতেছে এমন বিশ্বাস করিবার মত বুকের পাটা আমার নাই। ট্রামে যাইতে যাইতে দেখিয়াছি অত্যন্ত মনোযোগী পাঠকও ঠিক ওই 'কলম'টা বাদ দিয়া গেল। কাগজের দোকানে চঞ্চল পাঠক সবটাই পড়িল, কেবল ওই জায়গাটুকু দ্রুত উল্টাইয়া যায়। সিজারস-এর বিজ্ঞাপনের বাণী মনে মনে উচ্চারণ করি—'আপনি জানেন না যে, কি জিনিষ আপনি হারাইতেছেন।' অপরিচিত পাঠকের দৃষ্টি আমার স্তম্ভটির দিকে আকর্ষণের জন্য কত চেষ্টাই না করিয়াছি। পাশের যাত্রীকে ওই পৃষ্ঠায় আসিয়া পৌঁছিতে দেখিয়াই আমি ওই অংশটুকু পড়িতে সুরু করিলাম এবং আঙুল দিয়া দৃষ্টির রেখা টানিয়া যাইতে লাগিলাম, যাত্রীটি যদি ভদ্র হয় তবে বলে ওকি পড়ছেন, পরপৃষ্ঠা দেখা যাক—আর যদি তার সহিষ্ণুতা কিছু কম হয়—তবে শুধু হাঁকিয়া ওঠে 'রাবিশ'। আমিও যে রসিক একথা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁকে সমর্থন করিয়া ঘাড় নাড়ি। কেহ কেহ আবার উপদেশ দেয়—কাগজের দুর্ম্মূল্যতার দিনে স্থানের কি অপব্যয়! মুখে বলি—বটেই তো। মনে বলি—'আপনি জানেন না কি জিনিষ আপনি হারাইতেছেন।'

লেখা যদি কেহ না পড়ে তবে লিখিয়া কি লাভ। অন্ততঃ, এরকম অবহেলা চোখে দেখিলে তার প্রতিকার করা উচিত। কে পড়িবে? কিম্বা বলা উচিত কাকে পড়াইব? নানাজাতীয় আকর্ষণজনক বিজ্ঞাপনের ভয়ে বাড়ীতে কাগজ আনিতাম না। এখন এই প্রথম বাড়ীতে কাগজের আমদানী করিলাম। যা ভয় করিয়াছিলাম ঠিক তাই ঘটিল। দেখিলাম সহধর্ম্মিণীর গহনার বিজ্ঞাপনের প্রতিই মনোযোগটা যেন কিছু বেশি। অতএব পত্নীকে ছাড়িয়া বন্ধুদের ধরিলাম।

আমাদের একটি রবিবারিক ক্লাব আছে। সেখানে কয়েকজন বন্ধুতে মিলিয়া

পরনিন্দা করিতে করিতে জিলিপি খাওয়া হয়। সেখানে কাগজখানি লইয়া গেলাম। হাতে দেখিবামাত্র সেদিনের মত অকালে ক্লাব ভাঙিয়া গেল, আমার উদ্দেশ্য কারো বুঝিতে বাকী রহিল না; থাকিবেই বা কেন? ক্লাবের সবাই যে লেখক; কারো মার অসুখ, কারো ষ্টেশনে যাইতে হইবে, কারো বা নিমন্ত্রণ আছে; একটা না একটা কাজ সকলেরই আছে। নাঃ, বাঙালী যে এত কাজের লোক তা আগে কে জানিত!

কিন্তু সমস্যার তো কোন সমাধান হইল না—লেখা শোনাই কাকে? এক দিন বাজার করিতে গিয়া অকস্মাৎ সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইলাম। এমনি অকস্মাৎ নিউটনের আবিষ্কার সংঘটিত হইয়াছিল। বেশি কিছু নয়, কল্পনার একটি বিদ্যুৎপ্রবাহমাত্র।

ওই যে সারিবদ্ধ সুদীর্ঘ জনতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—শিশু, বালক, যুবক; প্রৌঢ় বৃদ্ধ, বালিকা; যুবতী হইতে মুমূর্ষু আড়াই ছটাক চিনির প্রত্যাশায় ওরা তো নড়িবে না, চিনি না পাইলে নড়িবে না। অবশ্য এক পা এক পা করিয়া সম্মুখের দিকে নড়িতেছে কিন্তু চিনির ঘুলঘুলির কাছে পৌছিবার অনেক আগেই আমার লেখা পড়িয়া শেষ করিতে পারিব। সাধ্য কি ওদের নড়ে, স্বয়ং যমরাজ আসিলেও ওরা নড়িবে না। শুধু ব্যাকুল নেত্রে বারেক মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিবে—'প্রভু মরিব তাতে দুঃখ নাই, কিন্তু চিনি যে পাইব না।' অনেকটা সেই সর্পদষ্ট মাতালের মত যে বলিয়াছিল, 'মরিব তা'তে দুঃখ নাই, কেবল চাকুরিটি যাইবে যে।' বিশেষ ওই জনতার মধ্যে আমার পলাতক পাঠকদেরও কেহ কেহ নিশ্চয় আছে।

রচনাটি পকেটেই ছিল! (কোন্ লেখকের না থাকে।) বাহির করিয়া পাঠ সুরু করিলাম। এই প্রথম আমার লেখা শুনিয়া শ্রোতা পালাইল না। সে যে কি আনন্দ, পাঠক তোমরা তা বুঝিবে না, কারণ, হয় তোমরা লেখক নও, নয় তোমাদের পাঠক আছে।

জনতার মুখে সে কি নিরাসক্ত কৈবল্য! দৃষ্টি অবশ্য সেই দোকানির ঘুলঘুলির দিকে। তা থাক। চোখ ইচ্ছা করিলে বন্ধ করা যায়—কিন্তু কানতো ইচ্ছা করিলেই রুদ্ধ হয় না। অবশ্য হাত দিয়া করা যায় কিন্তু হাতই যে বদ্ধ—কারো হাতে থলি, কারো হাতে ঝুড়ি, কারো হাতে তরকারি; কোন কোন সৌভাগ্যবানের হাতে বা খেজুর গাছের মতো ঝুঁটিওয়ালা গোটা দুই বাগদা চিংড়ি।

আমি পড়িয়া চলিয়াছি, আর তার সঙ্গে তাল রাখিয়া জনতা পায়ে পায়ে

আগাইয়া চলিয়াছে, শিশু হইতে বৃদ্ধ, বালিকা হইতে বৃদ্ধা, সদ্যোজাত হইতে মুমূর্ষু। এ তো কেবল চিনির কন্‌ট্রোলের লাইন নয়, এ যে মানবজীবনের প্রতীক। প্রতীক? তবে ওই চিনিটা কিসের প্রতীক? পরকালের! যে ব্যবস্থার ফলে চিনির দোকানে গিয়া মানবজীবনের প্রতীক দেখিতে পাইলাম, তাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারি কই? ঠিক এই বস্তুটি দেখিবার জন্যই সিদ্ধার্থকে কত কাণ্ডই না করিতে হইয়াছিল।

প্রতি রবিবারে আমি চিনির কন্‌ট্রোলে লেখা পড়িয়া শুনাইতে শুনাইতে মানব-জীবনের প্রতীক দেখিয়া থাকি। তবে দোকানটির নাম বলিব না, তাহা হইলে তুমি কখনই সেদিক মাড়াইবে না। কারণ পাঠক, চিনির অভাবে না পড়িলে আমার লেখা যে কখনো শুনিবে না, তাহা আমি নিশ্চয় জানি।

শোনপাপড়ি

'শোনপাপড়ি চাই। শোনপাপড়ি।' কলিকাতার শরৎকালের দুপুর বেলায় গলিতে গলিতে 'শোনপাপড়ি'-ওয়ালা হাঁক দিয়া যায়। সমস্ত পাড়া রাত্রির মত নির্জন। পথে লোক নাই; গলির মধ্যে গাড়ি ঘোড়া নাই; দূরের ট্রাম বাসের শব্দ এতদূরে আসে না। আমড়া গাছের ডালের উপরে কয়েকটা কাক; গৃহস্থের উঠানের কোণে নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্টের ধারে একটা কুকুর, খাদ্যবস্তুর উপরে গিয়া পড়িবার মত উদ্যম কারো নাই; কুকুরটা অর্দ্ধশায়িত, কাকগুলা কেবল 'ক্ক' 'ক্ক' শব্দে সিদ্ধান্তহীন আলস্য জ্ঞাপন করে। আকাশের খিলানের কাছে একটা চিল সুদীর্ঘ করুণ তানের গুণ টানিয়া স্বপ্নবেসাতির নৌকাখানা আকাশ গাঙের উজানে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। ঝলমলকরা সোনালি রৌদ্র, আর তার উপরে বৃষ্টি মাজা আকাশটা কত উর্দ্ধে। যেন সোনার খাঁচার দরজা খোলা পাইয়া একটা নীলকণ্ঠ পাখী পাখা মেলিয়া উড়িয়াছে। উচ্চ হইতে উচ্চতরে উড়িয়াই চলিয়াছে। এমন দুপুর বেলায় ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া যায়, 'শোনপাপড়ি চাই, শোনপাপড়ি।'

বাড়ীর কর্তাদের অনুপস্থিতির সুযোগে এরা সওদা বেচিয়া যায়। গভীর রাত্রে নিদ্রার সুযোগে যারা বাহির হয়, তাদের সঙ্গে এদের কি বেশী তফাৎ আছে! রাত্রের তারা দুঃসাহসী, দিনের এরা বুদ্ধিমান! পয়সায় ছ'খানা শোনপাপড়ি যারা দিতে পারে তাদের অসাধ্য কিছু নাই। পয়সায় ছ'খানা

শোনপাপড়ি কেমন করিয়া সম্ভব? মিষ্টির দোকানের পচা রস সুলভে কিনিয়া তার সঙ্গে করাতের গুঁড়া মিশাইয়া তৈরী করিলে ছ'খানা কেন না দেওয়া যাইবে?

তারপরে হঠাৎ কি হইল 'শোনপাপড়ি'র হাঁক বন্ধ হইয়া গেল—অকস্মাৎ প্রায় একদিনে। মেয়েরা বসিয়া থাকে, ছেলেরা উঁকিঝুঁকি মারে, কিন্তু ফিরিওয়ালা আর আসে না! কোথায় গেল এই পয়সায় ছ'খানাবেচা অঘটনঘটনপটীয়সী প্রতিভা? তারা সব শোনপাপড়ি ফিরি ছাড়িয়া 'বিশেষ ধরণের' কাজে নিযুক্ত হইল, 'বিশেষ ধরণের পোযাক' পরিল; একদিনে কলিকাতার দুপুরের শোনপাপড়ির হাঁক বন্ধ হইয়া গেল।

এক বছর আগেকার কথা বলিতেছি তখন যুদ্ধ বাধিয়াছে বটে, কিন্তু এমনতরো পাকিয়া ওঠে নাই। অল্পকাল আগেকার সে বহুকালের কথা। সে ছিল কলিকাতার সত্যযুগ। তখন যত্রতত্র বাড়ীভাড়ার নোটিশ গলায় দড়ি দিয়া জানালায় ঝুলিত। তখন বাসওয়ালা পথিককে ডাকিত 'আইয়ে'; দাঁড়াইয়া থাকিলে ট্রামের কণ্ডাক্টার বলিত 'বৈঠিয়ে'; দুধের নামে তখন টাকায় তিন সের জল মিলিত; রাস্তায় 'বিশেষ লরীর' ভয় ছিল না; লালবাজারের সঙ্গে তখন কালোবাজার যুক্ত হয় নাই; এমন কি আলুও তখন দুষ্প্রাপ্য ছিল না। তারপরে কোথা হইতে কি হইল, কলিকাতার আলো নিভিয়া গেল, বাড়ী ভরিয়া গেল, স্বাধীনতা এবং আলু দুই-ই সমান আশাতীত হইযা গেল, কিন্তু সবের আগে গেল দুপুর বেলার শোনপাপড়ির হাঁক।

আর কি সে সত্যযুগ ফিরিবে না? যুদ্ধ শেষ হইলেই ফিরিবে; যুদ্ধ কবে শেষ হইবে? কি করিয়া জানিব? একটি লক্ষণ আছে। যেদিন আবার কলিকাতার পথে শোনপাপড়ির হাঁক উঠিবে, তখনই বুঝিবে যুদ্ধশেষের আর দেরী নাই। বসন্তের আগমন যেমন কোকিলে জানায়, শান্তির আগমন তেমনি শোনপাপড়ি জানাইবে। ভূতপূর্ব শোনপাপড়িওয়ালাদের 'বিশেষ ধরণের' কাজ শেষ হইবে; যুদ্ধান্তের আগেই তারা নোটিশ পাইবে, আবার তারা পুরাতন গলিতে পুরাতন ব্যবসায়ে ফিরিয়া আসিবে।

আহা, সে সত্যযুগের কথা মনে করিতেও চোখে মুখে একসঙ্গে জল ঝরে, তখন বাড়ী ভাড়া মিলিবে, আলু চিনি মিলিবে, কেরোসিন মিলিবে, হাণ্টলি পামারস্ বিস্কুট মিলিবে! আর সব চেয়ে বেশী করিয়া মিলিবে পয়সার ছ'খানা করাতের গুঁড়ার শোনপাপড়ি! সেই অদূর সত্যযুগের ঐক্যতান যেন এখনই শুনিতে পাইতেছি—'শোনপাপড়ি চাই, শোনপাপড়ি।'

মার্জিন

বোধ করি অত্যন্ত মনোযোগী পাঠকের পক্ষেও বই পড়া অসম্ভব হইত, যদি-না বইয়ের কালো অক্ষরগুলির চারিদিক ঘিরিয়া শাদারঙের একটি মার্জিন থাকিত। কালো অক্ষরের কালিয়দহে স্নান করা চলে, কিন্তু শাদা মার্জিনের ওই বেলাভূমিটুকু না থাকিলে দাঁড়াইব কোথায়? সমুদ্রে স্নানার্থীরা ঢেউয়ের নাগর-দোলায় ক্লান্ত হইয়া আসিয়া তীরে একটু বিশ্রাম করে, তারপরে আবার নামে সমুদ্রে। অক্ষরের আন্দোলন ঢেউয়ের আন্দোলনের চেয়ে বড় কম নয়, তাই তাহাকে ঘিরিয়া আছে শাদা মার্জিনের দাঁড়াইবার স্থান।

অন্যের কথা জানি না, কিন্তু আমার পক্ষে অক্ষরের চেয়ে মার্জিনটাই বেশী আবশ্যক, কারণ আমি সমুদ্রে নামিবার অপেক্ষা তীরে দাঁড়াইয়া তাহার লীলা দেখিতে ভালবাসি। সত্য কথা বলিতে কি, আমি বই পড়ি না, মার্জিন পড়ি। কিংবা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলি, ওই শাদা মার্জিনে আমার মনের চিন্তারাশি ভিড় করিয়া আসে। শাদা খাতা লইয়া বসিলে তাহাদের দেখা পাই না। কিন্তু কালো অক্ষরগুলির দেখা পাইয়া আমার চিন্তার দল ছুটিয়া বাহির হয়—এ যেন ব্যাধের পাখী দিয়া পাখী ধরিবার ব্যবসা। অন্যের চিন্তার সাক্ষাৎ পাইলে তবেই আমার চিন্তা ধরা দেয়। যখন গ্রন্থে পড়িতেছি, নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী পশ্চিম ইউরোপের উপর দিয়া পঞ্চবাহিনী নদীর মত গড়াইয়া উল্‌ম নগরের দিকে ছুটিয়াছে, আমার মন মার্জিনে আর একখানি 'নেপোলিয়নাড' গড়িতে থাকে,—একটি নাতিখর্ব স্থূলকায় ব্যক্তি, ধূসর বর্ণের ওভারকোট গায়ে দিয়া সোনার কৌটা হইতে অধীর ভাবে নস্য লইতেছে।

আমি তো তবু মার্জিন পড়ি। কোল্‌রিজ কিন্তু মার্জিনে লিখিতেন। ল্যাম্ব বলিয়াছেন, কোল্‌রিজকে বই দিলে সুদে আসলে ফেরত পাওয়া যায়। বইটা আসল, সুদ ওই মার্জিন-লিপি। কিন্তু এক বিষয়ে কোল্‌রিজের সঙ্গে আমার মিল আছে (পাঠক, আপনি যাহা ভাবিতেছেন তাহা নয়, কমলাকান্তী নেশা আমার নাই।) পাঠ্যগ্রন্থের সহিত মার্জিন-লিপির কোন মিল নাই। কোল্‌-রিজের মার্জিন-লিপি, খণ্ড ছিন্ন অপ্রাসঙ্গিক অমূল্য সত্য। সত্য কথা বলিতে কি, কোল্‌রিজের সমস্ত রচনাই যেন একখানি বিরাট গ্রন্থের মার্জিন-লিপি।

শুনিয়াছি চেষ্টারটন মার্জিনে ছবি আঁকেন; তার আবার অধিকাংশই

পাখী, সে-সব পাখীর আবার অনেকগুলিই পৃথিবীতে দেখা যায় না,—বোধ হয় ইহারাই বার্ডস্ অব্ প্যারাডাইজ। চেষ্টারটন বিশেষ করিয়া কেন যে পাখী আঁকেন বলিতে পারি না, সম্ভবতঃ তাঁহার বিশ্বাস এই সব পাখীর দল রাতারাতি ওই কালো অক্ষরের ক্ষেত খুঁটিয়া খাইয়া উড়িয়া যাইবে, ভোরবেলা জি-কে-সি পাইবেন একখানা আগাগোড়া শাদা-খাতা। শুনি নাই, তবে বিশ্বাস করি, এই সব পাখী-আঁকা বই যদি বার্ণাড শ'র হাতে পড়ে, তবে তিনি পাখীর ঝাঁক এক ধমকে উড়াইয়া দিবেন। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, বার্ণাড শ মার্জিন-লিপি করেন না। কিন্তু কেন ?

অবকাশ মনের মার্জিন, আর কাজ ওই ঠাস-বোনা অক্ষররাশি। কাজ আর অবকাশ যাহার মনে স্বতন্ত্র, তারই কাছে, কেবল মার্জিনের মূল্য আছে। কিন্তু যার সবটাই অবকাশ, কিংবা সবটাই কাজ! বার্ণাড শ এই শেষের দলের একজন। আনন্দ ও কর্তব্যে তাঁর কাছে কোন প্রভেদ নাই, তাই তাঁর নিকটে মার্জিনটা বাহুল্য। বোধ করি এ-বিষয়ে তিনি একক—কারণ খৃষ্টানদের ভগবানেরও মার্জিনের আবশ্যক। ছয়দিন তাঁর কাজ আর অবকাশের 'স্যাবাথ' দিনটা তাঁর মনের মার্জিন। ইহা তো কেবল কল্পনা, বিশ্বকর্মা বিধাতা যে মার্জিনবিহারী, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। এই বিরাট বিশ্বগ্রন্থের আকাশ-প্রান্তের মার্জিনে তিনি স্বহস্তে আঁকিয়া রাখিয়াছেন, অন্যমনস্কতার অবসর সময়ে, ছায়াপথের মার্জিন-চিত্র।

জোনাকী

একটি রাত্রির কথা আমার বহুকাল মনে থাকিবে। মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া চলন্ত গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিলাম, পাটপচা অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য জোনাকী জ্বলিতেছে আর নিবিতেছে, যেন কোথাও কোন জ্যোতিষ্ককে শাণযন্ত্রে চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এ-সকল তারই স্ফুলিঙ্গ। গাড়ী ছুটিয়া চলিল, আর দুই পাশের অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতির্ময় নিঃশব্দ নূপুরের মত জোনাকীর দল তালে তালে কাঁপিতে লাগিল।

অন্ধকারের চকমকি পাথরে স্ফুলিঙ্গ ঠুকিয়া কিসের অনুসন্ধান চলিতেছে এই নির্জনে! যেন শত শত দেহহীন উৎসুক দৃষ্টি কোন একটা নিগূঢ় রহস্যের

সংবাদ পাইয়াছে! যেন স্বয়ং সহস্রচক্ষু পুনরায় পৃথিবীতে নামিয়া ধ্যানমগ্ন দধীচির সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে! না, ওরা মোটেই জোনাকী নয়। একদল অলক্ষ্য অপ্সরী নিপুণ অঙ্গুলির চারুভঙ্গিতে শাড়ির কালো জমিনে মুহুর্মুহু আগুনের ফুল তুলিয়া দিতেছে!

জোনাকী, তোমরা অন্ধকারের মধ্যে কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছ? অন্ধকারকে উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্য তোমাদের আলো আছে, তাহাতে কি কোন সাহায্যই হয় না! না, পিছনে তোমরা প্রদীপটি ঝুলাইয়া রাখিয়াছ, তাই তোমাদের সম্মুখে অন্ধকার! যাহা খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, তাহা হয়তো ঠিক সম্মুখেই, কিন্তু সেখানে যে গভীর অন্ধকার। তাই তোমাদের সন্ধানের আর শেষ নাই।

আমার কি মনে হয়, জান? আকাশের ওই রাতজাগা তারার দল এক ঝাঁক জোনাকী বই আর কিছু নয়। দিনের বেলায় প্রখর কিরণে উহাদের দেখা যায় না, কিন্তু রাত্রির অন্ধকার যেমনি আকাশের খিলান বাহিয়া গড়াইয়া নামিতে আরম্ভ করে উহারা একে একে চোখে পড়িতে থাকে, শেষে আর গুনিয়া শেষ করা যায় না। উহারা একঝাঁক দিব্য জোনাকীই বটে।

তোমাদেরই মত উহারা জ্বলিতেছে আর নিবিতেছে; আলোর পাথেয় লইয়া উহারা তোমাদেরই মত অন্ধকারের পথিক। উহাদের সম্মুখেও সুদূর জীবজগতের অভিনয় রজনীর নিবিড় অন্ধকার।

তোমাদেরই বা দোষ কি? আমরা মানুষ, তোমাদের অপেক্ষা বড়; আমাদের ভাষা আছে, পৃথিবীর সার্বজনীন ভাষা, হাসির স্বর আর অশ্রুর ব্যঞ্জন বর্ণ। তবু তোমাদের মতই আমাদের দুর্দশা। আমাদেরও আলো আছে; সে আলো আমরা তোমাদেরই মত পিছনে ঝুলাইয়া অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি। মানুষের কিরণ রশ্মিতে অতীতটা দেখা যায় সত্য, কিন্তু তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সে যদি সত্য সত্যই জীবনশিল্পের শিল্পী হইত, তবে ওই অজ্ঞেয় ভবিষ্যতের কালো পাথরখানা খুদিয়া দিব্য মূর্তি সৃষ্টি করিত, যাহাকে সে বহু জন্ম ধরিয়া সন্ধান করিতেছে। কিন্তু তেমন ভাগ্য তার নয়, তাই সে আলোকটা পিছনে ঝুলাইয়া ভূতের মত ঘুরিয়া মরে। তোমাদের কেন মিছা দোষ দিই—তোমরা তো সামান্য জোনাকী।

কিন্তু বোধকরি ভালর জন্যই বিধাতা মানুষের সম্মুখে আলো দেন নাই। ভবিষ্যতের ভস্মলোচনের সঙ্গে মুখোমুখী হইলে সে কি বাঁচিত! পুড়িয়া মরিত

না, কে বলিতে পারে? আমি দু'চার জনের কথা জানি, যাহারা নিজেরা না পুড়িয়া মরিলেও সংসারে তাদের ছাই পড়িয়াছে। বিধাতার ভুলে দীপ ছিল তাদের সম্মুখে, সেই আলোতে হইয়াছিল শুভদৃষ্টি ভবিষ্যতের ভস্মলোচনের সহিত। অমনি পুত্রপরিজন আর তাহাদের বাঁধিতে পারিল না, কোনও সম্বন্ধে তাহাদের ধরিতে পারিল না, সোনার সংসারে তাহারা ছাই দিয়া গেল,—বোধ হয় ওই ভবিষ্যতেরই অভিসারে।

ভালই হইয়াছে আলো আমাদের সম্মুখে নাই। প্রাচীনকালের জগন্নাথের তীর্থযাত্রীর মত আমরা চোখ বাঁধিয়া চলিয়াছি। দেবতাকে পাইব না সত্য, কিন্তু তেমনি আশাও কখনও পূর্ণ হইবে না। সুখ যে কেবল সুখের আশাতেই নয়, এমন কথা কে বলিল! জোনাকী, তোমরাই ঠিক। আমরা উভয়েই অন্ধকারের তীর্থযাত্রী। তোমাদের আমি বৃথা দোষী করিয়াছিলাম।

নূতন জুতা

সম্পাদক বিপদে ফেলিয়াছেন—চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে একটি প্রবন্ধ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। সময়ের স্বল্পতার জন্য ব্যস্ত নই—অল্প সময়ের নোটিশে অনেক কাজ করিতে আজকাল অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। লিখিবার নামে এতগুলি বিষয় মনের মধ্যে উমেদারি আরম্ভ করিয়াছে যে, কাহাকে বাদ দিব তাহাই সমস্যা। বাচনের পক্ষে এ সময় যথেষ্ট, নির্বাচনের পক্ষেই কম।

যেদিকে চাহিতেছি ছিপ, ছড়ি, ছাতা, চেয়ার, টেবিল, ঘুড়ি সবাই উমেদার; সরস্বতীর অফিসে সবাই বেকার। তাহারা বলিতেছে, মহাকাব্যে আমরা উপেক্ষিত, নাটকে আমরা অবজ্ঞাত, কবিতায় আমরা লাঞ্ছিত, উপন্যাসে অবাঞ্ছিত। জীবনের রঙ্গমঞ্চে আমরা নিয়ত পরিজন, কিন্তু সাহিত্যের ভোজে নিতান্তই হরিজন; আমরা একঘরে, আপাঙ্‌ক্তেয়। কুলে আমরা সত্যই ছোট, মহাকাব্যের আসরে আসনের দাবী আমাদের নাই। কিন্তু ছোট একটা প্রবন্ধের মধ্যেও কি আমরা স্থান পাইতে পারি না? আমরা কি এতই ছোট? তাহারা বলিতেছে—আমরা ক্ষণস্থায়ী বটে, কিন্তু তোমার ওই প্রবন্ধ কি একেবারে চিরকালের টিকা লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে?

কথাটা মিথ্যা নয়। আবার ইহারাই আমার চিরকালের পরিজন; বিনা

বেতনের ভৃত্য। কিন্তু বিপদ এই, এতগুলি উমেদারের মধ্যে কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখি। গল্পে-শোনা একটি জন্তুর কথা জানি, দুই দিকে তার দুই আঁটি ঘাস ছিল, কোন্‌টি আগে খাইবে স্থির করিতে না পারিয়া বেচারা যুগল খাদ্যের যূপকাষ্ঠে পড়িয়া শুকাইয়া মরিয়াছিল। আমারও আজ সেই দশা! ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে আর যা-ই-হোক, লোক খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন ছিল না, কারণ লোকের সংখ্যাই ছিল কম।

বাস্তবিক, কাজের পক্ষে জ্ঞানের পরিধির সীমা একান্ত আবশ্যক। যে ঘোড়াতে গাড়ী টানে তার পক্ষে দুইটা চোখও বাহুল্য, তাই তা'কে পরিতে হয় ঠুলি। মানুষের দুইটা চোখ, কিন্তু তাহার সমস্যা কত। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাপ, পুণ্য, ইহকাল, পরকাল, দেবতা, দানব, ভগবান্, শয়তান! সে এত দেখে, কাজ করে কত সামান্য! দুই চোখের টানাটানিতে বেচারা চিরন্তন দো'টানায় পড়িয়া আছে। ইহার চেয়ে একচক্ষু রাক্ষস অনেক সুখী, তার সমস্যা এত নয়; কম দেখে বলিয়াই কাজের তীব্রতা তার অনেক বেশী। আমার তো মনে হয়, দেবরাজ ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু না থাকিলে আরো অনেক সহজে দৈত্যদের কবল হইতে স্বর্গের উদ্ধার হইত! রাজনীতিকদের আমরা মূর্খ বলিয়া গালি দিই, কিন্তু তাহারা যদি দার্শনিক হইত অর্থাৎ যে-টুকু দেখা উচিত তার অধিক দেখিত তবে রাজ্য চলিত না। দর্শন মানেই সেই শাস্ত্র যাহা কেবলমাত্র দেখে— বোধ হয় কিছু বেশীই দেখে।

কিন্তু আমার তো আর সময় নাই—সম্পাদকের নোটিশের সীমা ক্রমে সঙ্কীর্ণতর হইতেছে। ব্যস্তভাবে উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিলাম—এক পা, দুই পা, তিনবার পা ফেলিতে না ফেলিতেই বিষয়-নির্বাচন হইয়া গেল। অন্য সব উমেদারকে ভুলিয়া গেলাম, এমন কি স্বয়ং সম্পাদককেও। পায়ে ছিল নূতন জুতা; প্রতি পদক্ষেপে সে দংশন করিয়া নিজের মাহাত্ম্য সমজাইয়া দিতে লাগিল। বুঝিলাম পদে পদে বিপদ—ইহাকে আজ না খুশী করিয়া উপায় নাই।

নূতন জুতার ট্র্যাজেডিই সংসারের ট্র্যাজেডি। সদ্যক্রীত দামী নূতন জুতা পায়ে পরিয়াছি। অনভ্যস্ত জুতার দংশনে মুহুর্মুহু মর্মস্থল শিহরিয়া উঠিতেছে, মুখে তবু না হাসিয়া উপায় নাই। বন্ধুবান্ধব তোমার জুতা দেখিয়া অভিনন্দন করিতেছে, ঈর্ষ্যা করিতেছে, কিন্তু কেবল জুতার মালিকই জানে বেদনা কোথায়! যাহার সঙ্গে দেখা হয় সে-ই বলে, এমন জুতা দেখি নাই; তোমাকেও বলিতে হয়, এমন

আরামদায়ক জুতা আর পরি নাই, কেমন মোলায়েম, কেমন নরম; কিন্তু মনের কথা মনই জানে।

সংসারের পথেও এই একই অভিনয়! তোমার মাতৃশোক, তবু তোমাকে হাসিয়া কথা বলিতে হইবে; আগামীকাল তোমার সম্পত্তি নীলাম, তবু তোমার মুখ ভার হইবার উপায় নাই; কঠিন দুঃখের লৌহপাত্রকে হাসির এনামেলে উজ্জ্বল করিয়া তবেই সংসারে বাহির করা চলে! নতুবা সবাই তোমাকে বলিবে, সেন্টিমেণ্টাল, ইমোশনাল, আন্-প্র্যাকটিক্যাল। বর্তমান যুগে ইহার চেয়ে বড় অপবাদ আর কিছু নাই।

কিন্তু বোধ করি ইহাই ভাল। সবাই যদি ঘরের দুঃখকে পরের সম্মুখে বাহির করিত তবে সংসারে বাঁচিতাম কেমন করিয়া! একদিনে সংসার শাহারা হইয়া উঠিত! এইজন্যই কবিরা জীবনকে রঙ্গমঞ্চ বলিয়াছেন! সংসার-রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে হইতেছে গৃহ; সেখানে রঙ ধোয়া হইতেছে, দাড়ি খোলা হইতেছে, কাপড় খসানো হইতেছে, তাহা বাস্তবতার দক্ষযজ্ঞের ক্ষেত্র। আর বাহিরটা রঙ্গমঞ্চ; সেখানে হাসি, গান, ফুল, ফল, রঙ ও রঙ্গ; সেখানকার দুঃখও দুঃখের অভিনয়। এখানে অশ্রুর অঞ্জলি তোমাকে একাই পান করিতে হইবে; হাসিকে ভোগ করিতে হইবে, ভাগ করিয়া। সংসারে নূতন জুতার কাঁটা তোমার নিজস্ব, নূতন জুতার চাকচিক্য অন্য সকলের।

জাপানী বোমা

দীর্ঘদিনের ছুটির পরে কলিকাতায় ফিরিয়া সংবাদ পাইলাম অনতিকালের মধ্যেই ব্যোমযান হইতে জাপানী বোমা পড়িবে; এ আর বাংলা খবরের কাগজের উড়ো খবর নয়, যদিও বিপদটা উড়ো বিপদ, খাস সাহেব মহলের সংবাদ। বড় বড় সামরিক ধুরন্ধরগণ কোন্ সভায় নাকি পান-ভোজনান্তে এ সব কথা বলিয়াছেন, নিন্দুকে হয়তো বলিবে সভায় পানের মাত্রা কিছু বেশী হইয়াছিল, তৎসত্ত্বেও আমরা সংবাদের সত্যতায় সন্দেহ করি না। শুনিয়া পুলকিত হইলাম।

বোম্বাই শহর ইতিমধ্যেই তিমিরান্বিত করিয়া ব্যোমযানের নৈশ মহড়া চলিতেছে, করাচীতে নাগরিকেরা গ্যাস মুখোস পরিয়া গ্যাস নিবারণের অভিনয় করিতেছে, এবং এই উপলক্ষ্যে মুখোসের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া পাওনাদারের সম্মুখে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। খবরের কাগজ বলে তাদের ভাগ্যে আছে,

ইটালীয় বোমা; আর আমরা আছি কিনা ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে, আমাদের ভাগে পড়িবে জাপানী বোমা।

বহু কন্‌ফারেন্সসমাকীর্ণ খৃষ্টমাস সপ্তাহটা গেল, আহা, এ সময়ে যদি গোটা কয়েক জাপানী বোমা পড়িত! জাপানী চরিত্রে আর যে গুণ থাকুক হাস্যরস-জ্ঞানের একান্ত অভাব, নতুবা এমন সুযোগ তারা ছাড়িত না।

কল্পনা কর দেখি, বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি যখন সুদীর্ঘ অভিভাষণে বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করিতেছেন—তখন আকাশমার্গ হইতে অতর্কিতে অকস্মাৎ একটি বোমা। বৈজ্ঞানিক সত্যের একেবারে জলন্ত উদাহরণ! সকলকেই প্রাণ দিয়া স্বীকার করিতে হইত বিজ্ঞানের কি মারাত্মক শক্তি! তার পরে সে কি চাঞ্চল্য! সভাপতি ছুটিতেছেন, সেক্রেটারী ছুটিতেছেন, অনারারী সেক্রেটারী ছুটিতেছেন, কোষাধ্যক্ষ কোষ ফেলিয়া পালাইতেছেন, সদস্যগণের মধ্যে ছুটাছুটি, সে এক দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার! শহর ছাড়িয়া আশে পাশের গ্রামের কুঁড়ে ঘরে ও জঙ্গলের মধ্যে সকলের আশ্রয় গ্রহণ, ইহাকেই বোধ করি বলে 'ব্যাক্ টু নেচার'।

এত সুযোগ সত্ত্বেও খৃষ্টমাসে জাপানী বোমা পড়িল না, তবু নিরাশ হইবার কারণ নাই। তারা এখন চীনটুকু দখল করিতেছে, তারপরে হিমালয় পাড়ি দিয়া এক ঝাঁক পঙ্গপালের মত দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া জাপানী ব্যোমযান আসিবে, বাছিয়া বাছিয়া কলিকাতার উদ্ধতনাসা অট্টালিকার উপরে বোমা ফেলিবে; সে দৃশ্যের নাকি আর বড় দেরী নাই।

আমার তো মনে হয় এই আকাশিক আক্রমণ ছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্গহীন। খাইবার গিরিসঙ্কট দিয়া স্থলপথে ভারতবর্ষ বিজিত হইয়াছে, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া জলপথে বিজিত হইয়াছে, এবার কেন না বায়ুপথে বিজিত হইবে? কবির আক্ষেপ 'মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা'; এখন মঙ্গলঘটে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইলেই সব পূর্ণ হয়, অবশ্য তার পরেও মঙ্গলঘট টিকিয়া থাকিবে কিনা—সেটা অবান্তর।

আমার তো মনে হয় জাপানী বোমা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। বাইবেলের দূষিত শহর শিলাবৃষ্টিতে নষ্ট হইয়াছিল। পম্পিয়াইএর সৌভাগ্য যে, কাছেই বিসুবিয়াস ছিল; আমাদের ভাগ্যাকাশে আছে জাপানী বোমার ধূমকেতু।

তারা এদেশে আসিলে দেখিবে এমন সহিষ্ণু জাতি আর নাই;—চীনারা ছুটাছুটি করিতেছে, আর আমরা খাড়া দাঁড়াইয়া মরিতেছি; জাপানী মাল খরিদ

করিয়া এখনও যে দু'চার পয়সা ঘরে আছে, তাহা গৃহীর সঙ্গে সহমরণে যাইবে; আশা করি জাপানী বোমা জাপানী খেলনার মত ক্ষণভঙ্গুর হইবে না।

আমরা যে সমস্যাজালে জড়াইয়া পড়িয়াছি, এর চেয়ে সরলতর সমাধান আর নাই! আমাদের ধর্ম্ম মালা-তিলকে অবসিত, সাহিত্য চৌর্য্যমার্গী, রাজনীতি ও বাণিজ্য, একপ্রকার কেরাণীগিরি; সমাজ অবসন্ন, গ্রাম উৎসন্ন, শহর কলুষিত। এত সমস্যার সমাধান মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এখন কেহ দয়া করিয়া 'গর্ডিয়ান-নট' কাটিয়া দিলে আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে—সে কষ্ট কি জাপানীরা করিবে? করিলে বলিব জাপানীরা পরোপকারী, আর বিধাতা দয়াময়।

না হয় দু'চার লক্ষ লোক মরিল। পৌরাণিক যুগ হইতে আমরা আকাশের দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছি! রোদের জন্য, বৃষ্টির জন্য, গ্রহগণনার জন্য, রাজানুগ্রহের জন্য, সব রকমেই। আজ আর একবার আকাশের দিকে তাকাই—আকাশ হইতে চিরদিন সত্যকার জিনিষ পাওয়া যায়, আলো, বাতাস, রৌদ্র, বৃষ্টি। সেই আকাশ হইতে যদি দুটা শিলা ও জাপানী বোমা পড়ে তবে তাকে দূষিব কেন? কিন্তু জাপানী বোমাতে বোধ করি আমাদের ভয় নাই; যে মাথায় আমরা এতদিনের অসংখ্য অত্যাচার ও নানাবিধ ট্যাক্স বহন করিয়া বাঁচিয়া আছি, তাহা বোধ করি জাপানী বোমায় ভাঙিবে না। ভাঙুক আর নাই ভাঙুক, একবার পরীক্ষা হওয়া ভাল।

সিঁধ-কাটা

স্বীকার করাই ভালো আমি সিঁধ কাটিতে পারি না অথবা পারি কিনা জানি না, কারণ কোনদিন চেষ্টা করিয়া দেখি নাই। কিন্তু যে সিঁধ কাটিতে পারে তাহাকে প্রশংসা করি এবং সম্ভ্রম করি। তাহাকে বড় দরের শিল্পী না বলিয়া পারি না। শিল্পীরা যে আনন্দ ও স্বস্তির মধ্যে কাজ করে—তাহার ভাগ্যে সে স্বস্তিটুকু ঘটে না কিন্তু আনন্দটুকু থাকেই; আনন্দ না থাকিলে কোন শিল্প-সৃষ্টি হয় না; আর আগেই বলিয়াছি সিঁধ-কাটা বড়দরের একটা শিল্পকলা। আলঙ্কারিকেরা বিশেষ কারণেই এই সন্দেহজনক বিদ্যাটিকে চৌষট্টি কলার মধ্যে স্থান দিয়া গৌরবান্বিত করেন নাই। মৃচ্ছকটিকের কবি রসিকপুরুষ ছিলেন এবং গৃহে তাঁহার গৃহিণী ব্যতীত সিঁধ-কাঠির লক্ষ্যস্থল আর কিছু ছিল না এমন যদি সন্দেহ করি তবে তাঁহার রচিত নাটকই আমার প্রধান সাক্ষী হইবে।

চোরও যে চুরি জিনিষটাতে সঙ্কোচ বোধ করে তাহা সিঁধের শিল্পচাতুর্য্য দেখিলেই স্পষ্ট হইয়া ওঠে। সে চুরির বীভৎসতাকে সুন্দর করিতে প্রয়াস পায়—মৃতদেহকে ফুল দিয়া ঢাকিয়া দিবার মত। সুবর্ণের প্রতি চোর, কবি ও প্রেমিকের সমান টান, অতি নিপুণভাবে চোর ও কবির মধ্যে সম্বন্ধ দেখানো হইয়াছে। প্রসিদ্ধ চৌরকবি একাধারে চোর, কবি ও প্রেমিক ছিলেন। তিনি যে সুড়ঙ্গ পথ রচনা করিয়া রাজকন্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা একবার মাত্র দেখিবার জন্য রাজশাসন অগ্রাহ্য করিতে ভয় করি না—যদিও সুড়ঙ্গ ছাড়িয়া সুবঙ্গমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব না—এমন প্রতিজ্ঞা কখনই করিতে পারি না।

ঘরে চোর প্রবেশ করিলে ক্ষতির সম্ভাবনা। কিন্তু সিঁধটা সুন্দর হইলে চুরির ক্ষতি খানিকটা যেন পূর্ণ হয়, অন্ততঃ এটুকু মনে না করিয়া পারা যায় না যে চোরটার সমবেদনা বোধ আছে, চুরি করিয়াছে করুক কিন্তু ঘরের দেওয়ালে একটা কুশ্রী ছিদ্র রাখিয়া যায় নাই। অভাবের তাগিদেই সে চোর নতুবা সে একজন বড়দরের শিল্পী—মানুষের রসবোধের প্রতি তাহার দৃষ্টি একাগ্র। সে চোর যদি ধরা পড়ে এবং আমি যদি তাহার বিচারক হই তবে তাহাকে বেকসুর খালাস করিয়া দিব—এমন উদারতা আমার নাই তবে 'আঘাতের উপর অপমান করে নাই' ভাবিয়া তাহাকে যে লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা করিব—সে কথা নিশ্চিত।

হায়, আজকাল জীবনের সব ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য্যের স্থান কমিয়া আসিতেছে। প্রয়োজন রসবোধকে যাবজ্জীবনের জন্য আন্দামানে পাঠাইয়াছে। প্রাচীনকালের লোকেরা সাহসী ছিল কিন্তু তাহারা একটা সীসার গুলি খাইয়া মরিতে কখনই রাজী হইত না। আমাদের জীবনযাত্রা অধুনা যেমন সুলভ হইয়া পড়িয়াছে মৃত্যুও তেমনি দুই আনার একটি সীসকখণ্ডের অতিরিক্ত কিছু আর আশা করে না। হায়, জীবনে মরণে আমরা প্রয়োজনের দাস হইয়াছি। মৃত্যুর সিঁধ-কাটি বীভৎস একটি বন্ধপথে মানুষের বক্ষে প্রবেশ করে ইহাতে মনুষ্যত্বের অপমান।

মানুষের প্রতি করুণার চর্চা সম্প্রতি নিশ্চয় কমিয়া গিয়াছে নতুবা দেখিতাম ওস্তাদ চোর মৃত্যুকালে সাকরেদকে সুন্দর করিয়া সিঁধ কাটিবার বিদ্যাটি শিখাইয়া মরিতেছে, নতুবা দেখিতাম চৌর-প্রেয়সী অভিযানকালে প্রিয়তমকে মাথার দিব্যি দিয়া বলিতেছে সিঁধের ছিদ্রটি চুরি-করিয়া-আনা সোনার বালাটির অপেক্ষা কম সুন্দর হইলে সে অলঙ্কার কখনই সে পরিবে না আর শয্যায় সহসা জাগিয়া দেখিতাম লোহার সিন্দুকটি খোলা আর দেয়ালে একটি পদ্মপুষ্পাকার রন্ধ্র দিয়া প্রভাতের

অস্পষ্ট আলোকটি গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিতেছে অলঙ্কার গিয়াছে বটে কিন্তু আমিও কম সুন্দর নই।

নামকরণ

রামের জন্মের পূর্ব্বে রামায়ণ লেখা হইয়াছিল—বেচারী রাম লিখিত সত্যের একটি কথারও প্রতিবাদ করিবার অবকাশ পান নাই। সীতাদেবীকে ত্যাগ করায় রামের অপরাধ হইয়াছিল—এমন একটা কথা শোনা যায়—কিন্তু সেটা যে রামের অপরাধ—বাল্মীকির নয় তাহা কে বলিল?

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একটি ঘটনা ঘটে। আমি নামকরণের কথা ভাবিতেছি। সারা জীবন যে জিনিষটা লইয়া মানুষের ব্যবহার করিতে হয়, যাহা মানুষের সব হইতে আপন, তাহার নির্ণয়তা সম্বন্ধে তাহার একটুও হাত নাই; আমি বলিব ইহাও রামের জন্মের পূর্ব্বে রামায়ণ লেখার মত—জন্মের পূর্ব্বেই বটে কারণ যখন নামকরণ হয় তখন মানুষের আসল জন্মটাই হয় না—যাহাকে বলি জ্ঞান জন্ম যে হিসাবে প্রত্যেক মানুষই দ্বিজ।

পিতামাতার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় পুত্রের পোষাক-পরিচ্ছদে—সেবার পরিচয় পাওয়া যায় পুত্রের দেহের মধ্যে—সুরুচির পরিচয় ফুটিয়া ওঠে তাহার নামকরণের উপলক্ষ্যে। কিন্তু হঠাৎ যখন এক একটা নাম মুগুরের আঘাতের মতো আসিয়া পড়ে জগদম্বা বা ভোম্বলদাস—তখন ভাবি পিতামাতা এতবড় অন্যায় কি করিয়া পুত্রকন্যার প্রতি করিতে পারেন? ইংরাজীতে আছে "সৌজন্য করিতে খরচ লাগে না"—আমি বলি নামকরণ করিতে খরচ আরো কম। একটু ভাবিয়া, একটু ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া, না হয় বাড়ীর পাশের পড়শীকে পুছিয়া—শুধু একটা নাম—শুনিতে একটু মিষ্টি আর কিছু নয়।

আসল কথা ছেলে ছোট থাকিলে তাহাকে যাহা তাহা পরাইয়া রাখা চলে—বয়স বাড়িলে তাহা চলে না; তেমনি ছোটছেলেকে 'গডাচর' বলিয়া ডাকিলে ক্ষতি নাই—কিন্তু সে যখন বড় হইবে, যখন সৌন্দর্য্যের এবং সুরুচির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িবে—যখন নিজেকে তাহার আর কাহারো অপেক্ষা ছোট বলিয়া মনে হইবে না—তখন গদাধর যদি পিতামাতার অবিচার স্মরণ করিয়া গদা ধারণ করে তবে তাহাকে তো দোষ দিতে পারি না।

যাঁহারা কানাছেলের নাম পদ্মলোচন রাখিলে ঠাট্টা করেন আমি সে দলের নই;

একটা ক্ষতি তো হইয়াছেই, ছেলে কানা ; আবার যদি বাপও কানা হইয়া একটা অদ্ভুত নাম রাখে তবে সে দ্বিগুণ ক্ষতি পূরণ করিবে কে ? না হয় কানা ছেলেকে পদ্মলোচনই বলিলাম। জীবনে প্রতিদিনই কত মিথ্যা কথা বলিতেছি আর এই একটি অর্দ্ধমিথ্যা যদি একজনকে খুশী করিবার জন্য বলি তবে সত্যমিথ্যার শেষ বিচারক চটিবেন না—আর মানুষে বড় জোর হাসিবে—রাগিবে না।

অধিকাংশ সময়ে মানুষের পরিচয় নামের মধ্য দিয়া—সে হিসাবেও আমরা ঠকিব না। ওফেলিয়া, জুলিয়েট, হেলেন, বিয়াত্রিচে কোথায় ? পত্রলেখা, মালবিকা, দময়ন্তী, উমা ; উর্ম্মিলা, উর্ব্বশী, মেনকা, মন্দালিকা ; অর্পণা, সুরমা, বিভা, ইলা ; ইহারা আজ কেবলমাত্র এক একটি নামের ইন্দ্রধনুতে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। জাদুকরের লাঠিখানির মত সুন্দর নাম আমাদের অভিভূত করিয়া রাখে।

ডাকনামটা যাহা খুশী দিতে পারি তাহা আটপৌরে পোষাকের মত। কিন্তু পথে বাহির হইতে হইলে একটা ভাল নাম চাই। বাপ মায়েরা একটু যদি ভাবিয়া ছেলেমেয়ের নামকরণ করেন তবে দুই এক পুরুষের মধ্যে আমাদের দেশটা আবার প্রাচীনকালের মত নাম-সঙ্গীতে অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়া আমাদের সমস্ত জীবনকে, সমস্ত ব্যবহারকে, সমস্ত ঘরকন্নার অতি তুচ্ছ কাজগুলিকে পর্য্যন্ত অপরূপ উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।

রেল-ষ্টেশন

নির্জন রেলওয়ে ষ্টেশনের মত এমন লক্ষীছাড়া বুঝি আর কিছু নাই। ক্ষণকালের জন্য তার হাঁক ডাক—ক্ষণকালের জন্য তার লোকজন—তার পরে সব অন্ধকার, নীরব আর নির্জন। যাত্রী যাহারা নামে ষ্টেশনবাবুকে টিকিটখানা দিয়া, হাতের পুঁটুলিটা শক্ত করিয়া ধরিয়া, গায়ের কাপড় ভালো করিয়া টানিয়া নিয়া—কাঁচা পথ ধরিয়া অন্ধকার গ্রামের উদ্দেশ্যে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায়। তখন ষ্টেশনে যে লোক আছে তা আর মনেই হয় না। কেবল সিগনালের লাল নীল আলোগুলি উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে তমোলীন দিগন্তের পরপারে উঁকি মারিয়া থাকে। শূন্য প্ল্যাটফরম শীতে কন্‌কন্ করিতে থাকে ; সেখানকার কেরোসিনের আলো দুইটা নিভিয়া যায় ; মালের বড় বড় বস্তাগুলি হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া থাকে ; ষ্টেশনের ঘরের মধ্যে বড় টেবিলটার পাশে বসিয়া ঘুম ও মশা তাড়াইতে তাড়াইতে ষ্টেশনের বাবুটি মোটা

একখানা খাতায় হিসাব করিতে থাকেন। জমাদার সাহেব ঘরের এক কোণায় হাত-লণ্ঠনটি কমাইয়া দিয়া সরকারী প্রকাণ্ড খাতাখানা খুলিয়া ফেলিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়ে। যাত্রীদের নিকট হইতে আদায়ী পান, কিছু তরকারী বা একটা মাছ প্রভাতের প্রতীক্ষায় টেবিলটির নীচে পড়িয়া থাকে। দেয়ালের প্রকাণ্ড ঘড়িটা টিক্‌টিক্ শব্দে প্রত্যেক মুহূর্তটিকে গণিয়া বাজাইয়া লয়। বাচাল পাগল ঘড়িটা পূর্ববর্তী ষ্টেশনে গাড়ীর আভাস পাইতেই ঠনং ঠনং শব্দে চমকিয়া উঠিতে থাকে। ষ্টেশনের বাবুটি শীতের মধ্যে আর উঠিতে চান না; একবার, তুইবার, তিনবার; আর না উঠিয়া চলে না, অব্যক্তস্বরে পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশনের বাবুটিকে বকিতে বকিতে কথা কহিবার যন্ত্রের নিকটে মুখ লইয়া ঘুমের ঘোরে একই কথা বারবাব বলিতে থাকেন। যাত্রীঘরের কোনটিতে জন কয়েক যাত্রী কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্যের অগোচরে জাগিয়া উঠিয়া তামাকটুকু সাজিয়া লইতেই আর সকলে নিতান্তই সহজসংস্কারবশতঃ সহসা জাগিয়া উঠিয়া তামাকের ভাগ আদায় করিয়া লয়।

ভিতরে যখন এই রকম বাহিরে তখন শীতের চাঁদ বনের আড়াল ছাড়িয়া উঠি উঠি করিয়া সহসা এক সময় আকাশের ধারে দেখা দেয়। তাহার খানিকটা আলো পড়ে বনের মাথার উপরে আর বাকিটা পাট-পচা পুকুরটার ছোটখাটো ঢেউগুলির উপর পড়িয়া ভাঙিয়া চূরিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে আর সেই ঝাপসা আলোতে টেলিগ্রাফের তারের গোছা স্থানে স্থানে ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠে। এমনি করিয়া শিশিরে আর শীতল বাতাসে—তারায় আর চাঁদে—ক্বচিৎডাকা পাখীর ডাকে আর প্রহর-গোণা শিয়ালের শব্দে—সমস্ত আকাশ ভরিয়া দিয়া সমগ্র পৃথিবীর বুকের উপরে সচেতন অন্ধকারের স্রোত ঢালিয়া দিয়া—ধীরে ধীরে চলিতেছে কি-না-চলিতেছে ভাবে শীতের রাত্রিটি অস্তাচলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

আধ ঘুমন্ত ষ্টেশনবাবুটির চক্ষের অজ্ঞাতে কখন্ অন্ধকারের ডালিমটি ফাটিয়া গিয়া পূর্বাকাশে রাঙা ফলের সরস বীচি গুলিয়া ঝরিয়া পড়িতে থাকে। ষ্টেশনের পাশের পুকুরটি হইতে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির মত বাষ্পের একটি ক্ষীণ আবরণ জড়াইয়া ওঠে। ক্রমে গ্রামের দিক হইতে তু' একখানা গাড়ী পাল্কী, তু' একজন লোক আসিতে থাকে। গাড়ীর আরোহীরা চোখ মুছিতে মুছিতে নামিয়া ষ্টেশনে আসিয়া হাঁকাহাঁকি জুড়িয়া দেয়। দেখিতে দেখিতে প্ল্যাটফরম মালে এবং লোকে ভরিয়া ওঠে।

গাড়ী আসে, কত লোক নামে, কিন্তু এই হতভাগ্য ষ্টেশনটি কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না। ইহার কাছেই একটি শিউলি ফুলের গাছ আছে—সে বেচারা সৌরভে এবং সৌন্দর্য্যে কত পথিকের মন কাড়িতে চেষ্টা করে—কেহ থামিয়াও দেখে না। মাটিতে পড়া ফুলগুলি গরু এবং মহিষে খাইয়া যায়। আমি একা এই প্ল্যাটফরমে বসিয়াই আছি। অদূরে আম-কাঁঠালের বাগানের ভিতর হইতে গ্রামের জীবনযাত্রার অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয় একটা লোক কুড়ুল দিয়া কাঠ কাটিতেছে তাহারই শব্দ, গ্রামের ঘাটে বাসন মাজিবার ঠুং ঠাং আওয়াজ, কি একটা পাখী সারা দুপুর ধরিয়া একঘেয়ে একটা শব্দ করিয়া মাথা কুটিয়া মরিতেছে। কিয়দ্দূরে একটি হিন্দুস্থানী পরিবার বাস করে, স্বামী ষ্টেশনে কাজ করে, স্ত্রীটি কষিয়া বাসন মাজিয়া পিতলকে সোনা তৈরী করিতে চেষ্টা করিতেছে, ছেলেটি একটা গোলাকার কাঠে দড়ি বাঁধিয়া টানিতেছে ইহাই তাহার বাষ্পযান।

আমি একা প্ল্যাটফরমে বসিয়া। কেন যেন আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল—এই ষ্টেশনটির সহিত চারিপাশের কাহারো যোগ নাই, সে একাকী নিঃসঙ্গ, লক্ষ্মীছাড়া। চারি পাশে গ্রামে গ্রামে কত হাসি কত কান্না, কত আনাগোনা লোকজনের—আর এ কেবল নিরাসক্তভাবে দিবারাত্রি খেয়া পারাপার করিতেছে। কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না—না ওই শিউলি গাছটির দিকে, কেহ তাহার কথা মনেও ভাবে না—এই নিঃসঙ্গ লক্ষ্মীছাড়ার কথা। এই গ্রামগুলি কত নিকটে তবু যেন কতই দূর, এই তো কত লোক আসে যায়—তবু যেন কতই পর। লোকজনের জীবনযাত্রার মাধ্যাকর্ষণের টান যেন এখান হইতে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, মনে হইতে লাগিল মানুষের হইতে কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ফিরিবার কোনই উপায় বুঝি নাই।

হঠাৎ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। রেল ষ্টেশনে বসিয়া বিচ্ছেদের আশঙ্কা। একমুহূর্তে বুকের ভার হালকা হইয়া গেল। চারিদিকের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ যোগ নাই বটে কিন্তু সমস্ত দেশের হৃদয়ের সহিত ইহার যোগ যে লৌহ অমোঘ আর বিদ্যুৎদ্রুত। দিবাস্বপ্ন ভাঙিয়া উঠিয়া পড়িলাম দক্ষিণের একখানা টিকিট কিনিলাম। গাড়ী আসিলেই চড়িব—কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কলিকাতা, আঃ, কলিকাতা।